সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৯শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগণপতি সরকার
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীইন্দ্রজিৎ রায় ৪। ফাদার এ. দোঁতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্রীবরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ১৮। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৯। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ২০। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু, ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে বিপথে ২॥০

আলোর ফুলকি ॥ গল্প ২৲

ঘরোয়া ২॥০

জোড়াসাঁকোর ধারে ৩॥০

বাংলার ব্রত ॥০

ভারত শিল্পে মূর্তি ॥৵

ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ ॥০

শ্রীরাজশেখর বসু

কালিদাসের মেঘদূত ১॥০

কুটির শিল্প ॥০

ভারতের খনিজ ॥৵

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা পার্বণ ৩৲, ৪৲

শিক্ষাপ্রকল্প ॥৴

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

উপনিষৎ ॥০

পালিপ্রকাশ ৫৲

চারুচন্দ্র দত্ত

পুরানো কথা ২৲

দুনিয়াদারী ২৲

কাজী আবদুল ওদুদ

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ১৲

পথ ও বিপথ ।৶০

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাংলার লেখক ৪৲

নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ২॥০

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধ সংগ্রহ ৬৲

বীরবলের হালখাতা ৩৲

রায়তের কথা ॥৵

হিন্দুসংগীত ॥০

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতের নারী ২৲

জাতিভেদ ৫৲

ভারতের সংস্কৃতি ॥০

বাংলার সাধনা ॥০

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥০

ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্তসাধনা ॥০

অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ১॥০

ব্রহ্মবিদ্যালয় ১৶০

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কাব্যজিজ্ঞাসা ১৶০, ২॥০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কথা ও সুর ২৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০

শ্রীনন্দলাল বসু

রূপাবলী ১, ২, ৩ : ১।০, ১।০, ১৲

চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুই জন কবি

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত বাসুলীমঙ্গল নামক একখানি পুথির কেহ কেহ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত কোনও পরিচয় কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুথিখানি কে কবে রচনা করিয়াছিলেন, ইহার বিষয়-বস্তুই বা কি ছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদিগের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জিলার চকদীঘি গ্রামের 'রাঢ় মিউজিয়মে' ইহার একখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। পুথিখানির কোন বিবরণ আজ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।[১] নানা কারণে ইহার বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুথিখানির রচয়িতার নাম মুকুন্দ; রচনার মধ্যে তিনি এই প্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

মুকুন্দ ইতি ভারতী
পদ কমল সারথী
যাচয়তি বর পিনাকিনী।

অথবা

মুকুন্দ রচিল বাসুলী মঙ্গল
ত্রিপুরাচরণাম্বুজে।

মুকুন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ, তিনি কোন কোন ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে দ্বিজ কথাটিও যুক্ত করিয়াছেন, যেমন,—

চণ্ডীপদ সরসিজে
সেবিয়া মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল।

তাঁহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র; কারণ, কোন কোন ভণিতায় তিনি তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ত্রিপুরা পদারবিন্দ
মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভণে।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শুভেন্দু সিংহ রায়ের সম্পাদনায় শীঘ্রই এইটি প্রকাশিত হইবার কথা শুনিতেছি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবির অভাব নাই। তিনি তাঁহাদেরই কেহ কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহাদের কেহ নহেন, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দনামক ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বাশুলীমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহা উভয়ের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাশুলীমঙ্গল-রচয়িতা নিজেকে মুকুন্দ বলিয়া উল্লেখ করিলেও কোথাও মুকুন্দরাম বলেন নাই, কিংবা দ্বিজ বলিয়া বার বার উল্লেখ করিলেও চক্রবর্ত্তী পদবীর ব্যবহার করেন নাই। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কবিকঙ্কণ ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কবিচন্দ্র, কিন্তু বাশুলীমঙ্গলের ভণিতায় কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহা মুকুন্দের উপাধি। অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে স্বতন্ত্র একজন কবি। কবিচন্দ্র মুকুন্দ তাঁহার কাব্যমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্ত্তন মিশ্র, মাতার নাম হীরাবতী, সহোদর ভ্রাতার নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্রের নাম রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব মুকুন্দরামের নামে পরবর্ত্তী কালে কেহ এই কাব্যখানা রচনা করিয়াছে, এমন ভুল করিবারও কোনও কারণ নাই।

মধ্যযুগে দ্বিজ মুকুন্দনামক একজন কবি 'জগন্নাথবিজয়' বা 'জগন্নাথমঙ্গল' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ ভারতী নামে পরিচিত। তাঁহার কোন পরিচয় উক্ত দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পরিচয়ের অনুকূল নহে। অতএব ইঁহারাও যে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজ মুকুন্দনামক আর একজন কবি 'অর্জ্জুনসংবাদ' বা 'বৈষ্ণবামৃত' নামক একখানি গীতার অনুবাদজাতীয় কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিচন্দ্র মুকুন্দ কোথাও নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ একজন বৈষ্ণবজাতীয় কাব্য ও অন্য একজন শাক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব ইঁহারাও উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাশুলীমঙ্গল-প্রণেতা কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত পরিচয় ব্যতীত কবির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোচ্য পুথিখানি বর্দ্ধমান জিলার মণ্ডলঘাট পরগণার আমুরিয়া গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া পুথিখানিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হইতে পারেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে ১৬৫৭ শকাব্দ বা ১১৪২ সাল

পুথিখানির লিপিকাল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা কবির স্বহস্তলিখিত পুথি নহে; কারণ, ইহাতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় শ্রীকিশোরদাস মিত্র (মিশ্র ?)। অতএব কবি ইহার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু কত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে। পুথিখানির রচনাকাল সম্পর্কে ইহাতে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—

শাকে রস রথ (রস ?) বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাসুলিমঙ্গল গীত হৈল সেই হতে॥

সকলেই অবগত আছেন যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তিকৃত চণ্ডীমঙ্গলের বঙ্গবাসী-সংস্করণে ইহার রচনা-কালজ্ঞাপক এই দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

কিন্তু ইহা তাঁহার আর কোন মুদ্রিত সংস্করণ কিংবা হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মুকুন্দরামের পুথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব এমন মনে করা যাইতে পারে কি যে, নামসামঞ্জস্যের জন্য বঙ্গবাসীর মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীমঙ্গল-সম্পাদক কবিচন্দ্র মুকুন্দকৃত বাসুলীমঙ্গল রচনার কালনির্ণায়ক পদ দুইটি মুকুন্দরামের পুথি সম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন ? তাহা না হইলে উক্ত পদ দুইটি বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মুকুন্দরামের পুথিতে কোথা হইতে আসিল ? এই পদ দুইটি যে মুকুন্দরামের পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে ত আর এখন কাহারও সংশয় নাই। যদি এই পদ দুইটি কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলীমঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাসুলীমঙ্গলের রচনা-কাল ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা হইলে কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইহার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ, কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষায় প্রাচীনত্বের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মুকুন্দরাম তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, বরং মাণিক দত্তকে 'সঙ্গীত আদ্য কবি' বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তবে ইহার উত্তরেও বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ কবিচন্দ্রের পুথি পরবর্ত্তী কালে লিপিকর কর্ত্তৃক আধুনিকতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং মুকুন্দরামের বিষয়বস্তু কতকটা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া কিংবা তিনি স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কবিচন্দ্রের বিষয় ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কাব্যে কিছু উল্লেখ করেন নাই, অথবা তাঁহার বিষয় তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলীমঙ্গল কাব্যের আর কোন পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই।

কবিচন্দ্র মুকুন্দরচিত বাসুলীমঙ্গলের বিষয়বস্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত অভয়ামঙ্গলের বিষয়বস্তু হইতে কতকটা স্বতন্ত্র। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুথি দ্বাদশ পালায় বিভক্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুথি ষোল পালায় বিভক্ত। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুথিতে প্রথম সাতটি পালায়

মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বন্তরকথা, সুরথ রাজার উপাখ্যান, মধুকৈটভবধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটি পালায় বর্দ্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দেবী বিশালাক্ষী বা বাসুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সদাগর ধুসদত্ত বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পাটনে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকিবার পর পুত্র গুণদত্ত কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। অতএব চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কালকেতুর কাহিনীটি ইহাতে নাই।

ধুসদত্তের কাহিনী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক কালে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুকুন্দরাম তাঁহার অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্দ্ধমানে ধুসদত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাসুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥

মুকুন্দরাম ধনপতি সদাগরকে ধুসদত্তের মামাত ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুল্লনার পরীক্ষা গ্রহণকালে ধুসদত্ত আসিয়া তাহাকে 'জৌঘর' বা জতুগৃহ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন,—

তুমি মামাইত ভাই অবশ্য কল্যাণ চাই
কহিতে মানহ পাছে রোষ।
তোমারে কহিলুঁ সাধু জৌঘর করুক বধু
তবে সভে করিব নির্দ্দোষ ॥

মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও ধুসদত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্দ্ধমান হৈতে আল্য ধুসদত্ত বাণ্যা।

অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ যদি মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিও হন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে ধুসদত্ত বণিকের কাহিনী বর্ণনা করা কিছুই অসম্ভব ছিল না।

কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত। তাঁহার উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই জন্য ভাষা হইতে তাঁহার কাল-বিচার করা সম্ভব নহে। নিম্নে তাঁহার রচনার যে সকল আদর্শ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতেই তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। শিবের বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,—

শিরোপরি গঙ্গ গৌরী আধ অঙ্গ
ত্রিশূল ডিণ্ডিম ভুজে।
পেখি দিগম্বর মহিলা মণ্ডল
বদন লুকাঅছি লাজে ॥

বরবেশী শিবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

জামাতা লাঙ্গট　　দেখিয়া বিকট
সর্ব্বজ ভাবহুঁ দুঃখ।

শিবস্তোত্রে লিখিয়াছেন,—

একানেকা লঘুগুরু ব্যক্তাব্যক্ত তনু।　　ধেয়ানে না জানে ব্রহ্মা নারায়ণ স্থাণু॥
শ্রবণ পবন নিজ শ্রমজলহরা।　　মধুগন্ধ লোভে মন্দ চপল ভ্রমরা॥
কুমতিদহনদক্ষ ভবভয়হারী।　　নিয়ত দুরিত দুঃখ জগদুপকারী॥
নব শশী শিরে শোভে শরীর সুছান্দ।　　মৃদঙ্গ বাদল পর পুনমিক চান্দ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।　　শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥

বাসুলীমঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল শ্রেণীর কাহিনীর অন্তর্গত; বাসুলীই কালক্রমে চণ্ডীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন; এই দিক্ দিয়াও বাসুলীমঙ্গল কাব্যখানি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার আরও দুই একখানি পুথির সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার রচনাকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন ধারণা করিতে পারা যাইবে না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পরও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল। ইহার পুথিখানি আজিও প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসলেখক এই পর্য্যন্ত এই পুঁথিখানির বিষয় কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। সম্প্রতি ইহার একখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে,[২] এখানে তাহার বিষয়ই উল্লেখ করিব।

পুথিখানি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে—প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্ত নহে—সর্ব্বত্রই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায়ই দীর্ঘ। ষোলটি পালায় দুইটি কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে; প্রত্যেক পালায় নূতন করিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুথিখানি কোথাও একই পাতার দুই পৃষ্ঠায়, কোথাও বা দো-ভাঁজ করা দুই পাতার এক পৃষ্ঠায় করিয়া লিখিত। পুথিখানির অবস্থা ভাল, লিপি সুন্দর ও সহজপাঠ্য, তবে একাধিক হস্তে লিখিত। অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুথিখানি লিখিত বলিয়া মনে হয়। ভণিতায় কবি এই ভাবে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

চণ্ডিকায় চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।　　রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন॥
আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরম্ভে রন্ধন।　　রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন॥　ইত্যাদি

২। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বেজয়াল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী বি এ মহাশয়ের সৌজন্যে পুথিখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। পুথিখানির বিষয়ে পূর্ব্বে আমি নিজেও কিছু অবগত ছিলাম না।

অর্থাৎ কবির নাম অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী, তাঁহার উপাধি কবীন্দ্র। ভণিতার অনেক স্থানে কেবল মাত্র তাঁহার উপাধিটিও ব্যবহার করিয়াছেন,—

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা কবীন্দ্র কহেন গায়্যা
দূর কর আমার কলুষ।

অকিঞ্চন তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বসতি বরদা বদনে সারদা
চণ্ডিকা দেবীর আদেশে।
নূতন মঙ্গল শ্রবণে কুশল
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে ভাষে॥

মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা একটি পরগণার নাম। প্রায় সমসাময়িক আর একজন মঙ্গল-কাব্যের কবি তাঁহার কাব্যে এই বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। অকিঞ্চন রামেশ্বরের পরবর্ত্তী কবি, সেই কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা যাইবে। বর্ত্তমানে কবির বংশধরগণ এই বরদা পরগণার অন্তর্গত বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির বংশধরদিগের গৃহে প্রাপ্ত একটি ব্রহ্মোত্তরের দলিলে কবির তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দকে এই বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দলিলখানি ১২০৯ সালে লিখিত। কবি সেই সময় জীবিত ছিলেন না, তবে তিনিও বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুথির মধ্যে তিনি কোথাও নিজের গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নাই। বরং তাঁহার পিতা আটঘরা নামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

বিপ্রকুলোৎপতি আটঘরা স্থিতি
ঠাকুর পুরুষোত্তম।
তাহার নন্দন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ
রচে কাব্য মনোরম॥

আটঘরা-শ্রীরামপুর গ্রাম মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমাতেই অবস্থিত। কবি স্বয়ং কিংবা তাঁহার পুত্রগণই সর্ব্বপ্রথম আসিয়া ইহার অনতিদূরবর্ত্তী বেঙ্গরাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। কবি বর্দ্ধমানের অধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দেশে বাস করিতেন বলিয়া বার বার তাঁহার নাম কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র কৃতকীর্ত্তি
ইন্দ্রের সমান বর্দ্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে॥

চিত্রসেনের তাত		কীর্ত্তিচন্দ্র নরনাথ
রাজা জগৎরায়ের নন্দন।
বসিয়া তাঁহার দেশে		নূতন মঙ্গল ভাবে
শ্রীযুত কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥

কিন্তু তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন না ; কারণ, তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

ভূপতি তিলকচন্দ্র		বৰ্দ্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে		চণ্ডিকা মঙ্গল ভাবে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন ॥

মনে হয়, তিনি যখন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন মহারাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি ছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকাল খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭০ হইতে ১৮৩২। তবে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। মহারাজ তিলকচন্দ্রের কথাও তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি তিলকচন্দ্রের রাজ্যকালের শেষ ভাগ হইতে তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পুথিখানিতে ইহার রচনা-কালজ্ঞাপক নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না ; অতএব ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে আর কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব।[৩]

পুথিখানির নাম তিনি এক জায়গায় 'পার্ব্বতীর সঙ্কীর্ত্তন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র সর্ব্বদাই তিনি ইহাকে চণ্ডীর 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্ত্তনে'র অনুকরণেই একবার ইহাকে 'পার্ব্বতীর সঙ্কীর্ত্তন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; যেমন,—

পালা পূর্ণ হল্য পার্ব্বতীর সঙ্কীর্ত্তন।
বিরচিল কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন ॥

অকিঞ্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; কারণ ইহাতে তাঁহার তিন পুত্রেরই উল্লেখ আছে, যেমন,—

শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্র শিবানন্দে।
কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদদ্বন্দ্বে ॥

এইবার কাব্যখানির আভ্যন্তরিক একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের বসতি-

৩। কবির বংশধরদিগের গৃহে যে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, হরিনারায়ণের পুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র কবি অকিঞ্চন, তাঁহার তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামদুলাল ও শিবানন্দ, রামচাঁদের পুত্র রামজীবন, রামজীবনের পুত্র বেণীমাধব, তাঁহার পুত্র মাখন ও তৎপুত্র তারাপদ। অকিঞ্চন হইতে তারাপদ পর্য্যন্ত পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে। চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিবার নিয়ম, তাহা হইলে দেখা যায়, মাত্র ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে অকিঞ্চন বর্ত্তমান ছিলেন।

স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করিয়া কবি অকিঞ্চন যে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। যদিও বহুলাংশে অকিঞ্চন মুকুন্দরাম দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন, এ কথা সত্য। তথাপি কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি কোন কোন স্থানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার ভাঁড়ুর চরিত্রটি যদিও মুকুন্দরামের ভাঁড়ুর ছায়াতলেই অঙ্কিত, তথাপি ইহার কতকটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,—

মধ্যেতে মণ্ডপ করে সুভাবের ঘর। ভাঁড়ু দত্ত বৈসে তায় তণ্ডের ঈশ্বর॥
কড়ি সাধে কিঙ্করে করিয়া আটঘরা। হাট ঘাট হইল ভাঁড়ুর আজ্ঞাকারী॥
কাপড়্যার কাপড় কিনিয়া আনে ছলে। কড়ি নাঞি দেই তারে কলমের বলে॥
ধূর্ত্ত বুদ্ধ্যে ধান কিনে ধার নাহি সুধে। মাগিলে মালের টাকা মার্‌য়া প্রাণ বধে॥
কুমারের কুম্ভ লেই সরা ভাণ্ড হাঁড়ি। ভাঁড়ুর ভগিনী তারে নাঞি দেই কড়ি॥
ছুটি বেটা দেই দেখা দোকানের কাছে। লুট কর্‌য়া লাড়ু খায় লাঙ্গট হয়্যা নাচে॥
জলে যায় যুবতী জঞ্জাল করে ঘাটে। বাটুলে কলসী ভাঙ্গে খাদ খুলে বাটে॥
পথে পাঁক পেল্যা পাঁশ ঢাকা দিয়া তায়। হেরি যুবতীর মুখ হাস্যা পাক খায়॥
প্রবল প্রতাপ ধরে একটি জামাই। মার্‌য়া ধর্‌য়া লিজ(?) লেই মানা শুনে নাই
দধি দুগ্ধ দেখিলে দোকান শুদ্ধ লুটে। বীরের দোহাই দিলে বল কর্‌য়া পিটে॥
পথে যায় পথিক প্রতাপে গালি পাড়ে। দোষ বিনা দ্বন্দ্ব করে দণ্ড কর্‌য়া ছাড়ে॥
নগরের লোক যত নানা দুঃখ পায়। বিষাদ করিয়া বীরে জানাইতে যায়॥
বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ বাজার। কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল জোহার॥
চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ। রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন॥

ভাঁড়ুর জামাতার কথা মুকুন্দরামে নাই, বুলন মণ্ডলের নামটি অকিঞ্চন মুকুন্দরাম হইতেই লইয়াছেন।

উৎপীড়িত গুজরাটবাসী কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুর নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহার চিত্রটি বাস্তব ও করুণ,—

মহাবীর, নগর নিবাসে নাঞি সাদ।
শুন বীরশিরোমণি, নিবাসে বসিল ফণী
ভাঁড়ু দত্ত পাড়িল প্রমাদ॥
তোমার আশ্বাস পায়্যা সর্ব্বে ছিনু সুখী হৈয়া
অন্ন বস্ত্রে পরম কল্যাণে।
নাঞি ছিল রাজকর অপর আপদ ডর,
তোমার চরণ-কৃপাদানে॥
তোমার নগরে আসি আশ্বাসে সভাই বসি
প্রজা মোরা সুখের পায়রা।

যথা অপন্তায় নাঞি　　সর্ব্বে বসি সেই ঠাঁঞি
খুঁজি বড় বৃক্ষের ছায়রা ॥
রাজার জয়ার্থ কড়ি　　দিতে নাঞি করি দেরী
সোই বাটপাড় নগরের।
হিসাবি খাজনা দেয়　　ফারখতি লিখিয়া দেয়
চরণে বিদায় মাগি তোর ॥

*　　*　　*　　*

প্রজাগণ যত বলে　　শুনি বীর কোপানলে
ভাঁড়ুরে আনাইল দিয়া লোক।
অভয়া করিয়া ধ্যান　　কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ গান
সেবকে চণ্ডিকা দিবে সুখ ॥

অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিও সুরচিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত মগরা নদীতে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনাটির মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

দেখি মগরার পানী　　বলে সাধুশিরোমণি
উপায় চিন্তহ কর্ণধার।
বুঝি বড় অমঙ্গল　　রাখ ডিঙ্গা যথাস্থল
বিষম সঙ্কটে কর পার ॥
আসিতে মগরা নদে　　কোন দেবতার বাদে
ঝড় বৃষ্টি হৈল উপস্থিত।
তাল সম পড়ে শিলা　　বিদরে নৌকার খিলা
পবনে প্রবল হৈল শীত ॥
অঙ্গে জল পড়ে বেগে　　দশনে দশন লাগে
শীতে অঙ্গ হৈল কম্পমান।
বারিদ বরিখে বারি　　ত্রিভাগ ডুবিল তরী
আজি মোর সংশয় পরাণ ॥
প্রলয় হইয়াছে বা　　ঘুরে মুকুরলা (?)
ঝলকে ঝলকে উঠে জল।
কাণ্ডারী হৈল ভাঁড়　　বাহিতে না পারে দাঁড়
বুঝি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥
দেখে বুহিত্রের পাশে　　মকর কুম্ভীর ভাসে
ভয়ঙ্কর বিস্তার বদন।
দু কূলে পড়িছে হানা　　রাশি রাশি ভাসে ফেনা
লহ লহ করে অহিগণ ॥

অবনী ডুবিয়া জলে বুঝি গেল রসাতলে
বিপাক পড়িল আমা লয়্যা।
উপরে পশিতে জল সতীপতি কয়ে বল
কিরূপে নগরে যাব বায়্যা॥
উদ্ধার করিতে বাপে বিমাতার অভিশাপে
ধনে প্রাণে মজিলাম আমি।
বলিও আমার মায় ছিরা মৈল মগরায়
যদি দেশে যাতে পার তুমি॥
কর্ণধার বলে সাধু, পূজহ শঙ্করবধূ
বিপদখণ্ডনী মহামায়া।
ভকতবৎসলা চণ্ডী রাখিব দুর্জ্জন দণ্ডি
দিয়া পদপঙ্কজের ছায়া॥

* * * *

কাণ্ডারের কথা শুনি চিন্তে সর্ব্বস্বরূপিণী
পূজে সাধু চণ্ডীর চরণ।
দুর্গম মগরা মাঝে রক্ষ চণ্ডী পদরজে
বিরচিলা দ্বিজ অকিঞ্চন॥

করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চনের যথার্থ দক্ষতা ছিল; এই বিষয়ে তিনি যে কেবল মাত্র মঙ্গলকাব্যের বাঁধা পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নহে; ইহার মধ্যে তিনি কতকটা মানবিকতার স্পর্শও দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহান্তে সিংহলরাজদুহিতা সুশীলার পতিগৃহযাত্রার চিত্রটি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে,—

কন্যার গমনে রাণী করে হায় হায়। ধৈরজ না ধরে ধরে ধনপতির পায়॥
বৈবাহিক হৈলে তুমি বিধির ঘটনা। পাইলে পাষণ্ড হৈতে প্রচুর যন্ত্রণা॥
যত কাল জীব প্রাণে যাবে নাঞি খেদ। কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন কন্যার বিচ্ছেদ॥
রাখিল ঝিয়ের খোঁটা রাজা দুরাচার। মোর কন্যা ইবে হৈল তনয়া তোমার॥
কন্যাভাব করিবে কহিবে নাঞি কিছু। মোর ঝিয়ে আগে ডাক্য নিজ ঝিয়ে পাছু॥
রাণীর রোদনে কাঁদে ধনপতি সাধু। আমার চক্ষের তারা ওই পুত্রবধূ॥
দৈবে দুঃখ দিল মোরে কি করিবে তুমি। দেখিয়া শ্রীমন্তে সর্ব্ব বিসরিনু আমি॥
শ্রীমন্তে সঁপেন কন্যা রাণী প্রিয় বোলে। মোর বাঞ্ছা ছিল তুমি থাকিবে সিংহলে॥
প্রাণের অধিকা কন্যা তুমি লয়্যা যায়। যতনে পালিবে ঝিয়ে মোর মাথা খায়॥
দশ দোষ ক্ষমা দিবে দোষ না লইবে। হেরিয়া বদনচাঁদে হাসিয়া ডাকিবে॥
মা বাপে দেখিতে আছে বাসনা সভার। আমার মাথার কিরা আগু একবার॥

দশ দিন দেখা দিয়া দেশে পুন যাবে।　　শাশুড়ীর অন্ন খাইলে পরমাই বাড়িবে॥
সে দেশের রাজা যদি ধনে করে বল।　　তুরিত গমনে আস্ত তোমার সিংহল॥

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সকল বিষয়েই যে রুচিদুষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, অকিঞ্চনের কাব্যখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অকিঞ্চনের রুচিবোধ উন্নত ছিল; পরিচ্ছন্ন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার এই উন্নত রুচিবোধের বিকাশ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্রভাবেই যে বাংলা সাহিত্য নৈতিক দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চনের কাব্য পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অচলা দেব-ভক্তি লইয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের মত দেবদেবীকে লইয়া অহেতুক কৌতুক করেন নাই।

বিষয়-বিন্যাসে মুকুন্দরামের প্রভাব অকিঞ্চনের উপর অনস্বীকার্য্য হইলেও ভাষার দিক্ দিয়া তাঁহার উপর তাঁহার স্বদেশবাসী একজন কবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিবমঙ্গল বা শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যে ভাব-যুগের পর শব্দযুগেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে; ভারতচন্দ্র শব্দযুগেরই কবি এবং শব্দশিল্পী হিসাবেই তাঁহার কৃতিত্ব। রামেশ্বর বিচিত্র ধ্বনিসংযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যদেহে এক সুলভ অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, যেমন,—

ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান॥
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥　ইত্যাদি।

অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটির অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিলেন; যেমন,—

পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
অবিলম্বে অবনী আইলা অপবর্গা॥
বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর।
কান্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর॥
বিমানে বসিল বীর বনিতা লইয়া।
যায় যমালয় পথে জয় জয় দিয়া॥
দুর্গা বল্যা দুর্গাদূত দুন্দুভি বাজান।
সদনে শমন শব্দ শুনিবারে পান॥　ইত্যাদি।

ইহা রামেশ্বর ও অকিঞ্চনেরই যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নহে; ইহা যুগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই শব্দবিন্যাসের কৃতিত্বের উপরই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তবে

ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইঁহাদের তাহা ছিল না; ইঁহারা শব্দ দ্বারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের মত কলগুঞ্জন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

অকিঞ্চন একখানি শীতলামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শীতলামঙ্গল শীতলাপূজা উপলক্ষ্যে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার একখানি পুথি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে, তাহাতে কবি বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র তেজশ্চন্দ্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, শীতলামঙ্গলখানিই অকিঞ্চনের প্রথম রচনা, ইহার পর তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও অকিঞ্চন গঙ্গামঙ্গল শ্রেণীর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা।

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্ব্বশেষ কবি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের ধারাটিকে তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই সময় হইতেই নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সংস্কৃতি এক নূতন রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মৌলিক ধারাটি ইহার সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—ইহার ক্ষেত্রে নাগরিক রস ও রুচির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র একাধিপত্য স্থাপন করেন।

ময়ূর ভট্ট

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ধর্ম্মমঙ্গলের সকল কবি ময়ূর ভট্টকে ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন --

"ময়ূর ভট্টে কৃপান্বিত হৈল করতার।
মরতে ধর্ম্মের গীত করিতে প্রচার॥"—(রূপরাম)

"বন্দিব ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভনে ধর্ম্মগুণগান॥"—(মাণিক গাঙ্গুলী)

"ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাস গায়।"—(সীতারাম দাস)

"আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্মশতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥"—(গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়)

"স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি॥"—(ঘনরাম)

এই ময়ূর ভট্টের জীবনকথার মধ্যে আমরা এই মাত্র জানি যে, তিনি লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেনের জন্য শ্রীধর্ম্মপুরাণ রচনা করেন। লাউসেনের সময় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ ধরিলে ময়ূর ভট্টের সময় ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভে হইবে। সুতরাং তিনি বাণভট্টের সমসাময়িক সূর্য্যশতকের রচয়িতা ময়ূর ভট্ট হইতে ভিন্ন। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহাদিগকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যশতকের রচয়িতা ময়ূর ভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন পালরাজবংশের উৎপত্তিই হয় নাই, অথচ ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন পালরাজবংশের সহিত সম্পর্কিত এবং আমাদের ময়ূর ভট্ট সেই ধর্ম্মমঙ্গলের কবি।

৺কালীকান্ত বিশ্বাস রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৮ সাল, ৪০ পৃ.) 'ময়ূর ভট্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন—"তাঁহার সম্বন্ধে রূপসনাতনের বংশের প্রশংসার পদাবলীতে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

'ময়ূর কুল্লুক ভট্ট আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবিশিরোমণি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ'॥"

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী-বংশের নিম্নলিখিত পরিচয় আছে,—

"বাৎস্থে ভট্টশালী শ্রোত্রিয় প্রবল।
দানাদানে কুলমানে আছয়ে সবল॥
এই বংশে সরস্বতী চিরদয়াবতী।
ময়ূর ভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি॥
ময়ূর ভট্ট পূর্ব্বকবি ময়ূরসদৃশ।
আজও নাহি দেখি তার কিছু বিসদৃশ॥"

এই রসসাগর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। আমার পরলোকগত বিজ্ঞ সাহিত্যিক বন্ধু ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ভট্টশালীবংশীয় ময়ূর ভট্টের নিম্নলিখিত কুলজি আমাকে প্রদান করেন—ধরাধর—বেদ ওঝা—সিদ্ধেশ্বর—চতুর্ব্বেদ—জয়রাম মিশ্র—চক্রপাণি—নারায়ণ—পীতাম্বর—বলদেব—কামদেব—অধিপতি—মহীধর ভট্টশালী—ময়ূর ভট্ট। ময়ূর ভট্টের আদিপুরুষ ধরাধর বিখ্যাত আদিশূরের সমসাময়িক। আদিশূরের সময়নির্দ্দেশক দুইটি শ্লোকার্দ্ধ আছে। একটি হইতেছে—

"বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

ইহাতে ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ হয়। আর একটি হইতেছে—

"বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

ইহাতে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৯২ পৃঃ)

ইহা হইতে আমরা পাই, ৬৫৪ শকে আদিশূরের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে বিপ্রগণের আগমন। আমার বিশ্বাস, এই শ্লোকটিই গ্রহণযোগ্য। ইহার দুই চরণের পাঠভ্রমে "বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্ত পাঠ অধিকতর ভ্রান্ত হইয়া "বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" হইয়াছে। আমরা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরাধরের কাল নির্ণয় করিতে পারি। তাহা হইতে ১৩ পুরুষ অধঃস্থিত ময়ূর ভট্টের জন্মকাল ৭৪৬ + ১৩ × ৩৩⅓ = ১১৭৯⅓ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ইহা আমাদের প্রস্তাবিত ধর্ম্মসেনের সময়ের কাছাকাছি।

আমরা ১২১১ শকে বা ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এক "পরমসৌগতপরমমহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্গৌড়েশ্বরমধুসেন" নামক এক বৌদ্ধ রাজার কথা জানি। তাঁহার সময়ে একটি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হয় (History of Bengal, vol. 1,p, 228, D,U,)। তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণসেনের বংশধর মনে করা অপেক্ষা লাউসেনের বংশধর মনে করাই অধিক সঙ্গত। সম্ভবতঃ ময়ূর ভট্টের পৃষ্ঠপোষক ধর্ম্মসেন তাঁহার পিতা কিংবা

পিতামহ ছিলেন। শ্রীধর্ম্মপুরাণে (পৃঃ ১৫০) ধর্ম্মসেনের চারি পুত্রের নাম মাধব, মধুসূদন, সত্য ও সনাতন। শ্রীধর্ম্মপুরাণে ধর্ম্মসেনের নামান্তর ধর্ম্মদাস। সেইরূপ সম্ভবতঃ মধুসূদন কিংবা মাধবের নামান্তর মধুসেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মপুরাণ পাই নাই। যাহা তাঁহার রচিত বলিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, "তাহা অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র *বাঁড়ুজ্জের রচনা। মুদ্রিত সংস্করণের আকর-পুথির ভণিতা 'দ্বিজ রামচন্দ্র', ছাপা বইয়ে* হইয়াছে 'দ্বিজ ময়ূরক'।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫)। আমি বলিব, বর্ত্তমান আকারে এই বইখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত--

শুন রাজা মতিমান্ পাতকে পাইবে ত্রাণ
প্রাণ দিতে হবে না তোমারে।
হইয়া ভকতিচিত ধর্ম্মনাম বিভূষিত
পুরান শুনিবে ব্রত কোরে॥ (পৃ. ৭)

'কোরে' মধ্যযুগের বাংলায় হইবে করিআঁ, করিআ বা কর‍্যা। সুতরাং 'তোমারে' এবং 'কোরে' এই মিল গত শতাব্দীর পূর্ব্বের হইতে পারে না।

"অরণ্য মাঝারে এসে আক্রমিয়া ধর্ম্মদাসে
সর্বধন কাড়িয়া লইল।" (পৃ. ১০০)

'এসে' মধ্যযুগের বাংলায় আসিআঁ, আসিআ বা আস্যা হইবে। সুতরাং 'এসে' এবং 'ধর্ম্মদাসে' এই মিল আধুনিক। এইরূপ অনেক আধুনিকত্বের চিহ্ন আছে। পাণ্ডুলিপির তারিখ সন ১৩১০ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

তবে মধ্যযুগের ধর্ম্মমঙ্গলগুলি যে প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য কিছু পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

গৌড়ীয় সমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ত্তমানে বিভিন্ন নামে বহু সাহিত্য-সভা কলিকাতায় ও মফস্বলে আমরা দেখিতেছি। আমাদের দেশে এই সাহিত্য-সভার আদি 'গৌড়ীয় সমাজ'। এক শত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে এই সমাজ স্থাপিত হয়। তখন ইংরেজী 'সোসাইটি,' 'ইন্‌ষ্টিটিউট' বা 'এসোসিয়েশন'কে প্রায়শঃ বাংলায় 'সমাজ' বলিয়া আখ্যাত করা হইত। গৌড়ীয় সমাজও এইরূপ একটি 'সোসাইটি'। বস্তুতঃ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছিল—'Native Literary Society'। তখনকার দিনের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানে গণ্যমান্য ইংরেজ-বাঙালী একযোগে কার্য্য করিতেন। গৌড়ীয় সমাজ কিন্তু একেবারেই বাঙালী প্রতিষ্ঠান, ইহাতে ইংরেজের নামগন্ধ ছিল না। মাতৃভাষার অনুশীলন দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনই ছিল এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গৌড়ীয় সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১২২৯, ৭ই ফাল্গুন) হিন্দু কলেজ-ভবনে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক রামকমল সেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বিশ্বনাথ মতিলাল, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচরণ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে (সরকার), কাশীকান্ত ঘোষাল, রসময় দত্ত, কাশীনাথ মল্লিক প্রভৃতি। পূর্ব্বেই সমাজের উদ্দেশ্য-সম্বলিত একখানি অনুষ্ঠানপত্র রচিত হইয়াছিল। সভাপতির আহ্বানে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ইহা সভায় পাঠ করিলেন। অনুষ্ঠানপত্রখানি সম্বন্ধে একটু পরেই বলিতেছি। সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার পর এইদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুরপ্রমুখ সভ্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে রামকমল সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর গৌড়ীয় সমাজের সম্পাদকপদে বৃত হইলেন।

গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্রখানি নানা দিক্ হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার দিনে নেতৃবর্গ জাতীয় কল্যাণচিন্তায় কতখানি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এই অনুষ্ঠানপত্রখানি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। এখানি বাংলায় রচিত হইলেও মূল বাংলা অনুষ্ঠান-পত্রখানি পাইতেছি না। ইহার ইংরেজী অনুবাদ ঐ সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ একটি অনুবাদ* হইতে সমাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আমরা জানিতে পারি। অনুষ্ঠানপত্রখানি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে প্রথম দিনকার সভায় সমাজের উদ্দেশ্য-সম্বলিত যে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ধার্য্য হয়, তাহা এখানে পর পর উল্লেখ করিতেছি :

---

* "Native Literary Society"—*The Asiatic Journal*, December 1828, pp. 549-54. London.

১। মান্যগণ্য সুবিজ্ঞ দেশীয়দের লইয়া একটি সমাজ গঠিত হউক।

২। দেশবাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪। দেশবাসীদের মধ্যে নীতি এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য দমন ও নিরোধকল্পে সমাজ যত্নপর থাকিবেন।

৫। এ উদ্দেশ্যে সমাজের ব্যয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে।

৬। প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া একটি গ্রন্থাগার গঠন করা যাইবে।

৭। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হইবে।

৮। আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইলে গৌড়ীয় সমাজের জন্য একটি ভবন ক্রয় করা হইবে। যতদিন পর্যন্ত না তাহা সম্ভব হয়, ততদিন হিন্দু কলেজগৃহে সমাজের অধিবেশন হইবে।

২

এখন অনুষ্ঠানপত্রখানির মর্ম লইয়া আলোচনায় আসা যাক। অনুষ্ঠানপত্রখানি কাহার রচিত, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। বাংলায় লিখিত মূল অনুষ্ঠানপত্রখানি পাইলে হয় ত এ বিষয়ে কিছু হদিস মিলিত। ইহার মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার উন্নতি ও প্রসারকল্পে ওরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বাঙালীপ্রধানেরা বহুদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন। নানা জনে কথাবার্ত্তায় এই অভাবের বিষয় উত্থাপনও করিতেন। সাময়িক পত্র-পত্রীতেও এই অভাবের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইত। এইরূপ একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠায় কি কি সুফল পাওয়া যাইতে পারে, সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারই বা ইহা দ্বারা কিরূপে সম্ভব, সেই সকল কথা ইহাতে পর পর এইরূপ আলোচিত হয়:

"স্বদেশের হিত-সাধনের জন্য এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা একক ভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহুজনের সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এ প্রকার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিপূর্ব্বে বহু জনহিতকর কার্য্যই সাধিত হইয়াছে। সভা-সমিতির দ্বারা কত মহৎ কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সুসম্পাদিত হইতে পারে, ইউরোপীয়দের সভা-সমিতিগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যখন অনেকে সংঘবদ্ধ হয়, তখন খুব কম কাজই অসাধ্য থাকে। সমবেত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের সমাবেশ হইলে একটি অদ্ভুত শক্তি লব্ধ হয়। এবং এই শক্তি দ্বারা প্রত্যেকেই সমভাবে লাভবান্ হইতে পারেন। একক চেষ্টায় এরূপ শক্তিলাভ সম্ভব নয়, উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইয়া বরং বহু দূরেই থাকিয়া যায়।"

নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শক্তির কথা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের কৃতিত্বের কথা অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত হয়। এ দেশে চৌষট্টি কলা বা বিদ্যার চর্চা হইত। কাব্য, নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ, রসায়নাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাও এখানে সুরু হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ প্রায় সকলেই এসিয়া মহাদেশের দেশসমূহ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের দুর্দশা আরম্ভ হয়। পরাধীনতার নিগড় ভারতবাসীরা গলায় পরিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্রমে সমাজে নানারূপ অভাব ও দুর্গতি পরিলক্ষিত হয়। এগুলির ভিতর পরস্পরের মধ্যে সামাজিক মেলা-মেশা, ভ্রমণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা এবং পরস্পরের হিত-কামনার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতে থাকে। সমাজদেহে যে সব কারণে ক্ষত দেখা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, কাঞ্চন-কৌলীন্যাদি প্রধান। পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। আত্মস্বার্থ বজায় রাখার জন্য জাতীয় স্বার্থকে বলি দিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইতে চাহে না। আবার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশার অভাব হেতু পরস্পরের ভুলভ্রান্তি শোধরাইতে এদেশীয়েরা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি জানিয়া, পরস্পরের অর্জ্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা পরস্পরকে শক্তিমান্ করিয়া তোলা সম্ভব; সঙ্ঘশক্তির সুফল তখন হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অনুষ্ঠান-পত্রখানিতে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বলা হয় যে, কলিকাতার সম্পন্ন, শিক্ষিত ও মান্যগণ্য অধিবাসীদের একটি 'সমাজ' স্থাপন দ্বারা স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পর অনুষ্ঠানপত্র বলেন :

"যখন এই দেশ হিন্দু রাজন্যবর্গের অধীনে ছিল, তখন বিদ্যার অনুশীলন, প্রসার এবং বিদ্যা-বিতরণের উদার ও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তখন যদি কেহ কোন বিষয়ে বিদ্যার্জ্জনের পর অর্জ্জিত বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পরাঙ্মুখ হইত, অথবা যদি কোন ধনী ব্যক্তি বিদ্যায় উৎসাহ দানে বা পণ্ডিতগণকে পুরস্কৃত করিতে পশ্চাৎপদ হইত, তাহা হইলে সমাজে তাহার কোনরূপ মর্য্যাদা থাকিত না। বর্ত্তমানে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায় আমাদের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বা পণ্ডিতগণের প্রতি কতকটা সহানুভূতিশীল হইলেও পরস্পরের আচার-আচরণ ও ধর্ম্মবিশ্বাস এতই বিভিন্ন যে, হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের মূল ভাব এবং সমাজব্যবস্থা অনুধাবন করা শাসকবর্গের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে আবার হিন্দুধর্ম্ম ও আচার-আচরণের উপর একান্তই বিরূপ, হিন্দুরা ভ্রান্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলিয়া তাহাদের কাহারও কাহারও দৃঢ় ধারণা। এবং এই কারণেই তাহারা হিন্দু-শাস্ত্রানুশীলনের বিরোধী ও আমাদের উন্নতির প্রতি উদাসীন। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য বা উৎসাহ পাইবার আশা করা বৃথা।

"আমাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের তুল্যমূল্য দেওয়া হইতেছে। একের নিন্দা বা অন্যের প্রশংসা কচিৎ করা হয়। এখন অর্থই পদমর্য্যাদার মাপকাঠি। ধনী ব্যক্তিই এখন সকলের মর্য্যাদার্হ।"

কিন্তু এ অবস্থার প্রতীকার আশু আবশ্যক, এবং এজন্য এ-দেশবাসীদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে যে, সত্যকার মান-মর্য্যাদা সুখ-শান্তির নিদান হইল যথার্থ জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞান বহুবিধ—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ ও আচার-ব্যবহার-সম্পর্কিত জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করিলে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অর্থাৎ—ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া সকলের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিদ্যার যে-সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, মাতৃভাষা বাংলায় তাহার অনুবাদ করিলে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইবে, অন্য দিকে তেমনি আমাদের জ্ঞানের পরিচিতি বাড়িবে। অনুষ্ঠানপত্রের নিম্নের অংশ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

"We therefore beg to suggest, that the wise and well-informed men of this country should combine, and, as far as their respective abilities admit, or by the employment of pundits, and translators, the compilation or preparation of literary works, both local and foreign, which may improve the general stock of knowledge ; and publish the same in the name of the authors or compilers ; and we may thus produce a considerable set of works, in a short time, which will be of great general utility."

এখানে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য সমাজ বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষা হইতে দেশী-বিদেশী উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলী অনুবাদ বা সঙ্কলনের জন্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করিবেন। আর অনুবাদক বা সঙ্কলক, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নামে এ সকল প্রকাশিত হইবে। এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে। অবিলম্বে এমন এক গ্রন্থ পুস্তক রচিত হইবে, যাহা দ্বারা বাংলাভাষাভাষী আপামর সকলে বিশেষ উপকৃত হইবে।

প্রস্তাবিত সমাজ দ্বারা আমাদের সামাজিক দুর্নীতিগুলিও নিরাকরণের উপায় হইবে। আর একটি বিষয়েও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। কারণ, বিষয়টি আত্মরক্ষার পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের কদর্থ এবং নিন্দাবাদ করিয়া আসিতেছিল। নানা প্রলোভন দেখাইয়া বহু লোককে খ্রীষ্টান করিয়াও ফেলিতেছিল। তাহারা পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেও কসুর করে নাই। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ দ্বারা পাদ্রীদের এই মিথ্যাচার ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠানপত্রে এ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে :

"It thus appears that the Hindu, who has always been submissive, humble and inoffensive, is now exposed to unprovoked attacks, and is injured in his reputation, and coseqeuently even in the means of subsistence, by persons who profess to seek his good. As yet this cruelty and calumny have been little heeded, and scarcely an effort to repel

them been attempted ; had such conduct been offered to the mussalmans, they would instantly have combined to resent it ; and in like manner it is now incumbent on the opulept and respectable Hindus, who delight not in the abuse of their Shastras and practices, and who wish to cherish and preserve them, to consider well these circumstances, and upon full deliberation, to unite to publish replies to the charge made against us, or to represent our grievances to the Governmet, by whose wisdom no doubt a remedy will be devised."

সমাজ পাদ্রীদের উপদ্রব রোধ করার ভার লইবেন। এই উদ্দেশ্যে সমাজের পক্ষ হইতে পুস্তিকা প্রচারিত হইবে, প্রয়োজন বোধে গভর্নমেণ্টেরও সাহায্য লওয়া চলিবে—অনুষ্ঠানপত্রখানিতে এই মর্ম্মে বিশেষভাবে বলা হইল।

৩

অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঠের পর ইহার বিষয়বস্তু লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। ধর্ম্ম ও রাজসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রসময় দত্তপ্রমুখ কয়েক ব্যক্তি আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু সভার ব্যক্তিগণ অধিকাংশই অনুষ্ঠানপত্রোক্ত বিষয়াদির পোষকতা করিলেন। এই দিনকার সভার বিবরণ অনুষ্ঠানপত্র সমেত পুস্তিকাকারে ছাপিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। রামদুলাল দে (সরকার) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ২৩শে মার্চ ১৮২৩ (১১ চৈত্র ১২২৯)। এদিনকার সভায় দুইটি আবশ্যক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। প্রথমতঃ, নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল—লাড্লিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদক রহিলেন। এদিনকার অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্য্য—একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন। সভাস্থলেই দুই হাজার এক শত একান্ন টাকা এককালীন দান পাওয়া গেল। ত্রৈমাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল দুই শত চৌষট্টি টাকার। রামকমল সেনের প্রস্তাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলেন। এ দিনও ইহার বিষয়বস্তু লইয়া নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথন হইয়াছিল। কলিকাতার বাঙালী সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ, ইংরেজীশিক্ষিত ও অন্যান্য সাহিত্যসেবী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদিনকার সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম হইতেই ইহা প্রতীত হইবে—পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি, রামজয় তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাড্লীমোহন

ঠাকুর, কাশীকান্ত ঘোষাল, উমানন্দ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচরণ ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মতিলাল, রূপনারায়ণ ঘোষাল, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন চক্রবর্ত্তী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, গোপীকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রশেখর মিত্র, বৈদ্যনাথ দাস, বিশ্বনাথ দত্ত, কাশীনাথ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, বিশ্বম্ভর পানি, অদ্বৈতচন্দ্র রায়, মদনমোহন শীল ও শিবচরণ মল্লিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় সভার বিবরণ হইতে একটি বিষয় স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামমোহন রায় তখন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, একেশ্বরবাদ প্রচারে, সতীদাহ নিবারণবিষয়ক আন্দোলনে এবং পাদ্রীদের বিপক্ষতাচরণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল নেতৃবর্গ কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত হয়, তাহাতে রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থীদের মধ্যে কোনই বিরোধ ছিল না। এ কারণ রামমোহন রায় ইহার সঙ্গে যুক্ত না হইলেও স্বদেশের কল্যাণার্থে রামমোহনপন্থী দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়াছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে গৌড়ীয় সমাজের অন্যূন চারিটি সভার উল্লেখ আমরা পাইতেছি। হিন্দু কলেজগৃহে সমাজের অধিবেশন হইত বলিয়াছি। তৃতীয় অধিবেশনও (৪ মে ১৮২৩) সম্ভবতঃ এখানে হইয়াছিল। এই অধিবেশনে 'ব্যবহারমুকুর' নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ পঠিত হয়। এখানির রচয়িতা ভূকৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষাল। গৌড়ীয় সমাজের পক্ষ হইতে এ গ্রন্থখানি প্রকাশের কথা হইয়াছিল। এ সভার বিবরণ দিতে গিয়া 'সমাচার দর্পণ' (১৭ মে ১৮২৩) লেখেন :

"আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি সত্বরই হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্য হইবেন।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ১২)

গৌড়ীয় সমাজের পরবর্ত্তী দুইটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, একটি হইয়াছিল চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮২৩ তারিখে; দ্বিতীয়টি হয় ৮ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে, কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাস-ভবনে। শেষোক্ত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-দান প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' (২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩) পুনরায় লিখিতেছেন :

"এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।" (ঐ, ঐ, পৃ. ১৩)

গৌড়ীয় সমাজের একটি অধিবেশন হয় ১৮২৪ সনের ২৬শে জুন। সমাচার দর্পণের ৩ জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় এই শেষ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সমাজের আনুকূল্যে *অল্প দিনের মধ্যে বেদ পাঠারম্ভ হইবে স্থির হইয়াছিল।*

ইহার পর গৌড়ীয় সমাজের আর কোন অধিবেশনের সংবাদ পাই না। হয় ত সমাজ আরও কিছুকাল চলিয়াছিল। কিন্তু গৌড়ীয় সমাজ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে বঙ্গভাষার অনুশীলন যে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পনর বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বিজ্ঞানপত্রিকা, কাব্য, পুরাণ, ব্যাকরণ, অভিধান, মানচিত্র এবং সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। এমন কি, নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু কলেজের যুবছাত্রগণও বাংলা ভাষার চর্চ্চায় তৎপর হইলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যে দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখী প্রসারলাভ—ইহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের মঙ্গল-হস্ত প্রত্যক্ষ করি। গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক্‌পাল ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে পণ্ডিত, নব্যশিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণেরও অপ্রতুলতা ছিল না। এই সকল সভ্য ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে তৎপর হইয়াছিলেন। বৈদেশিক ধর্ম্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সুলভে প্রচারিত হইতে থাকে। ইহারও মূলে গৌড়ীয় সমাজের প্রেরণা রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ (১২৯৮-১৩৫৯)

ও

বসন্তরঞ্জন (১২৭২-১৩৫৯)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পর পর সাহিত্য-পরিষদ্ দুই জন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কর্মীকে হারাইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের দুই জন নিষ্ঠাবান্ সেবকের অবসান হইয়াছে। দুই জনেই অতি সাধারণভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজ নিজ চেষ্টায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একজন পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন, আর একজন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কর্ম্মব্যস্ত জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গত আশ্বিন মাসে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কার্ত্তিক মাসে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ নানারূপে সাহিত্য-পরিষৎকে অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। ১৩৪০ সাল হইতে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের কর্ম্ম-পরিচালনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন পদে বিভিন্ন সময়ে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি পরিষদের গুরু দায়িত্বনির্ব্বাহে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যখন যে পদেই থাকুন না কেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনিই ছিলেন পরিষদের কর্ণধার—সর্ব্বময় কর্ত্তা। পরিষদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিয়া ইহার ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সাহায্যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার খ্যাতনামা জনপ্রিয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলী প্রকাশে পরম উৎসাহে ব্যাপৃত হন—রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর পরিষৎ-প্রকাশিত সংস্করণ অর্থাগমের একটা নূতন দিক্ খুলিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, সাহিত্য-রসিক বাঙালী এই সূত্রে এই সব গ্রন্থকারদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য শোভন সংস্করণ পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেগুলিও একদিকে যেমন তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করে, অন্য দিকে তেমনি পরিষদের ভাণ্ডার অর্থে ভরিয়া দেয়। তাই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেও অর্থাভাবে পরিষৎকে সে রকম বিপন্ন হইতে হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থগুলি বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে—ইহাদের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অবর্ত্তমানেও যাহাতে গ্রন্থগুলি প্রকাশের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি আংশিকভাবে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী-প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ কর্তৃক পরিপোষিত 'ব্রজেন্দ্রগ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল' ইহার অন্যতম নিদর্শন।

ব্রজেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় মুখ্য কেন্দ্র ছিল সাহিত্য-পরিষদ্। এখান হইতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি প্রচারিত হয়। এই সাধনার পুরস্কার বঙ্গীয় সরকার-

প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্মান 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯৫২ সালে লাভ করেন। তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' 'বাংলা সাময়িকপত্র' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত গ্রন্থগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ বাঙালী সাহিত্য-রসিকের আদর ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের বহুবিস্তৃত সাহিত্য-সাধনার পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার স্থান এখানে নাই। আশা করি, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় একদিন তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি অন্যনিরপেক্ষ ভাবেই তাঁহার বিরাট্ সাধনার জলন্ত নিদর্শন হিসাবে বাঙালীর হৃদয়পটে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করিবে।

বসন্তরঞ্জনের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই। তিনি প্রথমাবধি ইহার সদস্য। সাহিত্য-পরিষদের পূর্বরূপ 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচারে'রও তিনি সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষেই তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রকাশিত হয়। ঠিক কোন্ সময় হইতে বলিতে পারি না, তবে অনেক দিন ধরিয়া তিনি পরিষদের পুথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি পরিষদ্‌কে ক্রমান্বয়ে আট শত পুথি সংগ্রহ করিয়া দেন। এই কার্য্যের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে ইহার বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন।

এই উপলক্ষ্যে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বসন্তরঞ্জনের কার্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> বসন্তবাবু পরিষদের পুথিসংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুথি সংগ্রহের জন্য ইঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তজ্জন্য ইঁহার বাহনের খরচ আছে, খাই-খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দকও লয়েন না বা এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহবশে তিনি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কার্য্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই ইহার সদস্য আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন না কোন কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, অথচ নিয়মিত ভাবে ইহার চাঁদা দেন। পূর্ব্বে তিনি সমস্তিপুরে রেল আপিসে কার্য্য করিতেন। এখন পেন্‌সন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্ব্বস্নেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী সদস্যকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণী—১৭শ বর্ষ, পৃ. ১৩৩)

পরবর্তী কালে অবশ্য বসন্তরঞ্জন কিছু দিনের জন্য পরিষদের পুথিশালার কর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। সেখানকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রথমে পুথিরক্ষক হিসাবে এবং পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনেক দিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৪০ ও ১৩৪৮-৫৩ সালে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হন। কেবল পুথি সংগ্রহ নয়—পুথির বিবরণ

সংকলন এবং মূল্যবান্ পুথির বর্তমান কালোপযোগী ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার কতকগুলি পুথির বিবরণ তিনি সংকলন করেন। উহা পরিষদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা এবং তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাক্রমে ১৩৩০ ও ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সংকলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির বিবরণ 'ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ্ ক্যাটালগ্ অব্ বেঙ্গলি ম্যানুস্‌ক্রিপ্‌টস্ ইন্ দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি' গ্রন্থের প্রথম (১৯২৬ খ্রীঃ অঃ) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২৮ খ্রীঃ অঃ) অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলই বোধ হয় সর্বপ্রথম ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, ১৩১৭), আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারীর গীতাভাষা সারঙ্গরঙ্গদা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী-গ্রন্থাবলী—১৮), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩) প্রচারিত হয়। ইহা ছাড়া, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত মিলিত ভাবে তিনি দুই খণ্ড 'গোপীচন্দ্রের গান' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২, ১৯২৪) ও লালা জয়নারায়ণ সেন-প্রণীত হরিলীলা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭) সম্পাদন করেন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায় সম্পাদিত কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দগুলি বসন্তরঞ্জনের বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। কৃষ্ণকীর্তনের ও গোপীচন্দ্রের গানের টীকা টিপ্পনী অংশ তাহার নিদর্শন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—প্রাচীন বাংলা শব্দের একখানি অভিধান সংকলন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কিছু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।[1]

বসন্তরঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হইতেছে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের আবিষ্কার, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও প্রকাশ। ১৩১৮ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃঃ ১১৩ —১৩২) এই গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং ১৩২৩ সালে ইহা টীকা টিপ্পনী সহযোগে পরিষৎকর্তৃক প্রচারিত হয়। কেহ কেহ গ্রন্থখানির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও সাধারণভাবে পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে সাদরে অভিনন্দন করেন—ইহার ভাষা চণ্ডীদাসের সমকালীন ভাষার দুর্লভ নমুনা হিসাবে পরিগৃহীত হয়। গ্রন্থখানির সম্পাদনায় সম্পাদকের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে সুধীসমাজের প্রশংসা অর্জন করে।

সাহিত্যসাধনার পুরস্কার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে বসন্তরঞ্জনকে 'সরোজিনী বসু পদক' প্রদান করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত করেন।

১। এই প্রসঙ্গে 'দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ' শীর্ষক তাঁহার একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ষড়্‌বিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সংখ্যায়ই একই বিষয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ' প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল হইতে বেদান্তদর্শনের চর্চ্চা প্রচলিত আছে। কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মহামনীষিগণ সকলেই ষড়্‌দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন—তন্মধ্যে বেদান্তদর্শনে অনেকের বিশেষ অভিরুচি ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীধরাচার্য্য স্বয়ং 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে বেদান্তদর্শনে এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন (ন্যায়কন্দলী, পৃ. ৫ দ্রষ্টব্য)। সার্ব্বভৌম পিতৃপরিচয়স্থলে "বেদান্তবিদ্যাময়াৎ" বলিয়া পিতা নরহরি বিশারদের দার্শনিক পক্ষপাত সূচনা করিয়াছেন এবং 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত তাঁহার একটি শ্লোকে "বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং" উক্তিদ্বারা স্বকীয় পক্ষপাতও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম-রচিত বেদান্তগ্রন্থের বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ৪১-৪২)। নব্যন্যায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কবিপণ্ডিত শ্রীহর্ষরচিত বেদান্তপ্রকরণ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া এক পৃথক্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করে—যাহা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, বলা যাইতে পারে। শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহ বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গদেশে শত শত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটিমাত্র নাম গবেষণাদ্বারা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে 'বঙ্গভূষণ চট্ট' বংশ একটি সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিতবহুল গোষ্ঠী। ৪৩ সমীকরণে এই বংশীয় 'শ্রীকণ্ঠ' সম্মানিত হইয়াছিলেন—তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন "ভট্টাচার্য্যাখ্য-গঙ্গাধর ইহ সুকৃতী ন্যায়বেদান্তবেত্তা" ('ধ্রুবানন্দের মহাবংশ,' পৃ. ৫৪)। এই গঙ্গাধর কবি কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

নব্যন্যায়ের চরম অভ্যুদয়কালে অন্যান্য দর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের চর্চ্চা বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে অনাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু চিরলুপ্ত হয় নাই। জগদীশ-গদাধরের যুগেও বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ নানাগ্রন্থকার মহাপণ্ডিত রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি 'বেদান্তরহস্য' রচনা করিয়াছিলেন—তদ্রচিত কাব্যপ্রকাশের টীকায় ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৬১ পত্র)। ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত উলা-নিবাসী রঘুনাথ সার্ব্বভৌম 'সিদ্ধান্তার্ণব' নামে শাঙ্করমতে এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন (L. 2099 – পত্রসংখ্যা ৪৮)। উভয় গ্রন্থই অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেদান্তসূত্রের একজন বাঙ্গালী বৃত্তিকারের পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ করিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্দ্ধমান জিলার মানকরনিবাসী পরমভাগবত হিতলাল মিশ্রের নিকট 'সমঞ্জসা' বৃত্তির প্রতিলিপি প্রথম আবিষ্কার করেন (L. 687—পত্রসংখ্যা ১০৭)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৩৬৭ সং পুথি—

পত্রসংখ্যা ৩৫, মধ্যে ৫—৯ পত্র নাই)। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বৃত্তি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রণার্থ গৃহীত হইয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ইহার আরম্ভবাক্য এই,

স্থত্রার্থ-স্থত্রকৃদ্‌ভাষ্যকৃদ্‌গুরুস্মৃৎসমঞ্জসাং।
বৃত্তিং শ্রীমান্ বক্ত্যনূপনারায়ণশিরোমণিঃ॥

এই গ্রন্থ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে উপহৃত। গ্রন্থশেষের মনোহর শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

কৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়:
খ্যাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।
এষা বৃত্তিরনন্যবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী
শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারায়তাম্॥

বুঝা যায়, গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ধরিতেন এবং 'অনন্য' অর্থাৎ একনিষ্ঠ (গৌড়ীয়) বৈষ্ণবদের জন্য এই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত এবং বাদবিচার-বর্জ্জিত। বহু স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত 'গোবিন্দভাষ্য' কিম্বা তদুপরি বাণীশ্বর-কৃত ব্যাখ্যান এই বৃত্তিতে অনুসৃত হয় নাই। আমরা নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি সূত্রের বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। "ঈক্ষতের্নাশব্দং" (১।১।৫) সূত্রে সকলেই সাংখ্যমতের খণ্ডন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কিন্তু গোবিন্দভাষ্যে ইহার ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সমঞ্জসায় চিরন্তন ব্যাখ্যাই অনুসৃত হইয়াছে ("অথ সদেবেত্যত্র সৎশব্দেন প্রধানমিতি চেৎ। ঈক্ষতেঃ···পরিশেষাৎ সাংখ্যাদিমতীয়ং প্রধানাদি ন জগৎকারণমতোঽশব্দমবেদমূলকম্")। ৩।৩।৫২ সূত্রের (পরেণ চ শব্দস্য ইত্যাদি) ভক্তিপর ব্যাখ্যাটি অভিনব :—"পরেণ পরমেশ্বরেণ চাস্তদ্‌ভক্তেন চ অনুবন্ধঃ স্নেহসংবন্ধঃ তস্মিন্ তন্নিবন্ধমেবাবিশেষস্তাদ্বিধ্যং তদনুকরণঞ্চ। ভক্ত্যাখ্যোপাসনা পরমমুখ্যা। 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরসঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি'। 'ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী'তি শ্রুতিস্মৃতিশব্দস্য ভূয়স্ত্বাৎ। ভিন্নোপক্রম-স্তর্থস্ত 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ, সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মে'ত্যাদ্যুক্তং কৈবল্যেপি পরমফলমিদং ন তু সাধনমাত্রমিতি। ন চাত্র তর্কো যুক্তঃ 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' ইত্যুক্তেঃ॥" (২৬।২৭ পত্র)। গ্রন্থকার বহু স্থলে শঙ্করাচার্য্যাদির মতবিরোধী ভাগবতমতানুযায়ী নিজস্ব মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দুই একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ৪।৪।৭ সূত্রের বৃত্তিতে আছে —"সিবেব আত্মস্বরূপসৌরত ইত্যাদিবৎ চিন্ময়স্বরূপাবস্থত্বেপি তদ্রূপেণ ভোগো যোগমায়য়া (=অচিন্ত্যশক্ত্যা) ঘটতে ইতি ভাবঃ" (৩৪।১ পত্র)। ৪।৪।১০ সূত্রের বৃত্তিতে পাওয়া যায়—"বৈকুণ্ঠপুরবাসস্তু অপ্রাকৃতাচিন্ত্যশক্তেঃ।" (৩৪।২ পত্র)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে "শুদ্ধাদ্বৈত"বাদী এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল, যাহার মতেও "নন্দনন্দন এব ব্রহ্মশব্দবাচ্যঃ"—হরিদাস-রচিত 'বেদান্তসিদ্ধান্তকৌমুদী' নামক অধুনালুপ্ত গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের পরিচায়ক (L, 2100, পত্রসংখ্যা ৬৭)।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে মাত্র পাঁচ পত্রের একটি পুস্তিকা আছে—আলোচ্য গ্রন্থকার-রচিত ভাগবতের সূচী। গ্রন্থারম্ভ যথা,

অমরালীসেব্যমানং নখমণ্যভিশোভিতং।
আশ্চর্য্যং শ্রীপদ্মনাভপাদপদ্মমহং ভজে॥

গ্রন্থশেষ এই,

শাস্ত্রস্কন্ধপ্রকরণাধ্যায়বাক্যপদাক্ষরৈঃ।
সমাধিভাষয়াস্তার্থান্ মুষতাং পাদয়োর্ভজে॥
শ্রীমান্ সমকৃতা(নূপ)নারায়ণশিরোমণিঃ।
বিদ্বদ্বিনোদিনীনাম-শ্রীভাগবতসূচনীং॥
শ্রীসনাতনরূপাদ্যাস্তুলসীদাসমুখ্যকাঃ।
শ্রীপ্রযাগদা(স)মুখ্যাঃ সন্তঃ সন্তু সদা হৃদি॥

ইতি শ্রীঅনূপনারায়ণতর্কশিরোমণিবিরচিতা বিদ্বদ্বিনোদিনী নাম শ্রীভাগবতস্য সূচিকা সমাপ্তা॥

এই পুস্তিকায় তুলসীদাসাদির নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, গ্রন্থকার বাঙ্গালী হইলেও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে নহে।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা কুলপঞ্জীতে আলোচ্য গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি—কুলপঞ্জীর প্রামাণিকতায় সন্দিহান শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করিয়া আমরা তাঁহার কুলপরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি। বারেন্দ্র শ্রেণী বাৎস্যগোত্র 'সান্যাল' বংশের আদি কুলীন লক্ষ্মীধরের অধস্তন নবম পুরুষ "শিখাই সান্যাল" উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমকালীন এবং স্বনামধন্য কুল্লূক ভট্টের জামাতা ছিলেন—তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। শিখাইর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ "বৈষ্ণব মিশ্র" বিখ্যাত কুলীন ছিলেন—আমরা সুপ্রাপ্য নামমালা বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করিলাম না। লাহিড়ীবংশীয় ভারতবিশ্রুত মহানৈয়ায়িক প্রগল্ভাচার্য্যের পিতা "নরপতি মহামিশ্র" বারেন্দ্র সমাজের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন—"করণ" নামক কুলপঞ্জীর বিভাগে তাঁহার কুলক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ১৭টি কুলসম্বন্ধের মধ্যে একটি হইল সান্যালবংশীয় বৈষ্ণব মিশ্রের সহিত (সা-প প, ৪৭, পৃ. ৭৩)। সুতরাং বৈষ্ণব মিশ্রের অভ্যুদয়কাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহামিশ্রের ন্যায় খ্রী. ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অবধারিত হয় (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য গ্রন্থকার বৈষ্ণব মিশ্রের অধস্তন দশম পুরুষ। নামমালা এই—বৈষ্ণব মিশ্র, তজ্জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম (দ্বিতীয়), তৎপুত্র শ্রীপতি (দ্বিতীয়), তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র ভবানীচরণ, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র মুনিরাম, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র "অনুপ সিরোমণি বসৎ বারানসি" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত কুলপঞ্জীর ১৩৫-৬ পত্র)। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে অনূপ শিরোমণির অভ্যুদয়কাল হয় খ্রী. ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। বস্তুতঃ কাশীনিবাসী এই শিরোমণি ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, প্রমাণ আছে। অর্থাৎ

এ স্থলেও এক পুরুষের গড়পড়তা হইতেছে ৩৫ বৎসরের উর্দ্ধে। প্রমাণটি এই—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত খড়ারি গ্রামে "শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ" নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটি সমৃদ্ধ পুথিসঞ্চয় ছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং তাঁহার পুথিগুলি সম্প্রতি ঐ জিলার বাসুদেবপুরনিবাসী সুহৃদ্বর শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের হস্তগত হইয়াছে। আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সৌজন্যে পুথিগুলির তালিকা পরীক্ষা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ১৬৯৪ শকাব্দ হইতে ১৭৫৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৬০ বৎসর ধরিয়া) নানা শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বহু বেদান্তের গ্রন্থ আছে। ১৭২৭ শকাব্দে অনুলিখিত সটীক পঞ্চদশীর শেষে উক্ত শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় স্থলে একটি মূল্যবান্ উক্তি করিয়াছেন—"শ্রীকাশীস্থিত অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি ও শ্রীশঙ্করানন্দস্বামিশিষ্য"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে দুই জনের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—তাঁহার কাশীতে অধ্যয়নকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ পাদ। বলা বাহুল্য, কাশীনিবাসী এই অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণিই যে সমঞ্জসা-বৃত্তিকার, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অতিদুর্লভ নামবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। ভাগবতসূচীতে তুলসীদাসের নামোল্লেখদ্বারা তাঁহার কাশীনিবাস সমর্থিত হয়।

বচনসমস্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট

শ্রীননীগোপাল দাশশর্ম্মা

বচন সংজ্ঞাটির যাবতীয় পরিচিত ব্যাকরণে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কতকগুলি ভাষায় একবচন ও বহুবচন এবং কতকগুলি ভাষায় একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। এই বচন-সংজ্ঞার প্রয়োজন বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে, সাধারণতঃ উত্তর আসিবে, পদার্থের একত্ব বহুত্ব প্রকাশ করাই ইহার কার্য্য। উত্তরটি সমীচীন কি না, একটু বিচার করিয়া দেখা দরকার। একত্ব বহুত্ব প্রকাশ করা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও এই বচনাত্মক সংজ্ঞার প্রধান লক্ষ্য, সাপেক্ষ পদ-গুলির সংযম রক্ষা করা। কতকগুলি ভাষায় বিশেষ্য পদের বচন অনুসারে বিশেষণ ও সর্ব্বনাম এবং উদ্দেশ্য পদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদের বচন নির্দিষ্ট হয়।

এ দেশের ও ভিন্ন দেশের অধিকাংশ প্রাচীন ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক আধুনিক ভাষায় পর্য্যন্ত এই রীতির অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি ভাষায় কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, যেমন য়ুরোপীয় গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় এই প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হইলেও ইংরাজী ভাষায় বিশেষণ পদে সম্পূর্ণভাবে এবং ক্রিয়াপদ রচনায় আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ দেশের সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় এই সাপেক্ষত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিলেও বাঙ্গালা ভাষা এই প্রণালী হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে বচনের অপেক্ষা করে না। সর্ব্বনামপদ প্রয়োজন হইলে পদার্থের একত্ব বা বহুত্ব অনুসরণ করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয়। একবচন বা বহুবচনের অনুসরণ করে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাপেক্ষত্বে বচনের লক্ষ্য, একত্ব বা বহুত্ব তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এক্ষণে উদাহরণের দ্বারা বক্তব্য স্পষ্ট করা যাইবে। সংস্কৃত ভাষায়, যেমন— বুদ্ধিমান্ বালকঃ গচ্ছতি, বুদ্ধিমন্তৌ বালকৌ গচ্ছতঃ, বুদ্ধিমন্তঃ বালকাঃ গচ্ছন্তি, এই তিনটি বাক্যে দেখা যায় যে, **বালক** এই বিশেষ্য এবং উদ্দেশ্য পদ অনুসারে বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ যথাক্রমে একবচনাদি সংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই প্রকার ইংরাজী ভাষাতেও মাত্র **বর্ত্তমান কালে** (Present tense) দেখা যায়, A good boy reads, এবং The good boys read. উদ্দেশ্য পদের একবচন ও বহুবচন অনুসারে ক্রিয়াপদ একবচন ও বহুবচনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষণ পদ একই অবস্থায় আছে।

শতং বুদ্ধিমন্তঃ বালকাঃ গচ্ছন্তি, কিন্তু বুদ্ধিমৎ বালকশতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমতাং বালকানাং শতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমৎ বালকত্রয়ং গচ্ছতি, বালকগণঃ গচ্ছতি, বালিকাসমূহঃ পঠতি, পঙ্কজমালা (সমূহ অর্থে) রাজতি। এই উদাহরণগুলির সর্ব্বত্র বহুত্বের প্রতীতি ঘটিলেও উদ্দেশ্যপদে একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদেও একবচনের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার Many men are going, এখানে men অনুসারে

ক্রিয়াপদে বহুবচন, কিন্তু Many a man is going, A gang of robbers is passing the road, A hard of cows is grazing on the field—সর্ব্বত্র বহুত্ব বুঝাইলেও উদ্দেশ্যপদে একবচন থাকায় ক্রিয়াপদে একবচন ব্যবহৃত হইল।

সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা একটিমাত্র পদার্থ বুঝাইলেও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। অপ (জল) শব্দে বচনের প্রয়োজন না হইলেও বহুবচনে প্রয়োগ করিতে হয়। একবচন বা দ্বিবচনে প্রযুক্ত হইবে না। এই সকল শব্দের বিশেষণ ও সর্ব্বনামে এবং উদ্দেশ্যপদ হইলে ক্রিয়াপদে বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হইবে। অধুনা যে হিন্দী ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করা হইতেছে, তাহাতেও এই প্রণালীর সুস্পষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। অধিকন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল ধাতু ক্রিয়াবাচক বিশেষণে পরিণত হয় এবং প্রয়োজনমত লিঙ্গগত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। উর্দ্দুতেও এই প্রণালীর ব্যবহার আছে। সুতরাং বচনের গুরুত্ব এই সকল ভাষায় সর্ব্বত্র সাপেক্ষ, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় এই অপেক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল পদার্থটি এক কিম্বা একাধিক, তাহাই কোন প্রকারে বুঝানর প্রয়োজন।

বাঙ্গালা ভাষার যে-কোন ব্যাকরণেই একবচন ও বহুবচনের অনেক প্রকার বিভক্তি দেখা যায়। বিশ্লেষ করিলে উহাতে তিন প্রকার বিভক্তিবিভ্রাট দৃষ্টিতে পড়ে। বাঙ্গালার বৈয়াকরণদের ধারণা, যে ভাবেই বহুত্ব বুঝান হউক না কেন, সবগুলিই বহুবচনের অন্তর্গত। সেই হেতু দিগ, গুলি, গণ, সমূহ প্রভৃতির সহিত কে, এর, র প্রভৃতি যুক্ত করিয়া বহুবচনাত্মক বিভক্তি বলা হয়, এবং ঐগুলি প্রাতিপদিকের উত্তর সকল প্রকার বিভক্তিতে যুক্ত করা হয়। এমন কি, সকল বালক, অনেক বইয়ের, বহু লোককে, এই প্রকার পদসংস্থানকেও কেহ কেহ বহুবচন বলিয়া থাকেন। ইহা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ জনের চিন্তার বিষয়। গুলি, গণ প্রভৃতির যোগে যদি বহুবচনাত্মক বিভক্তি বলিতে হয়, তাহা হইলে সমূহবাচক অনেক শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে এবং তাহাদের অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঐ সকল শব্দের সঙ্গে কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া বহু-বচনাত্মক বিভক্তি স্বীকার করা উচিত। সেই মত আর একদিকে টি, টা, খানা, খানি, টুকু প্রভৃতির সহিত কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া একবচনাত্মক বিভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। বিভক্তি নির্দ্দেশের এই অদ্ভুত প্রণালী অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

বিভক্তির সঙ্গে বিভক্তি বলিয়া স্বীকৃত শব্দ, সাধারণ শব্দ এবং অব্যয় শব্দ যোগ করিয়া পুনরায় তাহাদের বিভক্তি সংজ্ঞা নির্দ্দেশের দ্বারা আর এক বিভক্তিবিভ্রাটের সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন কে-দিয়া, এর-দ্বারা, দেরকে-দিয়া, এর-হইতে, এর-মধ্যে, র-তরে, র-লাগিয়া, এর-জন্য ইত্যাদি। এখন দৃষ্টিতে না পড়িলেও অচিরেই উপরে, নীচে, কাছে, ভিতরে, অপেক্ষা, চেয়ে, বিনা প্রভৃতি শব্দের মিলিতরূপে নব নব বিভক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সংস্কৃত বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন পদের অংশবিশেষ কর্ত্তৃক লইয়া তৃতীয়ার একটি

বিভক্তি সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ কর্ত্তৃক এই পদাংশটি চক্ষুর সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও করণকারকের বিভক্তি বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমাসনিষ্পন্ন পদটি ক্রিয়ার বিশেষণ। বাঙ্গালাতেও ইহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণের বিশেষণ বলা চলিতে পারে।

এতদ্‌ভিন্ন সংস্কৃত ভাষার ন্যায় সাতটি বিভক্তির অনুকরণ করিতে যাওয়ায় অকারণ একপ্রকার বিভক্তির কোন স্থলে তিন বার, কোন স্থলে দুই বার পুনরুল্লেখ ঘটিয়াছে। যেমন প্রথমা, তৃতীয়া ও সপ্তমীর কতক অংশ এবং দ্বিতীয়া চতুর্থী সম্পূর্ণ।

বচনের সাপেক্ষত্ব না থাকায় এক দিকে যেমন ভাষায় সরলতার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই এই অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন সংখ্যারহিত নিত্য নব নব বিভক্তির রচনায় শিক্ষার্থীর সম্মুখে বিকট বিভীষিকার সৃষ্টি হইতেছে। কোনও একখানি ব্যাকরণ দেখিয়া আজ কেহ বাঙ্গালার বিভক্তির সংখ্যা ঠিক করিয়া বলিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। অথচ ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া বিভক্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, চারিটি বিভাগে মাত্র সাতটি বিভক্তি ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে বর্ণবিশেষের উত্তর দুই একটি বিভক্তি সামান্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গানুসারে বাঙ্গালা বিভক্তির কোনও রূপান্তর হয় না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসংরক্ষী ভাষাগুলির মধ্যে এই একটিমাত্র ভাষা, যাহাতে বচনের সাপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন, এই নিরপেক্ষতা অপর ভাষাভাষীর বোধের পক্ষে পথ সহজ করিয়া দেয়। এই প্রকার আরও একটি সংজ্ঞা বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহার ফলে তাহার ক্ষীণ রেখা বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য সামান্য গোচরে পড়িলেও অচিরেই তাহা লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সংজ্ঞার নাম লিঙ্গ। প্রবন্ধান্তরে ইহার আলোচনার ইচ্ছা থাকিল।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।
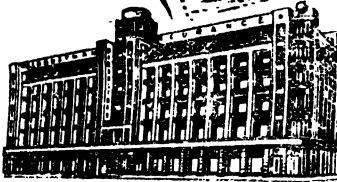
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩
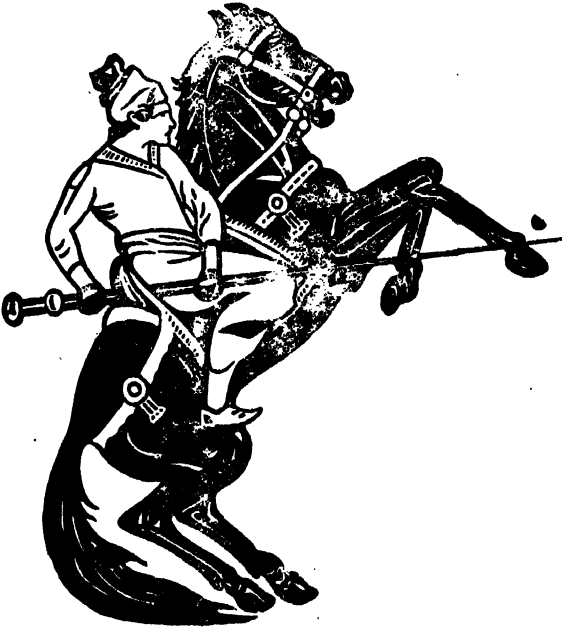
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীগণপতি সরকার
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভপাদার
শ্রীমনোমোহন ঘোষ
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ৪। রেভাঃ ফাদার এ. দোঁতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, ১১। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১২। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৮। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৯। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, ২০। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ২১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬০

চণ্ডীদাস সমস্যা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

চণ্ডীদাসের নাম মধ্যযুগের বাংলা কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। এক দিকে তাঁহার পদাবলীর অনুপম রসৈশ্বর্য্য, অন্য দিকে শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক তাঁহার পদমাধুর্য্য আস্বাদন তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। 'সই, কে বা শুনাইল শ্যামনাম,' 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা,' 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার' প্রভৃতি পদগুলি কাহার না হৃদয়তন্ত্রীতে ভাবের রনরনি সৃষ্টি করে? পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বীরভূমের এক গৃহস্থের গোয়াল-ঘর হইতে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর এক প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া চণ্ডীদাসের রসজ্ঞ পাঠক-সমাজে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। পুথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের লেখায় বোধ হয়, পুথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কিন্তু বসন্তবাবু পুথি সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন (১৩২৩ সালে)। তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের কিম্বা শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোনও পদ তাহাতে নাই। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি চণ্ডীদাস দুই জন?

বোধ হয়, ১৩৩২ সালে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মেলনে চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি। ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি, ৩। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ৪। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫। পণ্ডিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৬। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৭। এই প্রবন্ধলেখক।—(প্রবাসী ১৩৩৩, পৃঃ ৫১২)। কিন্তু ইহার কোনও অধিবেশন হইয়াছিল কি না, তাহা আমার জানা নাই। কেন না, ইহার পর দুই বৎসর আমি প্যারিসে ছিলাম। তাহার পর শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত করিলেন (১৩৪১ সাল)। তখন চণ্ডীদাস যে একাধিক, ইহা অনেকের বিশ্বাস হইল। বাংলা ১৩৪৫ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তাহার পদাবলী-শাখার সভানেত্রী ছিলেন। সেখানে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ চণ্ডীদাস সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমার আলোচনাটি কলিকাতার একখানি দৈনিক পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত (reported) হইয়াছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোনও কোনও প্রাচীনপন্থী লোকের মনে চণ্ডীদাসের একত্ব একরূপ অন্ধ সংস্কারের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া আছে।

চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানের জন্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আমাদের একমাত্র ধ্রুবতারা। আমি ১৩৪৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, (১) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে; তাহার মধ্যে (ক) কোনও স্থানে "দ্বিজ" চণ্ডীদাস বা "দীন" চণ্ডীদাস নাই। (খ) সর্ব্বত্র "গাএ" বা গাইল আছে; কোথাও "ভণে," "কহে" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (গ) ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (২) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (৩) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি "বড়ায়ি" ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধনও করেন নাই। (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, প্রতিনায়িকা নহেন। (৫) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (৬) বড়ু চণ্ডীদাস সর্ব্বত্র প্রেম অর্থে "নেহ" বা "নেহা" ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কেবল চারি স্থলে "পিরিতী" শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে "বিনোদিনী" এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (৯) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। প্রথমে পদকল্পতরু (৺সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত) ধরিতেছি।

৮৫১ নং পদের আরম্ভ :—বিধির বিধানে হাসি আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বন্ধুর তার লাগি পাই॥

ইহার ভণিতার পদ— বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। তাহার কারণ, (১) দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ, (২) বড়ু চণ্ডীদাস কখনও ভণিতায় "বাশুলী আদেশে" বা "ভণে" ব্যবহার করেন নাই। (৩) এই ভণিতা উপান্ত চরণে, যাহা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রয়োগবিরুদ্ধ। দ্বিজ চণ্ডীদাস বহু ভণিতায় উপান্ত বা অন্ত্য চরণে "বাশুলী আদেশে" ব্যবহার করিয়াছেন। আমি শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

৮০৫ নং পদ : আরম্ভ—কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
ভণিতা— বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

৮৬২ নং পদ : আরম্ভ— ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা।
ভণিতা— বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥

৯১৮ নং পদ ; আরম্ভ— এ দেশে বসতি নাই যাব কোন দেশে।

ভণিতা—　　　　　　　　বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে।
　　　　　　　　　　　　বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

৯২৫ নং পদের ভণিতাও—　বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

ভণিতায় কেবল চণ্ডীদাস থাকিলেও "বাশুলী আদেশে" এই বাক্যাংশ দ্বারা আমরা বুঝিব, পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। এইরূপ কয়েকটি পদ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

২০৬ নং পদ, আরম্ভ— কনক বরণ　　　কিয়ে দরপণ
　　　　　　　　　　　　নিছনি দিয়ে সে তার।

ভণিতা—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে　　　যমুনার কূলে
মিলাইল কোন জনে॥

২১০ নং পদ : আরম্ভ—　সজনি—ও ধনি কে কহ বটে।

ভণিতা—　　　　　　কহে চণ্ডীদাসে　　বাশুলী আদেশে
　　　　　　　　　　　　শুন হে নাগর চান্দা।
　　　　　　　　　　সে যে বৃষভানু　　　রাজার নন্দিনী
　　　　　　　　　　　　নাম বিনোদিনী রাধা॥

এই পদে "সুবল সাঙ্গাতি, বৃষভানু রাজার নন্দিনী" এবং "বিনোদিনী রাধা" আছে। এই প্রয়োগগুলি দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই পদ কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৫৫৩ নং পদ ; আরম্ভ—　একদিন বর-　　　নাগর-শেখর
　　　　　　　　　　　　কদম্বতরুর তলে।
　　　　　　　　　　বৃষভানুসুতে　　　সখীগণ সাথে
　　　　　　　　　　　　যাইতে যমুনাজলে।

ভণিতা—　　　　　　কহে চণ্ডীদাসে　　বাসুলী আদেশে
　　　　　　　　　　　　শুন লো রাজার ঝিয়ে।
　　　　　　　　　　তোমা অনুগত　　　বন্ধুর সঙ্কেত
　　　　　　　　　　　　না ছাড়া আপন হিয়ে॥

৭৭৩ নং পদ ; আরম্ভ—　শুন সহচরি　　　না কর চাতুরী
　　　　　　　　　　　　সহজে দেহ উত্তর।

কি জাতি মুরতি কানুর পিরিতি
কোথাই তাহার ঘর ॥

ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িবে কি কর আশ।
পিরিতি নগরে বসতি কর্য্যাছ
পর্য্যাছ পিরিতি বাস ॥

এই পদে ভণিতার অতিরিক্ত "পিরিতি" শব্দের প্রেম অর্থে প্রয়োগ এবং "কর্য্যাছ," "পর্য্যাছ" আধুনিক ক্রিয়ারূপ আমাদিগকে নিঃসন্দেহভাবে জানাইয়া দেয় যে, পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষক দ্বারা বুঝিতে পারি, কোন্ পদ বড়ু চণ্ডীদাসের, কোন্ পদ অন্যের। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

১৪৩ নং পদ, আরম্ভ— হাম সে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।

ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

এই পদে বিশাখা সখীর উল্লেখ আছে এবং রাধিকাকে রাজার ঝি বলা হইয়াছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৬৪১ নং পদ, আরম্ভ— দেয়াসিনী বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকা লখিবার তরে।

ভণিতা, অন্ত্য চরণে— চণ্ডীদাসে কয় সুবুদ্ধি সে হয়
বেকত না করে কাজে।

এই পদে রাধার ননদ কুটিলা, শাশুড়ী জটিলা এবং রাধাকে ভানুসুতা বলা হইয়াছে। সুতরাং পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের নয়।

১৩৫ নং পদ, আরম্ভ— কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।

উপান্ত চরণে ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী সে কালা।

এই পদে 'বৃষভানুসুতা' আছে। ইহার ভণিতাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে কোনও পদে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা থাকিলেও, তাহাকেও কষ্টি-পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি শ্রীশ্রীপদকল্পতরু হইতে কয়েকটি জাল বড়ু চণ্ডীদাসের পদ দেখাইতেছি।

২৮২ নং পদ, আরম্ভ— বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লু
গাঁথিলু ফুলের মালা।

ভণিতা, অন্ত্য চরণে— রস-শিরোমণি আসিব আপনি
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে ॥

"ভণে" শব্দ দ্বারা বুঝাইবে যে, ইহা জাল পদ। "গাএ" শব্দ বসাইলে পূর্ব্বের চরণের সহিত মিল রক্ষা হয় না।

৩৩১ নং পদ, আরম্ভ— সে যে বৃষভানুসুতা।
ভণিতা— শ্যাম বন্ধুর পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥

এই পদের ভণিতা এবং "বৃষভানুসুতা," "শ্যাম" শব্দের প্রয়োগ জাল পদ বলিয়া ধরাইয়া দেয়।

৫৭৫ নং পদ, আরম্ভ— শুনহ রাজার ঝী।
লোকে না বলিবে কী ॥
ভণিতা— উলট করাস মান।
বড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥

এখানে রাধাকে রাজার ঝী বলা হইয়াছে। ভণিতায় "গান" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় "গান্তি" হইবে, তাহাতে ছন্দ থাকে না। সুতরাং ইহা জাল।

আমি এক্ষণে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের "চণ্ডীদাসের পদাবলী" হইতে কয়েকটি পদ দেখাইব, যাহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষায় অন্ত চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

২৫ নং পদ, আরম্ভ— রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
এ কি এ দেখিতে দেখি।
কহেন জননী, শুন বিনোদিনী
বাজিকর উহ পেখি ॥
ভণিতা— অবধান কর বৃকভানু রাজা
খেলাতে করহ মন।
চণ্ডীদাস কহে রাজার গোচরে
খেলায় সে পঞ্চজন।

এই পদে রাধিকার মাতাপিতার নাম কৃত্তিকা ও বৃকভানু রাজা (পুরাণের কীর্ত্তিদা ও বৃষভানু), এবং "বিনোদিনী" শব্দের প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। "বাজিকর" (পারশী বাজীগর) শব্দ ইহাকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছে। এইরূপ ৩২ নং পদের আরম্ভ—

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী
তা সনে সুন্দরী রাধা।
ভণিতা, অন্ত্য চরণ— এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।

এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। এইরূপ ৩৩, ৩৪ প্রভৃতি যে সমস্ত পদে রাধা-জননী কৃত্তিকার উল্লেখ আছে, তাহা অন্য চণ্ডীদাসের।

২১৮ নং পদ, আরম্ভ—

চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে॥

এই পদে "চন্দ্রাবলী" (রাধিকার প্রতিনায়িকা) এবং "শ্রীদাম" প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। এইরূপ ২২০, ২৪১ক প্রভৃতি যে সমস্ত পদে রাধিকার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী কিংবা কোনও সখীর নাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের কোন সখার নাম আছে, সেগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

ব্রজবুলি পদ সম্বন্ধে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্থানে স্থানে আরবি, ফারসী ও মৈথিল শব্দ থাকিলেও তিনি কোনও স্থলে মৈথিলি কারক-বিভক্তি কিংবা ক্রিয়া-বিভক্তির ব্যবহার করেন নাই; সুতরাং তাঁহার পদ যে খাঁটি বাঙ্গলার পদ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।"—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ৯৬ পৃঃ)। ইহাতে তিনি নিম্নলিখিত পদটিকে কৃত্রিম পদ বলিয়াছেন।

১০১ পদ, আরম্ভ,—

ঘন শ্যাম—শরীর কেলি রস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুরাম রঙ্গে কিঙ্কিনি॥

ভণিতা, শেষ চরণে—

চণ্ডীদাস মনে অভিলাস
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে॥

কৃষ্ণের সখাদের নামোল্লেখ এবং ভণিতার কষ্টি-পরীক্ষায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে।

যেমন আমরা বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইয়াছি, সেইরূপ দীন চণ্ডীদাসেরও ভণিতা আমরা পাই। মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে দীন চণ্ডীদাসের কোনও ভণিতা দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ১২৯২ পদটি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে। নীলরতন-বাবুর সংগ্রহে অবশ্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। এই ১২৯২ নং পদে একটি শব্দ আছে বেশালি, তাহা পর্তুগীজ vasilha হইতে উৎপন্ন। দীন চণ্ডীদাসের কোনও পদে বাসলীর নাম গন্ধ নাই। এখানে প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাস কত জন? আমরা দেখাইব, চণ্ডীদাস ৩ জন,—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস।

অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে কিংবা শুধু চণ্ডীদাস নামে অনেকগুলি জাল পদও আছে। আমরা এই সমস্ত জালিয়াত কবির কোন সন্ধান জানি না।

প্রথমে আমরা বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ব্যাকরণে এমন কতকগুলি প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যাহা মধ্যযুগের কোনও কাব্যে পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচনের দুই পৃথক্ রূপ, যেমন একবচনে মোঞ্‌ (মোঞ, মোঞে, মোঞে) চলোঁ, চলিলোঁ, চলিবোঁ, চলিতোঁ; বহুবচনে আহ্মে (আহ্মি) চলি (চলিএ), চলিল, চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞায় চলিউ (চলিউ)। চলিলাহোঁ, চলিবাহোঁ, চলিতাহোঁ উত্তম পুরুষের রূপগুলি। স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার অকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয়, যথা, রাহী গেলী, বড়ায়ি চলিলী। ইহাতে -দের, -দিগের, -দিগকে বিভক্তি এবং করণ কারকে "তেঁ" বিভক্তির প্রয়োগ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সাত স্থানে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের এক বিশেষ ভণিতা দেখি—

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ (চর্থ সং, পৃঃ ২২।২)
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (ঐ, ২৪।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (ঐ, ২৫।১)
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল (ঐ, ৮৪।১)
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (ঐ, ১২৭।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (ঐ, ১৩৩।১)
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (ঐ, ১৩৪।২)

এই সকল ভণিতা হইতে বুঝিতে পারি, কবির প্রকৃত নাম অনন্ত, তাঁহার কৌলিক উপাধি বড়ু এবং চণ্ডীদাস তাঁহার দীক্ষাগ্রহণান্তর গুরুদত্ত নাম।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে গীতগোবিন্দের কয়েকটি পদের অনুবাদ করিয়াছেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি যে তাঁহার রচনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে করিতে পারি যে, তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পাই (৪র্থ সং, পৃঃ ১৪১, ১৪২)—

আহোনিশি যোগ ধেআই।　　মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।　　এবে পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।　　মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞি ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।　　মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।　　এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥

ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, দশমী দুয়ার—পারিভাষিক শব্দগুলি হঠযোগে এবং সহজযানে প্রচলিত। ইহাতে মনে হয় যে, বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতম লিপির কাল ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।"—

(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা)। কিন্তু এখানে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" ঘটিয়াছে। তিনি শূন্য-পদ্ধতির অক্ষরের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর প্রাচীনতম বলিয়া উহার লিপিকাল স্পষ্টতঃ ১৪৪২ শকাব্দকে বিক্রমাব্দ মনে করিয়া ১৩৮৫।৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ শূন্যপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ভুল ধরিয়া দিয়াছেন। (সা-প-প, ১৩২৬, পৃ ৮২)। রাখালবাবুর তুলনার অন্য পুস্তক বোধিচর্য্যাবতার; ইহার লিপিকাল ১৪৯২ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা মোটামুটি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া ৺ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন যে, ইহা ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৪২, ২২ পৃঃ)। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে ইহা "১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে, পূর্ব্বে নয়।"—(ঐ, ২৪ পৃঃ)। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে লিখিত গীত-গোবিন্দের পুথির সহিত তুলনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী বলেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)। এই সমস্ত বিভিন্ন তারিখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ১৪৩৬ হইতে ১৬২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষর প্রায় একরূপ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতম লিপি ইহার পূর্ববর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল যাহা হউক না কেন, ইহার পুথি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক হইতে পারে না। লিপিকর-প্রমাদ ও পাঠবিকৃতি প্রমাণিত করে যে, ইহা কবির রচনার বহু পরবর্ত্তী। আমি চতুর্থ সংস্করণ হইতে উদাহরণ দিতেছি।

লিপিকর বহু স্থলে মূলের ন স্থানে ল পড়িয়াছে ও লিখিয়াছে। নহে (২৯), কাজনে (৩৭), নাগুন (ঐ), নীলাএ (৪০), নবনীল দল (লবলীদল ৪৬), আনুখিনী (৫৩, ১৫৭), আয়াসিনী (ঐ ৯০), লাগিল (৫৭) তিনাঞ্জলী, (৭৩, ৮৯, ১৩৩, ১৫৫), তিন (৮৯), নেহানিলে (১৩১), মৈনাক (১৪৬), দগধিনী (১৪৯), তরাসিনী (১৫০)।

কতিপয় স্থলে লিপিকর ভ্রমবশতঃ দোকর লিখিয়াছে।

কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো ॥
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন। (৩৫ পৃঃ)

দ্বিতীয় লাইনে "শ্রীফল যোড়" এইরূপ কোন শব্দ ছিল।

হার নিল মোর ভাঁগিল বলয়া।
কুণ্ডল নিলেক আগর বলয়া। (৫৬ পৃঃ)
দধিভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে।
মোর পানে চাহে যত লোক জাএ বাটে (=হাটে) ॥ (৭৩ পৃঃ)

লিপিকর কতিপয় স্থলে কয়েকটি চরণ ছাড়িয়া দিয়াছে।

"দধির পসার নাএ চড়াহ আসিয়াঁ" (৬২ পৃঃ), ইহার পর লিপিকর "না জানিআঁ তব চঢ়িতে বুইলোঁ নাএ"—এই চরণটি লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছে। ভাষা দৃষ্টে আমরা ইহাকে মূলের অংশ মনে করিতে পারি। লিপিকর কতটি চরণ বাদ দিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। তাল শিক্ষার পুথির পদ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিশিষ্ট) হইতে আমরা কতিপয় স্থলে লিপিকরের বাদ দেওয়া অংশের পুনরুদ্ধার করিতে পারি।

"নহলী যৌবন রাখিবি কত কাল" (২৬ পৃঃ), ইহার পর অবশ্য এই চরণগুলি ছিল—

চামরী জিনিঞা তোর চিকন কবরী।
মালতীর মালা তাহে বেঢ়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥
বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।
দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে॥
হৃদয়ে মুকুতা হার অমূল্য রতন।
তুঙ্গ (কুন্দ) কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥

এই শেষের দুই চরণের পাঠান্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ—

কোন বিশ্বকর্মে নির্মিল দুঈ তন।
আছ যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন॥ (২৬ পৃঃ)

"সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥" (২৮ পৃঃ), ইহার পর যে চরণগুলি ছিল, তাহা তালশিক্ষার পুথি হইতে পুনরুদ্ধার করা যায় (দ্রষ্টব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিশিষ্ট, ১৬০, ১৬১ পৃঃ)। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তির পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "তোর নাম চন্দ্রাবলী……গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।" যে চরণগুলি আছে, তাহা একটি পৃথক্ পদ। লিপিকর দুইটি পদে জোড়াতালি দিয়া একটি পদ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির পাঠবিকৃতির উদাহরণ আর একটি পদ হইতে দিব। "দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী" (১৩১ পৃঃ), ইহার পাঠান্তর—(দ্রষ্টব্য চণ্ডীদাস-পদাবলী, সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী)।

প্রথম প্রহর নিসি সুসপন দেখি বসি
(নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদসংখ্যা ১৯৬)
প্রথম প্রহর নিশি সুহ সপন বসী
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি)
প্রথম প্রহর নিশি সস্বপন রাশি
(রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস)

এই কয়েকটি পাঠ তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মূল পাঠ এইরূপ ছিল—

প্রথম পহর নিশি সুসপন দেখি বসি।

এই পদে— "লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবে বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে"

ইহার পাঠান্তর— অঙ্গে দেই চন্দন বলে নধর বনচ
আর বায় বাঁসি সুমধুর। (নীলরতন মুখোপাধ্যায়)

অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন
আরে বায় বাঁশী সুমধুর। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি)

অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন
আর বাঁশী বায় সুমধুর। (রমণীমোহন মল্লিক)

এই পাঠগুলি তুলনা করিয়া মূল পাঠ আমরা এইরূপে পুনর্গঠিত করিতে পারি—

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলি মধুর বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
("অঙ্গে দেই চন্দন" পাঠে ছন্দপতন হয়)।

এই পদে— "ঈসৎ বদন করী মন মোর নিল হরী"

ইহার পাঠান্তর— ইসত হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
(নীলরতন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সুতরাং মূল পাঠ এইরূপ ছিল—

ঈষৎ হাসন করি মন মোর নিল হরি

এই পদের ভণিতায়—গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। দীর্ঘত্রিপদী তৃতীয় চরণে দশ অক্ষর থাকিবে। এই জন্য এই পাঠে ছন্দপতন হয়।

ইহার পাঠান্তর— রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
(নীলরতন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে (রমণীমোহন)

ইহাতে মূল পাঠ দাঁড়াইবে—রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

এই পদের পাঠান্তর আলোচনা করিয়া চণ্ডীদাস-পদাবলীর শ্রদ্ধেয় যুগ্ম-সম্পাদক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি।—"দুই এক স্থলে কৃ-কী-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অন্য পাঠগুলি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কৃ-কী-র পুঁথি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুথি ছিল।" (চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৪ পৃঃ)। এক্ষণে আমরা বলিতে চাই যে, অধিকাংশ লিপিতত্ত্ববিদের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল ১৫০০ খ্রীঃ ধরিলে, বড়ু চণ্ডীদাস যে অন্ততঃ ইহার শত বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও বলেন,

"কৃ-কী-র পুরাতন শব্দ ও বিভক্তি প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা) আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল (১৩৫০ খ্রীঃ অঃ) অসম্ভব হয় না।"—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৪২, ৩১ পৃঃ)।

এই চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। জয়ানন্দ মিশ্র (জন্ম ১৫০৫ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন—

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥"

সনাতন গোস্বামী (চৈতন্যদেবের শিষ্য) তাঁহার বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় (১০।৩৩।২৬) বলেন,—"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাঃ শুবাঃ চণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ"। ইহাতে গোস্বামী ঠাকুর কাব্য পর্য্যায়ে গীতগোবিন্দের সহিত চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।—(শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকা। ৺সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত, ৯৫ পৃঃ)। দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় নৌকাখণ্ড বা দানখণ্ডের কোনও পদ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (রচনা ১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) আমরা দেখিতে পাই—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥ (আদি, পরিচ্ছেদ ১৩)
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ মনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ। (মধ্য, পরিচ্ছেদ ২)
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ (ঐ, পরিচ্ছেদ ১০)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রসাদে আমরা এই বড়ু চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের পোষকতায় একটি প্রমাণ পাই। ছাতনার রাজবংশপরিচয়ে আমরা পাই—

মাসাব্ধি বিশিখ শকে   হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে   বাসলী সামন্তভূমে
শিলামূর্ত্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান॥
পাষণ্ড দলন হেতু   ভবাব্ধি তরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।
বিদ্যাপতি তদুত্তরে   গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেম রসগীতি নাহি যার তুলা॥

ব্রহ্মা কাল কর্ণ (কর্ম্ম) অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীর হাম্বির সে হামিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিষেক দিল তার অনেক ব্রাহ্মণ॥

(প্রবাসী ১৩৪৩, আষাঢ়, ৩৪১ পৃঃ)

মাসাব্ধি বিশিখ অর্থাৎ ১২৭৫ শকে বা ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হামির উত্তর ছাতনার রাজা হন। তিনি ব্রহ্ম কাল কর্ণ (কর্ম) অরি অর্থাৎ ১৩২৬ শক বা ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস যে ছাতনার বাসলী দেবীর পূজক ছিলেন, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। আমরা "চণ্ডীদাস" এই নাম এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াইয়ের প্রতি রাধিকার উক্তি হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনি চণ্ডীমূর্ত্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন।

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবে দরশনে।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

ছাতনার বাসলী চণ্ডীমূর্ত্তি। কিন্তু নান্নুরের বাসলী সরস্বতীমূর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের আবিষ্কৃত চণ্ডীদাসচরিতের বর্ণনায় যথেষ্ট অপ্রামাণিক কিংবদন্তী রহিয়াছে (সা. প. প. ১৩৪৪, পৃঃ ৩১)। সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে চণ্ডীদাসকে যে সেকন্দর শাহের (১৩৫৭—৯৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক ও প্রিয়পাত্র বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের প্রস্তাবিত চণ্ডীদাসের সময়ের সহিত খাপ খায়, সুতরাং আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত কবিতা আছে, তাহাও চণ্ডীদাসের কালের সহিত বেশ মিলে।

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে লিখ্যা।
আদি বিধের রস চণ্ডীদাস কিখ্যা॥"

(শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, ভূমিকা ১৫৭ পৃঃ)।

ইহা হইতে ১৩০৫ শক বা ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুকাল। "নবহুঁ নবহুঁ রস" হইতে ৯৯৬ পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার রচিত পদসংখ্যা হইবে।

যোগেশবাবু চণ্ডীদাসচরিতের প্রমাণে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন (সা. প. প. ১৩৪২, পৃঃ ৩০)। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পুথি নির্ভরযোগ্য নহে। আমরা ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিতে পারি।

রামী ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইতে সত্য বলিয়া মনে হয়।

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

(চণ্ডীদাসের পদাবলী, নীলরতন-সং, ৭৬৯ পদ)।

এই পদের ভণিতা নিঃসন্দেহে বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহার পরবর্তী পদ ইহার অনুকরণে দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে রামীর রচিত পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুবিবরণ আছে। চণ্ডীদাস রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে রামীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শুনিয়া বাদশাহের বেগম তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন এবং রাজাকে মনের কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে রাজা রাণী ও চণ্ডীদাসকে বধদণ্ড দান করেন। দণ্ডটি ছিল অদ্ভুত রকমের। হাতীর পিঠে অধোমুখে বাঁধিয়া শিকারী বাজপাখী (বৈরি সন্ধান) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। রামী বলিতেছে—

সুন্ধ কলেবর হইল জর্জর
দারুণ সন্ধান ঘাতে।
এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে ॥
কহেন রামিনী শুন গুণমণি
জানিলাও তোমার রীতি।
বাসুলি বচন করিলে লঙ্ঘন
সুনহ রসিক পতি ॥

আভ্যন্তরিক প্রমাণে এই পদগুলি সত্যই রামীর রচিত বলিয়া মনে হয়। একটি পদে বলা হইয়াছে—"রাজা হে জবনজাতি।" ১৪৩৩ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা গণেশের পৌত্র শমসুদ্দীন আহমদ আসীন ছিলেন (১৪৩১—৪২ খ্রীঃ অঃ)। চণ্ডীদাসের অনুগ্রাহক ছিলেন সিকন্দর শাহ, যাঁহার রাজধানী পাণ্ডুয়া ছিল বলিয়া চণ্ডীদাসচরিতে উল্লিখিত

হইয়াছে। আর তাঁহার দণ্ডদাতা এই শমসুদ্দীন আহমদের রাজধানী ছিল গৌড়। রামীর পদে তাঁহাকে রাজা গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে।

এই বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। আমরা পূর্বে যে ছাতনা রাজপরিচয় হইতে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি ১৩৯০ হইতে ১৪৯০ খ্রী: অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। আমার প্রবন্ধ The Date of Vidyapati, Indian Historical Quarterly, 1944, p. 211ff)। ইহাতে তিনি চণ্ডীদাস অপেক্ষা বয়সে আনুমানিক ২০ বৎসরের ছোট ছিলেন। ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে বিদ্যাপতি ১৩৮০ হইতে ১৪৮০ খ্রী: অব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল (শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ: ১৬৬-১৬৭, ১৬৪, সা: প: পত্রিকা ১৩৩৭, পৃ: ৫৫)। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে (২০৮৮-৯১ পদ) বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। এই পদগুলি সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন যে, প্রথম দুইটি সম্ভবত: বিদ্যাপতির রচিত এবং তাহাদের ভাষা সামান্য বিকৃত হইলেও মৈথিলী। শেষ দুইটি সম্ভবত: বিদ্যাপতির নকলকারী কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচিত, তাহা কিছুতেই বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে না।* আমরা ২৩৮৮ নং পদে দেখি—

"রূপ নরায়ন বিজয় নরায়ন
বৈজনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ কমলক ভৃঙ্গ ॥

এই রূপনারায়ণ শিবসিংহ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শিবসিংহের পিতৃব্যপুত্র নরসিংহের পুত্র চন্দ্রসিংহের রূপনারায়ণ বিরুদ ছিল। বিজয়নারায়ণ নরসিংহের ভ্রাতা। বৈজনাথের উল্লেখ বিদ্যাপতির পদাবলীতে (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ) তিন স্থানে (পৃ: ৫০৪, ৫০৯, ৫২৩) পাওয়া যায়। সম্ভবত: তিনি মিথিলার রাজবংশীয় কেহ হইবেন। ইঁহারা সকলেই সমসাময়িক এবং বিদ্যাপতির অন্তরঙ্গ হইতে পারেন (Vide The Date of Vidyapati, I. H. Q , 1944. p. 216)

এক্ষণে আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দ্বিজ চণ্ডীদাসের আবিষ্কার ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের কৃতিত্ব। তিনি মনে করেন যে, "চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ খ্রী:

* "The first two may possibly be by Vidyapati, at least these are written in Maithili and only has been slightly altered in Bengali......the last two are probably by some Bengali imitator of Vidyapati and could never have been written by our poet." (Indian Antiquary, 1885, p. 193.)

অন্দের এ-দিকে হইবে না।"—(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ)। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় দ্বিজ চণ্ডীদাসেরও পদ আস্বাদন করিতেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুইটি পদে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি পদ প্রসিদ্ধ, যাহার আরম্ভ—"আজু কে গো মুরলী বাজায়।" দ্বিতীয় পদটি সুকুমার বাবু কৃষ্ণদাসের অদ্বৈত কড়চাসূত্রের একখানি পুথিতে পাইয়াছেন। এই পদের শেষ কয়েকটি চরণ এই—

"জন্মিলেও আপনি হরি　　শ্রীচৈতন্য নাম ধরি
সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ।
পরম দুর্লভ ভাবে—　　এই মন্ত্র সভে পাবে
কহ দেখি কিসেরি কারণ॥
কৈলে পূর্ণ অবতার　　বীজ সিদ্ধ নহে কার,
এই হেতু নাম মন্ত্র সার।
আর না করিব ভেদ　　ভক্তগণে অবিচ্ছেদ
কলিযুগে নামের প্রচার॥
আসিবেন আপনি নাথ　　(ভক্তগণ লইয়া সাথ)
নাম প্রেম করিবে স্থাপনে।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস　　সে চরণে মোর আশ
সর্ব্ব ছাড়ি পশিল চরণে॥" (ঐ, ২০২ পৃ.)

সুকুমার বাবু এই দ্বিজ চণ্ডীদাসকেই বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভাব ও ভাষা সর্ব্বপ্রকারে বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্। তিনি এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের সহিত এক বাঙ্গালী বিদ্যাপতির মিলন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটিতে আছে—

"বিদ্যাপতি কহে ভাবিছ কি,
চণ্ডীদাসে বলে রজক ঝি।
বিদ্যাপতি কহে হল্যো সে হয়,
চণ্ডীদাসে তারে সাধকে কয়।
শিবসিংহ রূপনারায়ণ যে,
বিদ্যাপতি কবি লছিমা সে।
চণ্ডীদাস বাণী স্বরূপ সার,
সাধক সাধিতে নাহিক আর।
চণ্ডীদাসে কবিশেখরে বলে,
সুরধুনীতীরে বটের তলে।" (কোচবিহারদর্পণ, ১৩৫২, ৩১৯ পৃঃ)

এই পদ হইতে বোঝা যাইতেছে, মিথিলারাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ, তাহার রাণী

লখিমা (লছিমা) এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ঐতিহ্য লইয়া এই পদটি কোন নকল চণ্ডীদাসে রচনা করিয়া চালাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এই পদ হইতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের সহিত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির সম্মিলন প্রমাণিত হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় দ্বিজ চণ্ডীদাসও বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন। তাঁহার বহু ভণিতায়—"বাসলী আদেশে" এইরূপ বচন দেখা যায়। আমরা পূর্বে এইরূপ কয়েকটি পদের উল্লেখ করিয়াছি। আমরা কিংবদন্তীতে পাই যে, চণ্ডীদাস নান্নুরের বাসলী দেবীর পূজারী ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসই নান্নুরের বাসলীর পূজক ছিলেন। সপ্তদশ শতকের এই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের তারানাম্নী এক রজকী সঙ্গিনী ছিল।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্তথা॥
(সা. প. প. ১৩৪০, পৃঃ ২৭)

সম্ভবতঃ এই তারাকে বড়ু চণ্ডীদাসের রামীর সহিত গোলযোগ করিয়া রামী বলা হইয়াছে কিংবা তারার নামান্তর রামী ছিল কিংবা তাহার পুরা নামটি ছিল রামতারা। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহাও সম্ভব যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোনও সাধন-সঙ্গিনীই ছিল না, কেবল বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত গোলযোগে রামীকে তাঁহার সাধন-সঙ্গিনী করিয়া কেহ কয়েকটি পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের নামে রচনা করিয়াছে। আমরা এইরূপ একটি পদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। চৈতন্য-ধর্মাশ্রিত একজন বৈষ্ণবের পক্ষে এই সাধন-সঙ্গিনী রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সহজিয়ারা যেমন চৈতন্যদেব, রামানন্দ রায় প্রভৃতি মহাজনগণেরও সাধন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছে (সা. প. প. ১৩২৬ পৃ. ১৪৫), সেইরূপ এই দ্বিজ চণ্ডীদাসেরও সাধনসঙ্গিনী গড়িয়াছে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদের ভণিতায় শ্রীরূপের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি চৈতন্যশিষ্য রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥
(নীলরতন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস, ৭৮২ নং পদ)

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা মাত্র কয়েকটি আরবী পারসী শব্দ পাই—কামান (ধনুক), খরমুজা, গুলাল, বাকী, মজুর, মজুরিয়া, লেম্বু। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে আমরা অনেক আরবী-পারসীজাত শব্দের প্রয়োগ দেখি। আমি শ্রীশ্রীপদকল্পতরু হইতে পদ-সংখ্যা সহ উদাহরণ দিতেছি—কারিগর (১৫৩, ৮৯২), বণাল্যে, খুসি (১৯৮), দাগ (৩৯৪), দোকান (৬৪০), মহল (৬৩৭, ৬৪১, ৬৪৩), খুসি (৬৩২), তকল্লবি (৬৪৪), বানাইয়া

দরিয়া (৮৮১), বিদায় (৯৩৩), বালিস, বদল (১৫১২)। ইহাতে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষা পরবর্ত্তী সময়ের, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

এখন দীন চণ্ডীদাসের কথা। মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, দীন চণ্ডীদাসের পদগুলিই দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়াছে। কিন্তু স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু স্বীকার করেন যে, দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতাতে বাশুলীর কোনও উল্লেখ নাই। অধিকন্তু আমি বলিব, তাহাতে রজকিনী, রামী বা নান্নুরেরও উল্লেখ নাই। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৫৩২ নং পদের ভণিতা—　　বাশুলী নিকটে　　চণ্ডীদাস রটে

এমন কাহার কাজ।—(পদকল্পতরু, ৬৪৪ নং)

৫৩৪ নং পদের ভণিতা—ধোবিনী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি রচিল আনন্দ বটে। (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৬৪০ নং)। এই দুইটি পদ দীন চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। মণীন্দ্রবাবুও এই দুইটি পদকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন। আমরা এইরূপ অনেকগুলি পদ পাইয়াছি, যাহাতে বাশুলী, রজকিনী (ধুবিনী), রামী বা নান্নুনের উল্লেখ আছে, অথচ এই পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসেরও নয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের অতিরিক্ত আর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, যিনি চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস, এই নামে পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এইমাত্র দেখাইলাম যে, দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে বাস্তবিক এক পদকর্ত্তা ছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের অনেক পদে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন, যেমন বড়ু চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন নাই। দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্যও তাঁহাদের রচিত পদগুলির সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শনীর কার্য্য করিবে। আমরা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসাদে এই দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি (সা. প. প. ১৩৩৭, পৃ. ৪৮)। নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের চণ্ডীদাস নামে এক শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতি দীনে॥

নরোত্তম ঠাকুরের প্রশংসায় দীন চণ্ডীদাসের একটি পদ আছে। তাহার ভণিতা—

নরোত্তম রে বাপ রে ডাকি স্তাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহু কত দিনে পদযুগ হবে লাভ॥

বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস, কেহই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন নাই। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস কতিপয় পদ ব্রজবুলিতে রচনা করেন। হরেকৃষ্ণবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, এই দীন চণ্ডীদাসের সহিত এক কবিরঞ্জন উপাধিধারী ছোট বিদ্যাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। এই কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে,

বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণবাবুর মত প্রমাণে টিকিতে পারে না, আমরা তাহা দেখাইতেছি।

নরোত্তম ঠাকুরের কাল সম্বন্ধে ৺মৃণালকান্তি ঘোষের মত এই যে, তিনি অনুমান ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন (শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী, ভূমিকা, ১৯১, ১৯২ পৃঃ)। ইহাতে *তাঁহার শিষ্য দীন চণ্ডীদাসকে আমরা ১৭শ শতকের পূর্ব্বে মনে করিতে পারি না।* *মণীন্দ্রবাবুও মনে করেন যে, "১৭০০ হইতে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী* প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।"—(দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩া৶০)। আমরা দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক মনে করিতে পারি। তাঁহার পদে পর্ত্তুগীজ শব্দজাত 'বেসালি' শব্দের ব্যবহারে তাঁহাকে সপ্তদশ শতকের পূর্ব্বে ফেলা যায় না।

এক্ষণে আমরা কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সময় ।স্থির করিতে চেষ্টা করিব। জগবন্ধু ভদ্রের মতে তাঁহার গুরু রঘুনন্দন ঠাকুরের জন্ম ১৪৩২ শকে বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৫৫ শকাব্দে বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬শ শতকের মধ্যভাগের লোক। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন দৈবকীনন্দন সিংহ কবিশেখরকে এই কবিরঞ্জনের সহিত এক মনে করিয়াছেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২১৯-২২১ পৃঃ)। রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কবিশেখরের একটি পদে নসরৎ সাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কবি শেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি॥

(রাগতরঙ্গিণী, দরভাঙ্গা-রাজ প্রেস, পৃ. ৪৫)।

৺সুধীরচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কীর্ত্তনপদাবলীতে (১৫৯ পৃঃ) এই পদের ভণিতায় কবিরঞ্জন আছে—

কবি রঞ্জন ভনে অশেষ অনুমানি।
বায়ে নসরৎ সাহ ভুলল কমলা বাণী॥*

এই নসরদ বা নসরত শাহ গৌড়েশ্বর নাসীরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৪১৯-১৫৩৩ খ্রীঃ)।

* এই পদের আরও একটি ভণিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ নং পদে নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি।
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী॥

পদকল্পতরুর পদে (১৯৭ নং) বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। এই বিদ্যাপতি বাঙালী। কবি শেখর ভণিতার পাঠান্তরে কবি রঞ্জন আরও একটি পদে (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২১৮৯) পাওয়া যায়।

ইহাতেও এই কবিশেখর বা কবিরঞ্জন ভণিতার বাঙালী বিদ্যাপতিকে ১৬শ শতকের মধ্য-ভাগের পরে ফেলিতে পারা যায় না। সুতরাং দীন চণ্ডীদাসের সহিত বাঙালী বিদ্যাপতির মিলন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

(বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০)। বাঙ্গালী কবিশেখরের ভণিতা যে বিদ্যাপতি ছিল, তাহা *সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের বিদ্যাপতির পদাবলীর ৫০০ ও ৫০৪ নং পদ দুইটি হইতে বুঝা যায়। উভয় পদ স্পষ্টতঃ একই কবির রচিত, অথচ ৫৩৩ নং পদের ভণিতা কবিশেখর এবং* ৫৩৪ নং পদে বিদ্যাপতি।

আমরা আর একটি পদ হইতে কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি যে নসরৎ সাহের সময়ে ছিলেন, তাহা জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের বিদ্যাপতির পদাবলীর ৪৪ নং পদের ভণিতা কীর্ত্তনানন্দে আছে—

নসীর শাহ ভানে
মুঝে হানল নয়ন বাণে
চীরেঁ জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।

ইহার পাঠান্তর ৺সুধীরচন্দ্র রায় এবং শ্রীমতী অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কীর্ত্তন-পদাবলীতে এইরূপ—

ঈসত হাসনি সনে—
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চীর জীব রহু পঞ্চ গোড়েশ্বর
শ্রী কবিরঞ্জন ভনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ নং পুথিতে ইহার পাঠান্তর—

সাহা হুসেন জানে
জাকে হানল বয়ন বানে
চিরঞ্জীবী রহু পাঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।

মূল পাঠ এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—

সাহা নসীর জানে
জাকে হানল নয়ন বানে
চীরেঁ জীব রহু পঞ্চ গৌরেসর
শ্রীকবিরঞ্জন ভানে।

কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

(১)

মধ্যযুগের সাধনার ইতিহাসে কবীরের নাম সোণার অক্ষরে লেখা। সারাজীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাকে, উপলব্ধিকে, সত্যানুসন্ধিৎসাকে রূপ দিয়ে গেছেন কবীর তাঁর বচনে। বিদ্যাচর্চ্চা যদি কাগজ কলমের জিনিষ হয়, তা হ'লে তিনি বিদ্বান্ ছিলেন না। কেন না, তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'মসী ও কাগজ তিনি ছোঁননি'। অথচ তাঁর বাণীর মাঝখানে স্থান পেয়েছে নাথ-সহজিয়া-বাউল-আউল-বৈষ্ণব-সুফী সম্প্রদায়ের অনেক কিছু। স্থান পেয়েছে সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনা, স্থান পেয়েছে উপনিষদের 'তৎ ত্বমসি'। অনেক কিছুকে তিনি মনের মাঝখানে এনেছেন, কিন্তু গ্রহণ করেননি কোনওটি সম্পূর্ণতঃ। তাঁর বিদ্রোহের সুরে ভরা বাণী জানিয়ে দিয়েছে যে, 'চৌরাশী সিদ্ধ,' 'নাথ মছিন্দর,' 'গোরখনাথ,' 'মহাদেব,' সবাই সেই মরণপথে চলেছে। মিথ্যা তাদের সাধনা। মিথ্যাই হিন্দু করছে হিন্দুয়ানী, আর মুসলমান করছে 'কোরবানী'। মনের মধ্যে রয়েছে 'প্রভু,' রয়েছে 'প্রিয়তম'; তারই সন্ধানে মক্কা, মদিনা, কাশী, বারাণসী ছুটোছুটি কেন? মনের মানুষকে চিনে নাও, তবে মরার বাঁধন টুটবে। জীব ও পরমের মিলনসাধনাই কবীরের সাধনা। অন্য দিক্ হ'তে আবার কবীরের সাধনা মিলনের সাধনা। সে মিলন মানুষের সঙ্গে মানুষের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, ভাষার সঙ্গে ভাষার। সকল সম্প্রদায়কে তিনি গ্রহণ করেছেন, আবার সব সাম্প্রদায়িকতাকে করেছেন বর্জ্জন। বিশেষ ক'রে সুফী বা বৈষ্ণব ধর্ম জীব ও ঈশ্বরের মিলন-গান গেয়েছে, সিদ্ধাচার্য্যরা বলেছেন 'সহজ'-সাধনার কথা, আর নাথযোগীরা যোগসাধনার বিচিত্রতার দ্বারা সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এ সকল কথাই কবীরের মধ্যে আছে। সকল সম্প্রদায়ের সত্যকে স্বীকার করেছেন, অসত্যকে করেছেন বর্জ্জন।

কবীরের সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়নি। গত শতাব্দীর ফরাসী দেশের গার্সাঁ দ্য তাসী হ'তে এ যুগের বাংলা দেশের ক্ষিতিমোহন পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ যুগের হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল, অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, ডাঃ পীতাম্বর দত্ত বরথ্বাল এবং ডাঃ রামকুমার বর্মা বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন সাহিত্যের দিক্ থেকে। সাহিত্য ও ভাষার দিক্ থেকে শ্যামসুন্দর দাস-এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর অতি উচ্চাঙ্গের ভাষাগত আলোচনা করেছেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ উদয়নারায়ণ তিবারী। নাথ-বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যদের সঙ্গে সাধনার ও বাণীর দিক্ থেকে অপূর্ব্ব আলোচনা করেছেন ডাঃ প্রবোধ বাগচী ইংরাজীতে, এবং ডাঃ সুকুমার সেন বাংলাতে। এঁরা

সকলেই কবীরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ও জীবনদর্শনের উপর, ভাব ও ভাষার উপর, চমৎকার আলোচনা করেছেন। তবু মনে হয়, এখনও বোধ হয় কবীর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। মনে হয়, কবীরের সঙ্গে বাংলা-বিহার অঞ্চলের নিবিড় যোগ ছিল, এই অঞ্চলের সাধনার ধারাটিই বাণীরূপ পেয়েছে কবীরে। শঙ্খের ভিতর সমুদ্রের কোলাহল শোনবার মতই চেষ্টাটি করেছি। কবীরের ভিতর বাংলা-বিহারের সাধনার প্রাণস্পন্দনটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে।

কবীরের সময়

কবীরের জন্মসময় নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতানৈক্য আছে। ডাঃ হাণ্টার বলেন, ১৩৮০ খৃঃ অঃ, বেসকট ১৪৪০ খৃঃ অঃ, শ্যামসুন্দর দাস বলেন ১৩৯৯ খৃঃ অঃ, ডাঃ রামকুমার বর্মা বলেন ১৩৯৮ খৃঃ অঃ। মৃত্যুসময় নিয়ে মতানৈক্য বিশেষ নেই। অনেকেই নির্ভর করেছেন সেই শ্লোকের উপর, যেখানে বলা হয়েছে কবীরের মৃত্যুতিথি "সম্বৎ পন্দ্রহ সো পছতরা" বা ১৫৭৫ বিক্রমসংবৎ অর্থাৎ ১৫১৮ খৃঃ অঃ।

কবীরের ধর্মমত

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে কবীর নাথধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন 'গোরখনাথ'-এর কাছে, সুফীধর্মের দীক্ষাগুরু 'শেখ তকী,' আর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছিল রামানন্দের কাছ থেকে। এই প্রথম দুই জনের সঙ্গে কবীর যে মিলিত (বা অনুপ্রাণিত) হননি, তা নিয়ে অনেক পণ্ডিতই একমত। রামানন্দের নিকট দীক্ষা ও জ্ঞানলাভের বিবরণ অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না (যেমন শ্যামসুন্দর দাস : কবীর গ্রন্থাবলী : ভূমিকা)। অনেকে করেন। কিন্তু কবীরের কাব্য যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন, নাথ-সম্প্রদায়ের গুরুদের কথা তিনি স্মরণ করেছেন; কোথাও গ্রহণ করেছেন যোগসাধনার কথা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও তাঁর উপর প্রচুর। তাই শ্যামসুন্দর দাস 'কবীরগ্রন্থাবলী' সম্পাদনা ক'রে বলেছেন, "কবীর সারতঃ বৈষ্ণব থে।"—(ক-গ্রন্থাবলী : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১৭)। বৌদ্ধ-নাথ-সিদ্ধাচার্যেরা অনেকেই নালন্দায় ছিলেন, তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে সহজিয়া সাধনরীতি চলে চলে এসে কি কবীরে এসে ঠেকেছে? 'চর্যাপদ' বা 'বৌদ্ধ-গান ও দোহা'র সঙ্গে কবীরের কি বিচিত্র মিল! এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। যাঁরা দেখতে চান, তাঁরা দেখুন :—

(১) হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস : রামচন্দ্র শুক্ল, (২) গোরখবানী : বরথ্বাল : ভূমিকা, (৩) হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস : ডাঃ রামকুমার বর্মা, (৪) কবীর : পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, (৫) আর্লি মিডিভ্যাল মিষ্টিসিজম এ্যাণ্ড কবীর : বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি (ইং) মে-জুন, ১৯৪৫, (৬) চৌরাসী সিদ্ধ : সরস্বতী (হিন্দী), জুন, ১৯৩৯ : রাহুল সাংকৃত্যায়ন, (৭) হিন্দী ভাষা ঔর উসকা সাহিত্য

কা বিকাস : হরি ঔধ, (৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : ডাঃ সুকুমার সেন।) মোটামুটি অনেকেই বলেছেন যে, কবীরের মধ্যে সিদ্ধাচার্য্যদের সাধনা নাথসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এসে হাজির হয়েছে। তাঁদের ভাষা, তাঁদের উপমা, রূপক ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ আলোচনা ক'রে বলেছেন, "মেরা অনুমান হৈ কি কবীর পর ইন সিদ্ধোঁ কা প্রভাব নাথপন্থিয়োঁ কী মধ্যস্থতামেঁ হী আ পড়া"। এ মত অনেকেরই (শুক্ল : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১ ; বরথ্বাল : গোরখবানী : ভূমিকা ; বর্মা : পৃষ্ঠা ৭৭)। কিন্তু নাথপন্থীদের দ্বারাই কি সিদ্ধাচার্য্যদের বাণী ও সাধনার ধারা কবীরের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে ? সিদ্ধাচার্য্য, যাঁদের রচনা আমরা বাংলা চর্য্যাগীতিকার মধ্যে পাই, তাঁরা খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন, আর কবীর ত পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক! এঁদের মধ্যে মিলন ঘটালো কে ? সাংকৃত্যায়নজীর কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, "ভাবনা ঔর শব্দ সাখীমেঁ কবীর সে লেকর রাধা স্বামী তক কে সভী সন্ত চৌরাসী সিদ্ধোঁ কে হী বংশজ কহে জা সকতে হৈ।...পরন্তু কবরী কা সম্বন্ধ সিদ্ধোঁ সে মিলানা উতনা আসান নহী. হৈ।"

নাথপন্থীরা হয়তো বহন ক'রে এনেছিল সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনা, কিন্তু কবীর কি কেবল নাথপন্থীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ? কই, কবীরের মধ্যে নাথ গুরুদের প্রতি তো গভীর ভক্তি নেই! বরঞ্চ বিদ্রূপের সুরই ত ধ্বনিত। দেখুন—

(১) "নাথ মছিন্দর বাঁচে নহী, গোরখদত্ত ঔ ব্যাস।
কহহিঁ কবীর পুকারিকে, পরে কালকী ফাঁস॥"

নাথধর্মে যোগ, আসন, পবনরোধই ত আসল। কিন্তু কবীর বলেন—

(২) "আসন পবন যোগ শ্রুতি স্মৃতি। জোতিষ পঢ়ি বৈলানা।" অথবা

(৩) "আসন উড়ায়ে কৌন বড়াই"...

বিন্দুরক্ষণ নাথধর্মের একটি বড় কথা। কিন্তু কবীর বলেন—

(৪) "বিন্দু রাখ জো তরয়ো ভাই। খুসরৈ ক্যোঁ ন পরম গতি পাই।"

সগুণ শিব-উমার প্রতি গভীর ভক্তি নাথধর্মে আছে। কিন্তু কবীর বলেন—

(৫) "মহাদেব মুনি অন্ত ন পায়া। উমা সহিত উন জন্ম গঁবায়া।" অথবা

(৬) "শীব সহিত মুয়ে অবিনাশী।"

মনে রাখতে হবে, সিদ্ধাচার্য্যেরা ছিলেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্নস্তরের হাড়ি-ডোম-কেওট প্রভৃতি। কবীরের জন্মও নীচ জোলাবংশে। পরবর্ত্তী সন্তরা প্রায় সকলেই এই নীচবংশের।

কবীরের ভোজপুরী ভাষা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবীর ছিলেন সেই বিহারের নিকটস্থ অঞ্চলে, যেখানে সিদ্ধাচার্য্যেরা বহুদিন পূর্ব্বে সহজসাধনার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে হয়, এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরাগত সহজ-সাধনা ও নাথসাধনার পটভূমিকাতে কবীরের জন্ম হয়েছে। সিদ্ধাচার্য্যদের সঙ্গে সহজযান শেষ হয়নি, তা

শিষ্যপরম্পরায় অব্যাহত অবস্থায় এসেছে আউল বাউলদের মধ্য দিয়ে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্য দিয়ে। নিত্যানন্দ সেই আউল-বাউল-অবধূত মার্গের মধ্যে জীবনের সার্থকতার সন্ধান করেছেন। সেই 'সাহজিক প্রেমধর্মে'র স্বরূপলক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রায় রামানন্দ, রূপ গোস্বামী। সেই 'সহজ-সাধনা' বৈষ্ণবদের রাগানুগাভক্তির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে চৈতন্যোত্তর সহজিয়া-সাধন ধর্ম স্রোতকে টেনে নিয়ে এসেছে। (দেখুন 'পোস্ট চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট': মণীন্দ্রমোহন বসু।) পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন 'বাংলার সাধনা' গ্রন্থকের (booklet) ৪০।৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, বৈদিক যজ্ঞীয় ধর্মের বিরুদ্ধে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং নাথধর্ম বিদ্রোহ করেছিল খুব সম্ভব বাংলা হ'তেই। বাংলার সাধনার ধারা রক্ষিত আছে মহাযান বৌদ্ধধর্মে, নাথধর্মে, তান্ত্রিকাচারে ও বাউল-সাধনায়। আর কবীরের মধ্যে মহাযানীদের কথারই পুনরাবৃত্তি। কবীর ছিলেন জাতিতে জুলাহা অর্থাৎ যোগী-নাথ-বংশের।

বাংলা-বিহার : ধর্মের ধারা

কবীরের সময়কার বা তাঁর কিছু পূর্ব্বেকার বাংলা-বিহারের ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় নিম্নলিখিত ধারা—

(ক) সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনার ধারা। বাণীরূপ পেয়েছে 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'তে, 'চর্য্যাপদে' আর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে।

(খ) আউল-বাউলের সাধনার ধারা। এঁরা সুফীধর্ম ও সহজধর্মের ভিতর মিলন সাধন করেছিলেন। কবীরও স্মরণ করেছেন আউলদের—"সুর নর মুনি জতি পীর ঔলিয়া।"

(গ) বাংলা-বিহার অঞ্চলে বয়ে আসছিল বৈষ্ণব সাধনার ধারা। বাংলা দেশে 'পাহাড়পুর'-চিত্রাবলী সেই বৈষ্ণবসাধনাকে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দিয়েছে। বাংলা দেশে সংগৃহীত সংস্কৃত কবিতার প্রাচীনতম (?) সংগ্রহগ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং "সদুক্তিকর্ণামৃত"তে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পদ তারই প্রমাণ। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" সেই বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্যরূপ। বাংলার চণ্ডীদাস, মালাধর বসু এবং মিথিলার বিদ্যাপতি তারই "ভাষা"-রূপ দিয়েছেন।

(ঘ) বাংলার পাল-রাজারা তাঁদের বিস্তৃত রাজ্যের ভিতর দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধধর্ম বা সহজযান প্রভৃতির উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নজীর আছে।

(ঙ) বাংলা-বিহারের সেন-রাজাদের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত হয়েছিল বাংলার ভিতরে ও আশে পাশে বৈষ্ণবধর্ম একরূপে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

(চ) নাথধর্মের আদি-সিদ্ধ বলে স্বীকৃত মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ বা 'মছন্দরনাথ' বাংলার লোক ছিলেন। কবীরের সমসময়ে বাংলাতে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে নাথধর্ম কি অপূর্ব্ব ভাবে মিলিত হয়েছে, তা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পাঠ করলে আমরা জানতে পারি। 'শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনে'র একটি পদে ("আহোনিশি যোগ ধেয়াই") শ্রীকৃষ্ণ নাথযোগীর ন্যায় ধ্যান করছেন, নারী রাধিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন এবং এই ভাবে সাধনমার্গে অগ্রসর হবার কথা বলেছেন। গোবিন্দদাসের একটি পরবর্ত্তী কালের পদে শ্রীকৃষ্ণ নাথপন্থী যোগীর ন্যায় "গোরখ জাগাঈ" শিঙাধ্বনি করতে করতে রাধিকার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

কবীরের মধ্যে বাংলা-বিহারের সাধনরীতির সমন্বয়

(ক) চর্য্যাপদের সিদ্ধাচার্য্যদের কথা অজানা ছিল না কবীরের। তিনি স্মরণ করেছেন "অক্ল চৌরাসী সিদ্ধ" কে। কবীরে সিদ্ধাচার্য্যদের ব্যবহৃত উপমা রূপক অজস্র (দেখুন কবীর : দ্বিবেদী)। প্রকাশের দিক্ থেকে আমার যে সমস্ত মিল মনে এসেছে, তা নিয়ে দেখাচ্ছি।

চর্য্যা	কবীর
১। সুনে সুন মিলিআ জবেঁ	১। সুন্ন সহজ মন সুমিরতে।
২। তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা শবরো মহাসুখে সেজী ছাইলী।	২। সহজে বপুরে সেজ বিছাবুল সুতলিঁউ মইঁ পাঁব পসারী।
৩। বাম দাহিণ দো বাটাচ্ছাড়ী	৩। বায়েঁ দাহিনে তজো বিকারা।
৪। মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।	৪। সাসু ননদ পটিয়া মিলি বঁধ লো।
৫। চন্দ সুজ্জ দুই চকা।	৫। চাঁদ সূর্য্য দুই গোড়া কীন্‌হা।
৬। টালত মোর ঘর।	৬। কবির কা ঘর শিখরপর।
৭। কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল।	৭। কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ হৈ।
৮। (এই পদটি হুবহু মিল প্রদর্শন করে। ডাঃ সুকুমার সেন ৭নং ৮নং পদ নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।)	৮। (ডাঃ সেন, খুব সম্ভব শ্যামসুন্দর দাস সম্পাদিত 'কবীর' হ'তে পাঠ দিয়েছেন। ডাঃ সেনের পাঠ সুপ্রচলিত। আমি রাঘবদাস-সম্পাদিত কবীরের পাঠ দিলাম। সামান্য পাঠভেদ লক্ষণীয়।)
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে। পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥	বৈল বিয়ায় গায় ভই বন্‌ঝা। বছরু দুহএ তিনি তিনি সন্‌ঝা॥
* * *	* * *
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝঅ। ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥	নিত উঠি সিংহ স্যার সোঁ জুঝৈ। কবিরা কা পদ জন বিরলা বুঝৈ॥

'হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা' গ্রন্থে পণ্ডিত দ্বিবেদী-জী (৩৬ পৃষ্ঠায়) সরহপাদের একটি পদাংশের সঙ্গে কবীরের পদাংশের ভাষা-সাম্য প্রদর্শন করেছেন। এ রকম অজস্র পদ সিদ্ধাচার্য্যদের রচনার মধ্য হতে কবীরের মধ্যে প্রায় দুই শতাব্দী পরে বাণীরূপ পেয়েছে। সিদ্ধাচার্য্যদের গান চলে এসেছে সাধকপরম্পরায়, কবীরের গানে আবার তাকে নূতন

ক'রে পাওয়া গেল। এমনি গানের ধারা বাংলার বাউল-আউলদের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নাথসাহিত্যে, পাওয়া যায় সহজিয়া সাহিত্যে। সিদ্ধাচার্য্যরা অনেকেই বাঙালী ছিলেন। সেই বাঙালীর পুরোনো গানকে আবার আমরা লক্ষ্য করি কবীরে। কে নিয়ে গেল এই কাব্যের ধারাকে কবীরের মধ্যে? নাথ-পন্থীরা? নাথ-ধর্মের উৎস ত বাংলা বলেই মনে হয়। 'গোরখনাথ'-সম্প্রদায়ের সঙ্গে প'রচিতির ফলে কবীরের মধ্যে ঐ সকল পদের পুনরাবৃত্তি? না কোনও 'সহজিয়া' সাধকগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়েছে এই সঙ্গীত কবীরে। শেষের এই ধারণাটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাংলা-বিহারের প্রাণ-কেন্দ্রে সে দিন বৈষ্ণবধর্ম-মিশ্রিত সহজিয়াসাধনার ধারা বয়ে চলেছে। তার যুগ্ম রূপ দেখেছি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে," সেনদের বৈষ্ণবধর্মে। কবীরের মধ্যে বাউল-আউলদের মতই ঘটের (দেহের) মধ্যে পরমের সন্ধানের কথা আছে, নাথ যোগাসনকে অস্বীকার করা হয়েছে। কবীরের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা গভীর। নাথ-পন্থীদের মধ্যে ত তা নেই। তবে কি কবীর বাংলা-বিহারের বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধনার মধ্য থেকে আপন জীবনদর্শন তৈরী করেছিলেন? কবীর বৈষ্ণব 'কীরতনিয়া'দের পছন্দ হয় ত করেননি, কারণ—কবীরের পদে—

"করতা দীসৈ কীরতন উঁচা করি করি তুণ্ড।
জানৈ বুঝৈ কুছ নহী, জ্যোঁ হি আধা রুণ্ড॥"

(কবীর: শ্যামসুন্দর: পৃষ্ঠা ৩৮)।

এবং ক্ষিতিমোহনও কবীরের পদে দেখিয়েছেন—

"কিরতনিয়া সে কোসবিস"

দূরে থাকার কথা কবীর বলেছেন (হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা: পণ্ডিত সেন)। কিন্তু বৈষ্ণব-অনুরাগের উজ্জ্বল আলেখ্যও কবীর দিয়েছেন! আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা-বিহারের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব্ব মিল আছে। তবে এ কীর্ত্তনিয়ার দলকে তিনি পেলেন কোথায়? ১৫০৯—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবীরের প্রকটকালে চৈতন্যদেব বারাণসীর মধ্য দিয়ে গতায়াত করেছিলেন। কাশীতে কবীর ছিলেন ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (সিকন্দর লোদীর শক্তিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত)। এ কি সেই কীরতনিয়াদের কথা? কিন্তু শ্যামসুন্দর দাস যে 'কবীর' গ্রন্থ 'নাগরীপ্রচারিণী সভা' থেকে সম্পাদনা করেছেন, তাতে পুঁথির রচনাকাল বলে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ ধরেছেন। একটি ফটো তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঁথির অন্তে রচনাকাল ১৫৬১ সংবৎ দেওয়া আছে। ফটোটা ভাল ক'রে দেখে আমার মনে হয়, সমগ্র পুঁথির লেখা আর তারিখের হাতের লেখা বিভিন্ন, কালি বিভিন্ন, অক্ষর একেবারে আলাদা। আমার কথায় যাঁরা কৌতূহলী হবেন, তাঁরা দয়া ক'রে শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত 'কবীরগ্রন্থাবলী'র কালজ্ঞাপক অংশটির আলোকচিত্র পরীক্ষা করবেন। যদি ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথিটি বিরচিত না হয়, তা হ'লে চৈতন্যসম্প্রদায়ের কীর্ত্তনিয়াদের কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। অথবা যদি কালজ্ঞাপক অংশটি সন্দেহজনক

না হয়, তা হ'লে বাংলা-বিহারের কোনও কীর্ত্তনিয়া-গোষ্ঠীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির ইঙ্গিত করে কবীরের কথাগুলি। কিন্তু বিহারে কি তখন কীর্ত্তন, ঐ ধরণের উদ্দণ্ড কীর্ত্তন, উন্মুখ কীর্ত্তন ('উঁচা করি করি তুণ্ড') প্রচলিত ছিল ? অনেকের মতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ 'সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ'। 'চৈতন্যভাগবত' ত চৈতন্যকে কীর্ত্তনের স্রষ্টা বলে প্রচার করেছেন। (অবশ্য ভিতরে 'চৈতন্যভাগবত' বলেছেন যে, একদিন যখন চন্দ্রগ্রহণের জন্য কীর্ত্তন হচ্ছিল, এমন সময় চৈতন্যের জন্ম হয়। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র-রচিত গ্রন্থক 'কীর্ত্তন' দ্রষ্টব্য)।

যাই হোক, বৈষ্ণব-প্রভাবান্বিত কবীরের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য নিয়ে প্রদর্শিত হ'ল। মনে রাখতে হবে, এই সময় হিন্দীতে (ব্রজভাষাতে) বৈষ্ণব কবিতার ধারা সুরু হয়নি। রাজস্থানীতে 'বীরগাথা'র রেশ শোনা যাচ্ছিল। সংস্কৃতে প্রাকৃতে বৈষ্ণব কবিতা কবীরের বোধগম্য হবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ, তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি মসী ও কাগজ ছোঁন নি ("মসী কাগদ ন ছুবৌ")। একমাত্র 'ভাষা'তে বৈষ্ণব কবিতাই তাঁর সহজবোধ্য ছিল। বিদ্যাপতির মৈথিল বা অবহট্ট কবিতা তাঁর পক্ষে সহজবোধ্য নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, কবীরের রচনা ত ভোজপুরীতে ছিল বলে প্রমাণ করেছেন ডাঃ তিওয়ারী। আর বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল। তিনি ঘুরেছিলেন বহু দেশ, কাশীতে বাঙালী ছিল বহু তখনও (উল্লেখযোগ্য পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কুল্লুক ভট্ট ও পরবর্ত্তী মধুসূদন সরস্বতী) ; আর তাঁর বাঙ্গালী শিষ্য বা গুরুর অভাব ছিল না। তাঁর রচনাতে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা অন্যতম (শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত কবীর-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও কারণে কি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না! বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গীতি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রচলিত হয়েছিল। আর কবীর ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, কবীরের বৈষ্ণব সঙ্গীতের দ্বারা কি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভাবান্বিত হ'তে পারেন না। আমি বলি না। কারণ, বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস (যে চণ্ডীদাসই হোন) সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ আছে। সংস্কৃতে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা বা ভাগবত সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ কবীরের কাছে দুর্বোধ ছিল, এঁদের কাছে ছিল না। তাই এঁদের পক্ষে বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ স্থির করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আর বাংলাতে ও মিথিলাতে সে সময় বৈষ্ণব ভাবের হাওয়া বইছিল, তাই বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস অত সহজে বৈষ্ণবতাকে জীবনে বা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমরা বিদ্যাপতির সঙ্গে এবং চণ্ডীদাসের সঙ্গে কবীরের পদে অপূর্ব্ব সাদৃশ্য নীচে দেখাচ্ছি।

বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস	কবীর
(১) পিয়া জব আয়ব এ মঝু গেহে। মংগল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥	(১) দুলহনী গাবহু মঙ্গলচার, হম ঘরি আয়ে হো রাজা রাম ভরতার ॥

বিদ্যাপতি । চণ্ডীদাস	কবীর
বেদী করব হম আপন অংগ মে । ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ আলিপনা দেয়ব মোতিম হার । মঙ্গল কলস করব কুচ ভার ॥—বিদ্যাপতি	তন রত করি মৈঁ মন রত করিহুঁ পঞ্চতত বরাতী ॥ রামদেব মোরৈ পাহুনৈ আয়ে, মৈঁ জোবন মৈমাতী । সরীর সরোবর বেদী করিহুঁ, ব্রহ্মা বেদ উচার । রামদেব সঙ্গি ভাঁবরি লৈহুঁ, ধনি ধনি ভাগ হমার ॥ —কবীর-গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৮৭ ।
(২) শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর তোড়হ গজমতি হার রে । পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে যমুনা সলিলে সব ডার রে ॥ সীথার সিন্দুর পোঁছি কর দূর পিয়া বিনু সবহি নৈরাশ রে । —বিদ্যাপতি । (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঠিক এই ধরণের পদ আছে । পৃষ্ঠা ১৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য ।)	(২) ক্যা চুরা পাইল ঝমকাৱৈঁ কহা ভয়ৌ বিছুবা ঠমকাৱৈঁ ॥ কা কাজল স্যন্দুর কৈ দীয়ৈঁ সোলহ স্যঙ্গার কহা ভয়ৌ কীয়ৈঁ ॥ অঞ্জন মঞ্জন করৈ ঠগৌরী কা পচি মরৈ নিগোড়ী বৌরী ॥ জৌ পৈ পতিব্রতা হৈ নারী কৈ সৈ হী রহৌ সো পিয়হি পিয়ারী । তন মন জোবন সৌঁপি সরীরা তাহি সুহাগনি কহৈ কবীরা ॥ —কবীর-গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১৩২ ।
(৩) ছায়া দেখি বসি যাই তরু লতা বনে । জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে ॥ যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ । পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥ —চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু ।	(৩) ধুপ দাঝতে ছাহ তকাই, মতি তরবর সচ পাউঁ । তরবর মাহৈ জ্বালা নিকসৈ, তো ক্যা লেই বুঝাউ । জে বন জলৈ ত জল কূ ধাবৈ, মতি জল সীতল হোঈ । জলহী মাহি অগনি জে নিকসৈ, ঔর ন দূজা কোই । —কবীর-গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১২৩ ।

বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস	কবীর
(৪) দিনের সুরুজ পোড়ায়াঁ মারে রাতি হো এ দুখ চান্দে। কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে॥ শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও তভো বিরহ না টুটে। —চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। পৃষ্ঠা ১৬২।	(৪) জরৈ সরীর য়হু তন কোই ন বুঝাবৈ অনল দহৈ নিস নীঁদ ন আবৈঁ॥ চন্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউঁ বাম বিনা দারুণ দুখ পাউঁ॥ —(ক. গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১২৪)
(৫) শুইলে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে। কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥ নবীন পাউসের মীন মরণ ন জানে। নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥ —চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু।	(৫) জৈসে জল বিন মীন তলপৈ ঐসে হরি বিন মেরা জিয়রা কলপৈ॥ নিস দিন হরি বিন নীঁদ ন আবৈ দরস পিয়াসী রাম কূঁ) সচুপাবৈ॥ —(ক. গ্র. : পৃষ্ঠা ১৬৪)।
(৬) জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জিয়ে। মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥ —চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু।	(৬) তুমহ জলনিধি মৈঁ জলকর মীনা জল মৈঁ রহৌ জলহি বিন খীনা। —(ক. গ্র. : পৃষ্ঠা ১২৬)।
(৭) তোমহার যৌবন কাল ভুজঙ্গম আহ্মে হো ভাল গারুড়ী। —চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন : পৃষ্ঠা ৪৫।	(৭) তুমহ গারড়ূ মৈঁ বিষ কা মাতা কাহে ন জিবাবৌ মেরে অমৃতদাতা॥ সংসার ভবংগম ড'সলে কায়া, অরু দুখ দারন ব্যাপৈ তেরী মায়া॥ —(ক. গ্র. পৃষ্ঠা ১১৪)।

আলোচনা ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আরও অনেক বিষয় আলোচনা করার আছে। কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা, বাঙ্গালীজনোচিত মনোবৃত্তি ও কবীরের 'ঘর' এবং 'বোলী' (যা কিনা "পূরব"-এর বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন), আগামী বারে তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করব।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

অধ্যাপক—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

প্রাচীন 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বাংলার বহু কবি তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন—কাব্যের মূল আখ্যানভাগ তাঁহাদের কাহারও নিজস্ব নহে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষায় 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচনার সূত্রপাত হয়। কে যে বাংলার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আদিকবি, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। বন্ধুবর শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁহার 'কালিকামঙ্গল'এর ভূমিকায় চৌদ্দ জন বাঙ্গালী কবির 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) কঙ্ক, (২) শ্রীধর কবিরাজ, (৩) গোবিন্দদাস, (৪) কৃষ্ণরাম দাস, (৫) শ্রীমধুসূদন কবীন্দ্র, (৬) ক্ষেমানন্দ, (৭) বলরাম কবিশেখর, (৮) রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, (৯) ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর, (১০) নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন, (১১) প্রাণরাম চক্রবর্তী, (১২) বিশ্বেশ্বর দাস, (১৩) কবিচন্দ্র, (১৪) গোপাল উড়ে। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি গীতাভিনয় কাব্য অর্থাৎ নাটক। বসুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে যে বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিজ রাধাকান্ত নামক আরও একজন কবির সমস্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার আলোচনা হইতে সারিবিদ খাঁ নামক একজন মুসলমান প্রাচীন কবির 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের সহিত আমরা পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি কাশীনাথ 'বিদ্যাবিলাপ' নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কঙ্ক, শ্রীধর কবিরাজ বা সারিবিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য আমরা চাক্ষুষ করি নাই, পত্রিকার আলোচনা হইতে সেগুলির সামান্য পরিচয় পাইয়াছি মাত্র।[১] আমরা বর্তমানে যে কয়টি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, তাহার মধ্যে গোবিন্দদাসই প্রাচীনতম। তাহার পরেই বোধ হয় কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল'। গোবিন্দদাসের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। উপাখ্যানটি বড় না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গ্রন্থের রচনাকাল ১৫১৭ শক বা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

কৃষ্ণরাম দাস ইহার প্রায় পৌণে এক শতাব্দী পরে (১৬৭৬ খ্রীঃ)[২] তাঁহার কাব্য

(১) কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী—শ্রীচন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, ১৩২৪ কার্তিক, পৃ. ১৫-১৬। সৌরভ, ১৩২৫-২৬, পৃ. ১২, ৫২, ১০৫, ১২৯, ১৪৭। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৪৪ খণ্ড—পৃ. ২২-২৪।

(২) "সারশাসনের নেত্র ভীমাক্ষীবর্জিতমিত্র তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে। বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥" ইহা হইতে পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহাই সমীচীন। আমার অনুমান (১৫৫১ শক) ঠিক নহে।

রচনা করেন। ইহার মধ্যে অন্য কোন কাব্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যকে 'কালিকামঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা তাঁহার সহিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় দেবীর জীবনী লইয়া কোন পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাই নাই—কেবল 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যখানিই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যের কাহিনী সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস বা পূর্ববর্তী অন্য কোন বাংলা কাব্য বা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর অথবা প্রচলিত আখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডিকামঙ্গল তাঁহাকে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কৃষ্ণরামের কাব্যই ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম কবিশেখর প্রভৃতি পরবর্তী কবিগণের আদর্শ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে রামপ্রসাদ ভিন্ন প্রত্যেক কবিই কাব্যের আখ্যানভাগের কিছু পরিবর্তন করিয়া আপন বৈশিষ্ট্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা প্রধানতঃ কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও বলরাম, এই কয়জন কবির কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর কবির কাব্যের বিষয়ও আলোচনা করিব। এই কাব্য কয়টির রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করিয়া, পরে ইহার বিষয়বস্তু ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিতেছি। গোবিন্দদাসের কাব্যেই তাঁহার রচনাকাল লিখিত হইয়াছে—"মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। এই কালে রচিল কালিকাচণ্ডীর গীত ॥" ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কাব্যের রচনাকাল ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ; কৃষ্ণরামের কাব্যের তারিখ আমরা পূর্বেই দিয়াছি—১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ সর্বজনবিদিত চৈত্র মাস ১৬০৪ শক বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাধাকান্ত তাঁহার কাব্যের রচনাকাল দিয়াছেন—"শকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে। এই হেতু হইলা গীত প্রকাশ ভুবনে ॥" সুতরাং তাহা হইতে বুঝা যায়, ১৬৮৯ শক বা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এখন অপর তিন জন কবির কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে কি জানা যায় তাহা দেখা যাউক।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৫ সনে অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে যে ৫১ বিঘা 'মহোত্তরাণ' দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহার করেন নাই, অথচ কৃষ্ণচন্দ্রই এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে যে জমি দান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দে স্পষ্ট 'রায়গুণাকর' উপাধির উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভণিতায় সর্বত্র 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক রামপ্রসাদকে মহোত্তরাণ দান করার পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আমরা কাব্যের আলোচনাকালে প্রমাণ করিব যে, রামপ্রসাদের কাব্য ভারতচন্দ্রের পরবর্তী।

বলরামের 'কালিকামঙ্গলে'র ভূমিকায় বন্ধুবর শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বলরামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বলরামের কাব্য যে ভারতের পূর্বে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই, ভাষায় এমন কিছু নাই, যাহা

হইতে তাহা অনেক পূর্বের ভাষা বলিয়া মনে হয়। ভারতচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতবহুল এবং বলরামের ভাষা প্রাদেশিকতাসম্পন্ন, এইমাত্র। কৃষ্ণরাম রামপ্রসাদের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং রামপ্রসাদ হুবহু কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিয়াছেন অথচ তাঁহাদের কাব্যের ভাষা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল কিছু প্রভেদ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরামেরও পূর্বে যে বলরাম তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিবার কোন হেতু নাই। তাহার উপর কাব্যের মধ্যে অনেক কিছু আছে, যাহা হইতে আমরা দেখাইতে পারিব যে, বলরাম ভারতচন্দ্রের নিকট কিরূপ ঋণী।

বসুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে যে 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল মনে করেন যে, মধুসূদন চক্রবর্তী-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।" কিন্তু নিজসম্পাদিত গ্রন্থের পাঠটি যদি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার ধারণা কত ভ্রান্ত। মধুসূদন চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দরের বিচার' প্রসঙ্গের ভণিতায় লিখিতেছেন—

"ঘটক চক্রবর্তীসুত কৃষ্ণচন্দ্র পাছে রত
শ্রীযুক্ত ঘটক চূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে কালীপদ সরোরুহে
রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্র নন্দিনী ॥"

ঘটকচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন এবং মধুসূদন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এ ক্ষেত্রে তিনি কিরূপে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিলাম না।

আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান হয়, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র ও দ্বিজ রাধাকান্ত[৩] ব্যতীত অপর চারি জন কবিই তাঁহাদের কাব্যটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, কাব্যের আদিতে যে দেবদেবীর বন্দনা থাকে, তাহা কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও বলরামের কাব্যে বর্তমান। মধুসূদনের যে কাব্যখানি মুদ্রিত অবস্থায় আমরা পাইয়াছি, তাহার পূর্বাংশ খণ্ডিত এবং তাহা যে কোন বৃহত্তর মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ ছিল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ এখনও পাই নাই[৪]। কৃষ্ণরাম গ্রন্থের আদিতে এবং

---

(৩) বসুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলীতে দ্বিজ রাধাকান্তের যে বিদ্যাসুন্দর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও পূর্বাংশ খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে "ভাটমুখে বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া সুন্দরের বর্দ্ধমান যাইবার ইচ্ছা" প্রসঙ্গ হইতে। গ্রন্থের সূচনায় নায়ক নায়িকার জন্ম বা পরিচয়ের কথা নাই বা ভাটকে প্রেরণ করার কথা নাই।

(৪) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মধুসূদনের কালিকামঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানই মুখ্য স্থান অধিকার করে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহাতে

বলরাম গ্রন্থের মধ্যেই নিজ পরিচয় দিয়াছেন। বলরামের পুঁথিখানির শেষাংশ খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এইবার আমরা এক একটি প্রসঙ্গ ধরিয়া কাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও তাহার রচনাচাতুর্যের আলোচনা করিব। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা কাব্যের বিষয়বস্তুকে ১২টি অংশে ভাগ করিতেছি—(১) মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারম্ভ, (২) সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা হইতে মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ, (৩) মালিনীর দৌত্য, (৪) বিদ্যাসুন্দরের দর্শন ও সমাগম সম্বন্ধে পরামর্শ, (৫) সন্ধিখনন হইতে বিদ্যাসুন্দরের বিচার, (৬) বিদ্যাসুন্দরের কেলিকৌতুক, (৭) বিদ্যার গর্ভ ও গোপন প্রেম প্রকাশ, (৮) চোর অনুসন্ধান, (৯) চোর ধরা, (১০) চোরের বিচার, (১১) সুন্দরের মুক্তি ও (১২) বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ হইতে স্বর্গলাভ।[৫]

১। মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারম্ভ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোবিন্দ দাস, ভারতচন্দ্র ও দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্য বৃহত্তর কাব্যের অংশবিশেষ। সুতরাং মঙ্গলাচরণ অংশ তাহাতে নাই। কৃষ্ণরাম তাঁহার দেবদেবী বন্দনায় গণেশ, সরস্বতী, কালিকা, কৃষ্ণ আদি অন্যান্য দেবতা বন্দনা করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দেবীর নিকট হইতে মঙ্গলকাব্য লিখিবার আদেশ প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছেন। রামপ্রসাদ গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীবন্দনা করিয়া জাগরণারম্ভ করিয়াছেন। বলরাম গণেশ, রাম, সরস্বতী, চৈতন্য, দশাবতার, অন্যান্য দেবদেবী ও দিগ্‌বন্দনা করিয়া গীত আরম্ভ করিয়াছেন। মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর কাব্যের পূর্ব্বাংশ খণ্ডিত, সুতরাং এই দেবদেবীবন্দনা অংশ তাহাতে নাই।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের যে দুইটি পুঁথি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে কাহিনীটি যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নায়ক নায়িকার পরিচয়, বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, বিদ্যার পিতা কর্তৃক পাত্র অন্বেষণে ভাটপ্রেরণ, সুন্দরের ভাটমুখে বিদ্যাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বীরসিংহের দেশে আসিবার বাসনা, কিছুরই উল্লেখ নাই। দেবীর আজ্ঞায় সুন্দরের বীরসিংহের পুরে গমন, এই প্রসঙ্গ লইয়া গীত আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ পুঁথি দুইটিরই এই অংশ খণ্ডিত। কবি পরেস মাধব ভাটকে সুন্দরের বধ্যভূমিতে উপস্থিত করাইয়াছেন, কাব্যের আদিতে তাহার নামোল্লেখও নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। রামপ্রসাদ মূলতঃ কৃষ্ণরামের বিষয়সূচী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে বিদ্যার অন্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চীপুর গমনের প্রসঙ্গ আছে, এই অংশটী পুঁথি দুইটী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

গৌণ।" আমরা জানি না, কোন্ প্রমাণবলে তিনি ইহা লিখিয়াছেন এবং এই মধুসূদন আমাদের আলোচ্য কাব্যের গ্রন্থকার কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

(৫) পরিশিষ্টে বিস্তৃত তুলনামূলক সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।

বলরামের কাব্যেরও গীতারম্ভে কিছু অংশ ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথমেই লিখিত আছে—

"পাইয়া উপাক্ষণ　　　নৃপতি-নন্দন
পূজয়ে দেবী ভদ্রকালী।"

এখানে এই 'নৃপতিনন্দন' কে, কেনই বা সে ভদ্রকালীর পূজা করিতেছে, তাহার কিছুই লেখা নাই। পরে অবশ্য ভগবতীর সহচরী বিমলা সুন্দরের দেবী আরাধনার কারণ দেবীকে বলিতেছেন এবং মালিনী সুন্দরকে বিদ্যার বিবাহ না হইবার প্রসঙ্গে এই উপক্রমণিকার ত্রুটি সংশোধন করিয়াছে। কিন্তু সুন্দর বিদ্যার উপাখ্যান কাহার নিকট শুনিলেন, তাহার কোন নির্দ্দেশ কাব্যে নাই, অথচ 'ভদ্রাকালীকর্তৃক সুন্দরকে বরদান' প্রসঙ্গের শেষে লিখিত আছে—"গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে। না কহিল সুন্দর মাধব ভাটস্থানে॥"

গোবিন্দদাসের কাব্যে এই ভাবে গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে—গৌড়দেশে কাঞ্চন নগরের রাজা গণিশা ও তাঁহার পাটরাণী কলাবতী পুত্র বিনা মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। স্বর্গে পুষ্পক নামে এক গন্ধর্ব নর্তক নৃত্যরতা এক অপ্সরাকে দেখিয়া কামার্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে ইন্দ্র তাহাদিগকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা গণিশার প্রতি দেবীর স্বপ্নাদেশ হইলে তিনি মহাসমারোহে দেবীর পূজা করেন। ফলে দেবীর বরে কলাবতীর গর্ভে সেই অপ্সর পুষ্পক সুন্দররূপে জন্মগ্রহণ করে। এদিকে রত্নপুরের রাজা বীরসিংহের মহিষীর গর্ভে সেই শাপগ্রস্তা অপ্সরা বিদ্যারূপে জন্ম লইল।

রাজা বীরসিংহ কন্যাকে পণ্ডিত আনিয়া সুশিক্ষিতা করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিদ্যাকে বিদ্যায় পরাস্ত যে করিতে পারিবে, সেইরূপ যোগ্য বরের সহিত বিদ্যার বিবাহ দিবেন। বিদ্যার বিবাহের বয়স হইলে পাত্র অন্বেষণে রাজা মাধব ভাটকে প্রেরণ করিলেন। মাধব বহু দেশ ঘুরিয়া গণিশার রাজ্যে গিয়া বৃহস্পতির তুল্য কুমার সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেন। সুন্দরকে বিদ্যার পরিচয় ও বীরসিংহের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইতে উপদেশ দিয়া ভাট দেশান্তরে গমন করিল। সুন্দর ভগবতীকে পূজা করিয়া পিতামাতাকে না জানাইয়া গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন।

পরবর্তী কবিগণ সকলেই মূলতঃ এই ভাবেই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বলরামের কাব্যের প্রথমাংশ খণ্ডিত হইলেও বুঝা যায় যে, মাধব ভাটের নিকট বিদ্যার সংবাদ পাইয়া সুন্দর কালিকার পূজা করিলেন এবং কালী তাঁহাকে অনুক্ষণ সঙ্গে থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন ও বলিলেন,—

"লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে। কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে॥"

ইহাতে বুঝা যায়, ভগবতী শুকদেহে ভর করিয়া সুন্দরের সাথী হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে লিখিত আছে, বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা স্বয়ং পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যে বিদ্যায় পরাস্ত করিবে, সেই তাঁহার পতি হইবে। কিন্তু কোন

রাজপুত্রই বিদ্যাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—বর্ধমানের রাজা বীরসিংহ কন্যা বিদ্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। শেষে লোকমুখে শুনিলেন, কাঞ্চীদেশের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর 'বড় রূপগুণযুক্ত,' সে বিদ্যাকে বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারিবে। রাজা তৎক্ষণাৎ ভাটকে পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ভাট গিয়া সুন্দরকে পত্র দিল। পত্র পড়িয়া সুন্দরের বর্ধমানে আসিতে বাসনা হইল এবং ভাটকে বিরলে লইয়া গিয়া বিদ্যার রূপগুণের পরিচয় লইলেন। ভাটের বর্ণনা শুনিয়া সুন্দরের কৌতূহল বর্ধিত হইল। সেই অবধি

"বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥"

এই অবস্থা হইল এবং শেষে ঠিক করিলেন—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"

সুন্দর কালার আরাধনা করিলেন। দেবী আকাশবাণীতে বলিলেন—

"চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে।"

সুন্দর বর্ধমান যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের কাব্যেও বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা আছে; তবে একটু ভিন্ন ভাবে ইহা আরম্ভ হইয়াছে—বীরসিংহ কন্যার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পাত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলে নিকটে মাধব ভাট ছিল; সে বলিল, কিছু দিন অপেক্ষা করিলে সে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারে। রাজা তাহাকে শিরোপা করিলেন, উপহার দিলেন ও একটি ঘোড়া দিলেন এবং এইবার উপযুক্ত বর মিলিবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্যে মন দিলেন। গোঁফে পাক দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মাধব ভাট রাজকন্যার পতি অন্বেষণে বাহির হইল। বহু স্থান অন্বেষণ করিয়া শেষে কাঞ্চী দেশে উপস্থিত হইয়া—

পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥

তাহার পর রায়বার পড়িয়া স্তব করিয়া নমস্কারান্তে হিন্দি ভাষায় বলিল—

"বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয়, বড়া তাজা
শোন্‌হোগে ওন্‌কা জেকের্।

ওন্‌কা ঘরমে লেড়কী এক তারিফ করে। কেত্তেক
রাতদেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্তা কি হেয়ও হুজিমৎহি দেগাযেও
শাস্ত্র যে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমরা হো এসা জান্ যো কহোঁ সো কহা মান
তোম সকোগে আও হামারে সাথ॥"

সুন্দর তাহাকে বিরলে লইয়া গিয়া বিশেষ করিয়া সকল শুনিলেন। তখন—

"বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যা নামসুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।"

রাত্রিশেষে কালী আসিয়া স্বপ্নাদেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, মোটামুটি তাহাও জানাইয়া দিলেন। কালী তাঁহাকে একা যাইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া সুন্দর বর্ধমান যাত্রা করিলেন। দ্বিজ রাধাকান্ত একটু নূতনত্ব করিয়াছেন—সুন্দরের এক সহচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার নিকট বর্ধমানরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে এক ভাট আসিয়াছে। রাজকন্যা পরম পণ্ডিতা। সে পণ করিয়াছে, যে তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিবে, সেই তাহার ভর্তা হইবে। রাজার ইচ্ছা, ভাটের নিকট সকল শুনিয়া সুন্দর গিয়া চেষ্টা করুন। ভাটের সহিত সরোবরতীরে কুমারের সাক্ষাৎ হইল, ভাট কুমারের নিকট বিদ্যার রূপবর্ণনা করিল। সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। দৈববাণী হইল—"সাধিলে সিদ্ধি হইবে।" রাজপুত্র বিদ্যার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

(২)

সুন্দরের বর্ধমানযাত্রা

(ক)

গোবিন্দদাসের বিদ্যার জন্মভূমি 'রত্নপুর', কৃষ্ণরামের বিদ্যার জন্মভূমির সঠিক নাম কিছু নাই, তাহা বীরসিংহের রাজধানী হিসাবে 'বীরসিংহপুর' বলিয়া কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম ও রাধাকান্ত ইহা 'বর্ধমান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের উজ্জয়িনী কি ভাবে, কেন এবং কাহার দ্বারা বর্ধমানে পরিণত হইল, তাহা দেখা যাউক।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের যে অংশ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ—নায়ক নায়িকার পরিচয় তাহাতে নাই। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে পুঁথিটি

আছে, তাহাতে বিদ্যার পিত্রালয় 'উজ্জয়িনী বলিয়া উল্লিখিত আছে'।[৬] ভারতচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক কবি নিধিরাম আচার্যের কাব্যে[৭] ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কবি কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকে উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। কৃষ্ণরামের কাব্য হইতে জানা যায়, তাহা গৌড় দেশের কোন নগর। কবি অধিকাংশ স্থলে 'বীরসিংহ পুরী' বা 'বীরসিংহ দেশ' বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের কোন নগরের অধিপতির কন্যার নামে এই কুৎসা রটনা করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। যে কয়জন কবির কাব্যে বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রাধাকান্ত যে ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী, তাহা এখন আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বলরাম যে ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা মনে করিবার কোন হেতু এবং বলরাম কেন যে হঠাৎ উজ্জয়িনীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা বর্দ্ধমান করিবেন, তাহার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত ভারতচন্দ্রের জীবনী হইতে জানা যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে ভারতচন্দ্রের পৈতৃক ভিটা ভবানীপুরের গড় ও পেঁড়োর গড় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া বহু অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লন। ইহার জন্য ভারতচন্দ্রের বর্দ্ধমানরাজবংশের প্রতি আক্রোশ ছিল এবং প্রবাদ যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বর্দ্ধমানপতির মনান্তর ছিল। সুতরাং তিনি "বর্দ্ধমানরাজকুলের কলঙ্কসূচক এই ইতিহাসের সহিত আপনার সংস্রব রাখিবার নিমিত্ত নিজ সভাসদ্ ভারতচন্দ্রকে এই বিষয়ের নূতন ইতিহাস রচনা করিতে অনুমতি করেন"।[৮] এই ভাবেই উজ্জয়িনীর পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমানের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(খ) গোবিন্দদাসের সুন্দর মাতাপিতাকে না জানাইয়া বিদ্যার উদ্দেশ্যে পদব্রজে গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন—দুর্গম পথ, বন, নদী, গিরি প্রভৃতি কালীমন্ত্র জপিতে জপিতে অতিক্রম করিয়া ছয় মাসে 'বীরসিংহদেশে' উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণরামের কাব্য বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—

"সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন॥
স্বপনে শিবার কথা সত্যমনে লয়ে।
পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে॥
জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবিশিরোমণি॥

(৬) *The Long lost Sanskrit Vidyasundar*—Proceedings of the Second *Oriental Conference*, pp. 215-220.

(৭) পরিশিষ্টে তুলনামূলক তালিকা দ্রষ্টব্য।

(৮) 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে' শ্রীনন্দলাল দত্ত, পৃ ৷৵০।

রামপ্রসাদও তাঁহার কাব্যেও এই প্রসঙ্গ অনুরূপ ভাবেই আরম্ভ করিয়াছেন—

"স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইয়া গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণহেতু জপে দুর্গানাম ॥"

কিন্তু সুন্দর পিতামাতাকে লুকাইয়া বিদ্যা অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছিলেন কি না, রামপ্রসাদ তাহা বলেন নাই।

ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে 'বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ' প্রসঙ্গে নায়ক নায়িকার পরিচয় ও ভাটের বিদ্যার পাত্র অন্বেষণে বীরসিংহের সভায় আগমনের কথা বলিয়া দ্বিতীয় প্রসঙ্গে সুন্দরের বর্ধমানযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের পরিবর্তে আকাশবাণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন—"জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়।" ভারতচন্দ্রের সুন্দর নিতান্ত একাকী যাত্রা করেন নাই—পিঞ্জর সহ পড়াশুককে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই শুককে সুন্দর pet হিসাবে লইয়াছিলেন, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

বলরামের সুন্দর কালীকে পূজা করিলে দেবী যখন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন সুন্দর 'নিভৃতে বিদ্যার দর্শন' পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। এবং বলেন—'একেলা যাইব আমি দেশ দেশান্তর'। উত্তরে—

"হাসিয়া বলেন কালী শুনহ কুমার।
স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার ॥
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে।
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত।
প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥"

এইখানে বলরাম শুককে সঙ্গে লইবার একটা যুক্তি খাড়া করিয়াছিলেন। এই শুক: তাঁহার পোষা শুক নহে। কারণ, শুক বিদ্যাকে বলিতেছে—"সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানিশা নগরে গুণসাগরের পুত্র সুন্দরকে দেখিলাম তাহার মত রূপবান ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আর কাহাকেও দেখিলাম না।" এই শুককে দিয়া কবি বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে দৌত্য করাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যার এই ব্যবহারের সহিত পরবর্তী ব্যবহারের মোটেই মিল নাই, শুককে যে উদ্দেশ্যে দেবী সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং বর্ধমান প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে শুকের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে। এই শুককে যে বলরাম ভারতচন্দ্রের নিকট ধার লইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সুন্দরকে দেবীর মায়ায় সৃষ্ট গভীর অরণ্য ও বেগবতী নদী পার করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই সকল মধ্যযুগসুলভ দৈবী মায়ার অবতারণা করেন নাই সরাসর বেগবান্ অশ্বে নায়ক সুন্দরকে "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ" ছয় দিনে পৌছাইয়া

দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম দশ দিনে পাঁচ মাসের পথ এবং রামপ্রসাদ ঐ সময়ে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করাইয়াছেন। অশ্বের বা অশ্বরোহীর কৃতিত্বের কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী ভারতচন্দ্র বলিতেছেন—"সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস" এবং

"অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল ॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥"

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোবিন্দদাস সুন্দরকে পদব্রজে ছয় মাসে বীরসিংহের নগরে লইয়া গিয়াছেন, কোনরূপ দৈবী মায়া বা অশ্বের কৌশলের অবতারণা করেন নাই। এই দীর্ঘ পথ সংক্ষেপ করিয়াছেন সম্ভবতঃ প্রথমে কৃষ্ণরাম। তাহার কারণ, মাধব ভাটের ফিরিবার পূর্বেই সুন্দরের বিদ্যাসমাগম সমাপ্ত করা আবশ্যক। গোবিন্দদাসের ভাট তো সুন্দরকে সংবাদ দিয়াই অন্যান্য দেশে গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার সুন্দরের পক্ষে এই অহেতুকী শীঘ্রতার আবশ্যক ছিল না।

বলরামের সুন্দরের পিত্রালয় উৎকলদেশে অথচ তিনি সুন্দরকে খুরদা হইয়া পুরী দর্শন করাইলেন, যুধিষ্ঠিরের মায়া সরোবরে লইয়া গেলেন, পরে বিষ্ণুপুর হইয়া বর্ধমানে প্রবেশ করাইলেন, এই প্রসঙ্গে খানিকটা জগন্নাথ মাহাত্ম্য ও মহাভারত হইতে পাণ্ডবদের কাহিনী শুনাইয়াছেন। কত দিনে যে সুন্দর স্বদেশ হইতে বর্ধমানে পৌঁছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।[১] দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিতেছেন—

"মজায়া মানস মত্ত চরণ মায়ের ॥
খিধা তৃষ্ণা শ্রম নাহি জানয়ে পথের ॥
আপন নগর হৈতে ক্রমে পঞ্চ মাসে।
উত্তরিল বীরসিংহ নৃপতির দেশে ॥"

সুতরাং রাধাকান্তও গোবিন্দদাসের মত: পদব্রজে সাধারণ ভাবে সুন্দরকে পাঁচ মাসে লইয়া গিয়াছেন, কোন দৈবী মায়ার অবতারণা করেন নাই।

(গ) কৃষ্ণরাম বীরসিংহ দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চোখের সম্মুখে মোগলযুগের কোন শহরকে আদর্শ রাখিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজধানীর কোন চিহ্নই ইহাতে নাই। বীরসিংহের রাজধানী—

(১) বন্ধুবর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলরামকে পূর্ববঙ্গবাসী ও তান্ত্রিক সাধক বলিয়াছেন। আমরা মনে করি, এই দুই বিষয়েই তিনি ভ্রান্ত। বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনাই বলরামের উদ্দেশ্য, কালীমাহাত্ম্য প্রচার নহে। কাব্যে দেবদেবীর বন্দনায় জগন্নাথমাহাত্ম্য প্রচারে, গীতগোবিন্দের শ্লোকোদ্ধারে এবং নিজের ও পিতার নামে তাঁহাকে তান্ত্রিক সাধক বলিয়া প্রমাণ করে না। বলরামের বিশেষ কোন দেবতার প্রতি আকর্ষণ ছিল না বলিয়া মনে হয় এবং তিনি যে পূর্ববঙ্গবাসী নহেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

"রাজ্য জুড়ি গড়খাই বাঁশেও না পাই ঠাঞি
বাইচে ফিরান যায় কোশা।"

কৃষ্ণরাম একটি মাত্র গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সেখানে ছয়টি গড়ের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা যে মোগলযুগের শেষ ও কোম্পানীর রাজত্বের পূর্বের কোন শহর, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—

"প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥"

রামপ্রসাদের বর্ণনায় কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েরই স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ সাতটি গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় পৃথক্ বর্ণনা করেন নাই। তবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে বিষ ভারত চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ইংরেজগণ পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"আফিঙ্গে হামেশামস্ত হুঁসিয়ার দরবস্ত
ঘুরে আঁখি কুমারের চাক।"

এবং বাঙালী রাজার পশ্চিমা প্রহরীকে দিয়া বাঙালীকে গালি দেওয়াইয়া নবাবী আমলের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

"ওরে বহিনা ভুরজারি এয়সা রে শ্বশুরা গারি
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া।"

দ্বিজ রাধাকান্ত পূর্ববর্তী কবিগণের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া একটা পুরী বর্ণনা করিয়াছেন এবং যুবরাজ বিজয়সিংহের সভাবর্ণন করিয়া নূতনত্ব করিয়াছেন। এই বর্ণনায় কবিত্ব নাই, কেবল অনুপ্রাসের ঘটা আছে।

বলরাম পুরী বর্ণনা করেনই নাই, শুককে দূত করিয়া পাঠাইয়া সংক্ষেপে কার্য সারিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈষধচরিত তাঁহার কল্পনার খোরাক যোগাইয়াছে।

(ঘ) সুন্দরের সহিত কোতোয়ালের প্রথম দর্শন কৃষ্ণরাম এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"সহর ভ্রমিছে তথা বাঘাই কোটাল (র)।
খোরাসানি খঞ্জর কোমরে খরধার॥
করিবর উপরে আমারি মাঝে বসি।
সম্মুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি॥
পাকাইয়া নয়ান যাহার পানে চায়।
চমকে অমনি তনু তরাসে কাঁপায়॥

কালাগায়ে হেমহার গলে অভিরাম।
পর্ব্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম ॥
চাপদাড়ি প্রসন্ন বদনে হেন বাসি।
রাহু যেন গরাসিল এক ভাগ শশী ॥
দুই গোঁফ পরিপাটি যেন সে কলঙ্ক।
মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ ॥
চৌদিশ ঘেরিয়া ঘোড় সোয়ারের রেলা।
রজপুত বলবান্ উজবগ রহেলা ॥
শিঙ্গা কাড়া করতাল চৌঘড়ি ঘোড়ায়।
বারবধূ বার সাথে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
তাহা দেখি মনে করে রাজার নন্দন।
পশ্চাতে বুঝিব ভায়া চতুর কেমন ॥"

রামপ্রসাদের বর্ণনা কৃষ্ণরামের যে ছায়া, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়—

"হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফা ব্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥
* * * *
নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।
সহরে সোরৎ পড়ে, যায় বাহাদুর ॥
সুন্দর হাসেন মনে, থাক দিন রাত।
পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত ॥

ভারতচন্দ্র কোটালের রূপের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তাহার শাসনের কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন—

"কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥"

কোটালকে দেখিয়া ভারতচন্দ্রের সুন্দর ভীত হইয়াছিলেন। গোপনে রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী বিদেশী রাজকুমারের পক্ষে ইহা অধিকতর শোভন হইয়াছে।

গোবিন্দদাস বা বলরাম সুন্দরের সহিত পুরী প্রবেশকালে কোটালের সাক্ষাতের কথা লিখেন নাই। রাধাকান্ত বিদেশী প্রহরীযুথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কোটালের কথা লিখেন নাই। রাধাকান্ত এইখানে একটু বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন—গড়ের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহলে দেওয়ান-খানায় অপরাধিগণের বিচার ও শাস্তির দৃশ্য দেখাইয়া চতুর্থ মহলে রাজকুমার বিজয়সিংহের সভায় লইয়া গিয়াছেন। রাজকুমার বিলাসী যুবক বহু পশুপক্ষী পালন করেন, সর্বদা খোসগল্পে কাল কাটান, আমিরি নজর, গীত নাট্যে মসগুল। তাহার পর সুন্দর রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট গিয়া পরিচয় দিলেন—তিনি রত্নাবতী নগরের গুণাসিন্ধু রায়ের সভাসদ্, বিদ্যাসুখ অভিলাষে বিদেশে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

"যে বিদ্যা ভ্রমণ করি না পায়ে সংসারে।
অনায়াসে হেন বিদ্যা লভিবে তোমারে॥"

তাহার পর রাজপদে প্রণাম করিয়া পুরী হইতে বাহির হইলেন।

(ঙ) কোটালের স্থান অতিক্রম করিয়া সুন্দর সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে বীরসিংহদেশে প্রবেশ করাইয়াই কদম্বতরুতলে উপবেশন করাইয়াছেন, সরোবরের উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণরাম তাঁহাকে দিব্যসরোবরতীরে কদম্বতলে রত্নবেদীর উপর 'যদুচাঁদের' মত বসাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সুন্দর বসিলেন বকুলতলায়। কৃষ্ণরাম ঘর্মসিক্ততনু রাজকুমারকে দেখিয়াই নগর-কামিনীগণের

"অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কাঁখে কুম্ভ॥"

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সরোবরে সুন্দরের স্নানের কথা লিখেন নাই। রামপ্রসাদের সুন্দরও সরোবরে স্নান করেন নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবা চরণ পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম্ব ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে॥
হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে যাইলা সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।"

বলরাম লিখিয়াছেন—

"বেলা হৈল অবসান দেখি বালা রম্য স্থান
বসিল কদম্ব-তরু-তলে।

হেন কালে যত নারী কাখে তারা কুম্ভকরি
জল আনিবার তরে চলে ॥
তরুমূলে পড়ে আঁখি মনোহর রূপ দেখি
মুরছিত যতেক রমণী।
সে রূপ লখিতে নয় সভে পরস্পরে কয়
বলরাম কহে শুদ্ধ বাণী ॥"

বলরাম সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুন্দরের স্নানের কথা লেখেন নাই এবং অতি আশ্চর্যের বিষয়, বর্ধমানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিয়ত সঙ্গী সুয়া বা শুকপক্ষী অন্তর্হিত হইয়াছে।

দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিতেছেন, সুন্দর যখন রাজসভা হইতে বাহির হইয়া সরোবরতীরে যাইতেছেন, তখন অট্টালিকাসমূহ হইতে নগর-কামিনীগণ রূপবান্ সুন্দরকে দেখিয়া মোহিত হইল। এইখানে নারীগণের 'বিভ্রম'-এর এক বর্ণনা করিয়াছেন।—

"কেহ বলে কলঙ্ক কিসের কুলবতী।
ধাইল ধন্যারা সব অধর্জিত গতি ॥
রহিল কাহার করে কজ্জলের লতা।
কেহ ধায় এক পায় পরিয়া আলতা ॥
সীমন্তে সিন্দুর গেল সজ্জ কর্ণরুচি।
চলিল যুবতীযুত কেশ বেশ তেজি ॥
অবিরত তারাপরা তরুণী প্রচুর।
নূপুর ভরমে পদে পড়িল কেয়ূর ॥
কঙ্কণ ভরমে পদে পরে খুলি খুলি।
মস্তকে কাঁচুলী তুলি দিল বক্ষবুলি ॥
অঞ্চলে বন্ধন দেয় বলিয়া চিকুর।
না মানিল গুরুজন তেজি নিজ পুর ॥

এই সকল যুবতীগণের চিত্তবিকারের বর্ণনা কবি করিয়াছেন। তাহার পর সরোবরে তরুমূলে সুন্দর উপবেশন করিলে আর একদফা জলার্থিনী কামিনীগণ কর্তৃক সুন্দরকে দেখিয়া চিত্তচাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণরাম কুলবতীগণকে কামোন্মত্তা করেন নাই, কেবল তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছদ্মবেশী রাজকুমার সুন্দরকে তাহারা ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। বলরামও এখানে কৃষ্ণরামের হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন এবং "না রহে কাহার কাখে কুম্ভ পড়ে খসি" এই উক্তি দ্বারা কৃষ্ণরামের কাব্যের অনুকরণের প্রমাণ দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের নগর-নাগরীগণ কোন কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, তাহারা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-সুলভ নারীগণের মতই রূপবান্ যুবাকে দেখিয়া পত্যন্তরে কামোন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। কবির লেখনীতে এই চিত্র অপূর্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"দেখিয়া সুন্দর রূপে মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি॥
বলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদন জ্বালায় মরম গলায়
বকুল তলায় বসিয়া অই॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে॥
কহে একজন লয় মোর মন
এ নবরতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পড়িলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥
ধিক্ বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিত্তগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥
সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।

এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে ॥
রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হয়ে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
শ্মশানে মরিয়া শ্মশান রবে ॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পারিতে ভয় না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥"

রামপ্রসাদও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে ললিত ত্রিপদী ছন্দেই এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে এমন কাব্য ফুটিয়া উঠে নাই—অনুকরণের জড়তা তাঁহার কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, বরং স্থানে স্থানে কবিত্ব অভাবে কাব্য অশ্লীল হইয়া উঠিয়াছে—

"কেহ কহে আজি ওকে করে রাজী
শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ী শশুর নাহি পতি দূর
শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে ॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধুলা লবে গো পাছে ॥"

রামপ্রসাদ অধিকন্তু নাগরীগণের রূপবর্ণনা করিয়া এবং তাহার পর তাহাদের মুখ দিয়া সুন্দরকে যে দেবতা বলিয়া ভ্রম করার কথা বলাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণরামেরই প্রভাব। দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন, ঘাটে জল আনিতে গিয়া নগরকামিনীগণ কুমারকে দেখিয়া প্রথমে কোন দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়া বিতর্ক করিতেছিল। এই বিষয় বর্ণনায় কবি কিছু কবিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার পর রাধাকান্ত নারীগণের চিত্তচাঞ্চল্য বর্ণনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত

কিছু দিন হইল, চকদীঘির 'রাঢ় গ্রন্থাগার' হইতে একটি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমাদের হাতে আসিয়াছে। পুঁথিটি 'বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত'। ভণিতাগুলি হইতে সহজেই গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—শ্রীমুকুন্দ কবিচন্দ্র। পুঁথিটির লিপি ও কাগজ দেখিয়া জাল বলিয়া মনে হয় না, পত্রসংখ্যা ১২৪ এবং পুঁথিটি অখণ্ডিত। শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকরের পরিচয় আছে—"স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোরদাসমিত্রস্য মোকাম সাং আমুরিয়া পরগনে মণ্ডলঘাট আমল শ্রীযুত(?) মহারাজ কির্ত্তিচন্দ রায় মহাসয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্ত্তিক ॥"

পুঁথিটির পঞ্চম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই ভাবে রচনাকাল ও গ্রন্থকারের পরিচয় আছে,—

"সাকে রষ রথ বেদ সসাঙ্ক গণিতে।
বাসুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে ॥
* * *
বিপ্রকুলে জর্ম্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাঝ ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতির নন্দন।
পাচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরা স্মরণ ॥"

পুঁথির অন্যান্য অংশ হইতে জানা যায়, কবি তাঁহার খুল্লতাত গদাধর পণ্ডিতের যত্নে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। গ্রন্থ রচনার তারিখের পংক্তি দুইটির সহিত মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' বা অভয়ামঙ্গলের রচনাকালের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥"

বঙ্গবাসি-সংস্করণে লিখিত আছে—"গ্রন্থরচনার শক নিরূপণ প্রভৃতি শেষের কয়েকটি বিষয় হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র মুদ্রিত পুস্তকে আছে।"

এ ক্ষেত্রে এই পংক্তি দুইটি প্রকৃত মুকুন্দরামের চণ্ডীর কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বঙ্গবাসি-সংস্করণের মুকুন্দরামের চণ্ডীর ঐ শ্লোক দুইটি হইতে রচনাকাল স্থির করা হইয়াছে ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমান পুঁথিতে যে সংখ্যাসূচক শব্দগুলি আছে, তাহা হইতেছে রস, রথ, বেদ ও শশাঙ্ক। চণ্ডীর পাঠের 'রস রস বেদ শশাঙ্ক'কে ৯,৯,৪,১, এবং 'অঙ্কস্য বামা গতি' ধরিয়া ১৪৯৯ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রস ও রথ শব্দ আছে। 'রথ' শব্দের অর্থ যদি চরণ ধরা যায়, তাহা হইলে ২ সংখ্যা ধরিতে হয়। কাজেই তারিখ হয় ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর যদি লিপিকরপ্রমাদবশে

'রস' 'রথ'এ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় গ্রন্থের রচনাকাল একই বৎসর বলিতে হয়।

একটি বৈশিষ্ট্য এই পুঁথিতে দেখা যায় যে, ইহাতে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করা হয় নাই, অথচ মুকুন্দরাম বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম মানসিংহের গৌড়-বঙ্গ-উৎকল শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল হইতে পারে না। ঐ পংক্তি দুইটি প্রক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভবতঃ তাহা বিশাললোচনীর গীতেরই এই পংক্তি দুইটি। কবিচন্দ্র চৈতন্যকে দেবতার পর্যায়ে ফেলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাত্র কিছু কাল পূর্বে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন এবং নরত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হন নাই।

এই কাব্যের অনেক অংশের সহিত মুকুন্দরামের চণ্ডীর সাদৃশ্য আছে, অনেক অংশের হুবহু মিল আছে। চণ্ডীর ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানে জনাই ওঝার পাত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥"

এবং 'কুটুম্বসমাগম' প্রসঙ্গে—

বর্দ্ধমান হইতে বেণে আইসে ধুস দত্ত।
ষোল শো বেণের মাঝে যাহার মহত্ব॥

'জতুগৃহের ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে ধুস দত্ত ধনপতিকে 'মামাইত ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এই ধুস দত্ত হইতেছে বর্তমান কাব্যের প্রধান উপাখ্যানের নায়ক। আমরা এখন এই কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। তবে এই কথা বলিতে চাহি যে, কাব্যটি আদ্যোপান্ত পাঠে ইহাকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুত শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীযুত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উভয়ের চেষ্টায় কাব্যটি প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহারা বহু পরিশ্রম করিয়া ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইতি—

পত্রিকাধ্যক্ষ।

(১)　(?) নম শ্রীশ্রীদুর্গাঐ নম ॥

মঙ্গল রাগ ॥০॥

থল (?) রেণু ঘুচাইয়া যুবতি রসবতি।
সরস গোময় রসে স্থান কৈল সুদ্ধি ॥
সুগন্ধি চন্দন রসে রচিল দেহালি।
আরোপিল শ্বেতধান্য হেমঘট বারি ॥
ঘটে চ্যুত ডাল দিল কণ্ঠে ফুলমাল।
স্থাপিল কুঞ্জরমুখ দেবির কুমার ॥
জত দেবতার তথি হয় অধিষ্ঠান।
মুসিকবাহন দেব দেবের প্রধান ॥
সুগন্ধি ফুলের ঝারা ধবল বিতান।
বান্ধিল ছান্দলা সর্ব্বমঙ্গল নিদান ॥
জসের পট্টহ সঙ্খ বাজে অবিরল।
ঘাঘর নুপুর বাজে সুনাদ মাদল ॥
স্তুতি করে দ্বিজগণ প্রনব প্রথমে।
আরম্ভে দেবতা পুজা নাএক কল্যাণে ॥
যুবতি সকল মেলি দেই হুলাহুলি।
আনিল সিন্দুর গন্ধ খই খিরপুলি ॥
মোদক লড্ডুক কলা মধুর শ্রীফল।
নারিকেল লবঙ্গ কর্পুর জাতিফল ॥
ইক্ষু সসা নারিকেল বিচিত্র তাম্বুল।
ঘৃতসুবাসিত তথি আতব তণ্ডুল ॥
পানিফল পনস কেসরি খণ্ড দধি।
ধুপ দিপ নৈবেদ্য রচিল জথাবিধি ॥
দেবতা পুজিয়া সভে করএ প্রনতি।
গায়েনে মঙ্গল গায় চণ্ডিপদে মতি ॥
ভক্ত সেবকে চণ্ডি হয় বরদায়।
শ্রীজুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় ॥০॥

গৌরি রাগ ॥০॥

জপমালাঙ্কুষপাষ (দণ্ড) ধরি হাথে।
ফনিন্দ্র হৃদয় মাঝে জটাভার মাথে ॥
প্রলম্ব জঠর চারু ভুজ ত্রিলোচন।
শ্রীজন পালন মহাপ্রলয় কারন ॥
বন্দো দেব গণপতি মুশিকবাহন।
বিচিত্র সাদ্দুল চর্ম্ম বিভুতিভূসন ॥
(২) সিন্দুরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন।
মকর কুণ্ডল কর্ণে প্রথুমোচন (?) ॥
চারি দস লোকনাথ চপল নিশ্চল।
পারিজাতমালা বিভুশিত গণ্ডস্থল ॥
ব্রহ্মরূপ শনাতন প্রধান ঈশ্বর।
দেবের প্রধান পুজ্য চরণ কমল ॥
একানেকা লঘুগুরু ব্যক্তাব্যক্ত তনু।
খেয়ানে না জানে ব্রহ্মা নারায়ন স্থানু ॥
শ্রবন পবন নিজ শ্রম জল হরা।
মধুগন্ধ লোভে মত্ত চপল ভ্রমরা ॥
কুমতি দহন দক্ষ ভবভয়হারি।
নিয়ত দুরিত দুঃখ জগদুপকারি ॥
নব শশী শিরে সোভে সরি গুছান্দ।
মৃদঙ্গবাদনপর পুনমিক চান্দ ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীজুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতি ॥ • ॥

পয়ার ॥ • ॥

নম দেবি ভগবতি নৃমুণ্ডমালিনী।
কুমতিনাসিনি সুখ সামির্দ্ধদাইনী ॥
অতুলিত গুরঙ্গ দুকুল কলেবরে।
উদিত রুচির সিশু সশোধর সিরে ॥
কুটিল কবরি ভার বচন মধুর।
ললাটে চন্দন রেখ সিমন্তে সিন্দুর ॥
বিলোলিত লকাবলি নয়নে কজ্জল।
ঝলমল করে কর্ণে মকর কুণ্ডল ॥
চপল নয়ন মুখ রাকা হিমকর।
স্মিত বিকসিত গণ্ড ইসত পাণ্ডব ॥

দাড়িম্ব কুসুম জিনি অধর সুন্দর।
যুগল দশন পাঁতি গুঞ্জরে ভ্রমর॥
নাসিকা উপরে সোভে রুচীর মুকুতা।
কটি (?) দেশে বউলী গলায় কিয়াপাতা॥
অবিরল দুই কুচ কনক শ্রীফল।
মদন ভাণ্ডার নিকেতন মনোহর॥
দ্বিভুজে সরল সঙ্খ ক্ষাতি (২) সুয়াঠুটী।
আগে রত্নচুড়ি সোভে কড়ে হেম মাটী॥
বিষাল হৃদয় সোভে অমুল্য কাঁচলী।
অভিনব হেমরুচি সম লক্ষ বলী॥
ভুজপরি রত্নতাড় অমুল্য রতন।
কটীতে কিঙ্কিনী সোভে চরণে ঝঞ্জন॥
হরের ডমরু মাঝা নাভি সরোবর।
কনক রুচির কুম্ভ নিতম্ব যুগল॥
রামরম্ভা জিনী উরু রুপে নাহি সীমা।
ত্রিপুরসুন্দরি গৌরি গৌরিম মহিমা॥
রত্নের অঙ্গুরি শোভে বাম কর সাথে।
ত্রিমুখ পাশুলি শোভে চরণের আগে॥
মরালগামিনি দেবি না চলে প্রচুর।
রুনু রুনু বাজে দুই চরণে নুপুর॥
জিবননাথের কাছে আছ সুভ বেশে।
সেবকে স্মরণ করে রজনি দীবশে॥
রাগ মান তাল সঙ্গ কিছুই না জানি।
আপনার গীতে লোকে রঞ্জাবে আপনি॥
তোমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে।
আপনি কথিলে মোরে বশী কেন্দুডালে॥
জখন করিবে পুত্র গীতের প্রকাশ।
শুনিতে আপন গীত তেজিব কৈলাস॥
জদি বা প্রভুর সঙ্গে থাকী কুতুহলে।
প্রভু সঙ্গে আসীব ডাকিলে হাথে তালে॥
শুনিতে আপন গিত সুরপুরি তেজ।
বিসাল লোচনি জয়া লৈয়া মকভুজ (?)॥
(৩) সকল সফল রস পরিপূর্ণ জয়া।
প্রণত সেবকে কভু না ছাড়িবে দয়া॥
হাথে তালে ডাকে তিন অবনত নর।
নাএক আসরে দুর্গা উরহ সত্তর॥
ত্রিপুরে ত্রিপুরা পুজা জয় ২ ধ্বনি।
শ্রীজুত মুকুন্দে ভনে সুরতোষ বানি॥•॥৩॥

প্রণত সেবকে রক্ষ নারায়নি
চারিধিক দশ লোকে।
তুবি জার ভব কে বলিব স্তব
দেবতা না জানে জাকে॥
কামচারি হরি বাহিনী সঙ্করি
মহামায়া মহদরি।
তুবি পঙ্কজিনি মঙ্গল গেহিনি
স্মরহর সহচরি॥
সহজে চপলা সেবক বৎসলা
ভাগিরথি ভানুমতি।
ত্রিভুবনে গতি তুমি ভগবতি
সন্তুতি দাইনী সতি॥
তুমি কাল নিশা ক্রপা শক্তি রুপা
ঘোররূপা তবসিনি।
বিকট দসনি করালবদনি
দয়ামই নারায়নি॥
অমলা বিমলা কুমতি কমলা
চতুঃসষ্টি চতুর্কলা।
সঙ্খিনি শুলিনি রঙ্কিনি রঙ্গিনি
মানবমস্তকমালা॥
তুমি মাহেশ্বরি বাসুলি খেচরি
দানবদলনি ভিমা।
গদিনি খড়্গিনি চাপিনি শুলীনি
জার তনু নাহি সিমা॥
সিন্ধু জলদেবী লোক ভয়ঙ্করী
নাশিকা দিঘল খর্ব্বা।
প্রচুর হাসিনী দেবতা জননী
দুর্গতী নাসিনী দুর্গা॥

অচলনন্দিনী　　বিসাললোচনি
তুমি ত্রৈলোক্যের মাতা।
তোমার চরণ　　জার নাহি মন
তাহার সকলি বৃথা॥
বাসুলিমঙ্গল　　গীত আনন্দিত
হৈয়া জেই জন সুনে।
তারে সানন্দিত　　হবে কপালিনী
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে॥০॥৪॥

॥ সুইরাগ ॥

(৩) অধর সুরঙ্গ দল　　মুখ সসিমণ্ডল
শুললিত তিলফুল নাসা।
অতি প্রেমে অভিমুখ　　নয়ন খঞ্জন যুগ
কলরব কোকিলির ভাসা॥
ললাটে নুতন চাঁন্দ　　চিকুর জলধনিন্দ
কনককুণ্ডল শ্রুতি সোভে।
পিঠে পাট থোপ লোলে কবরি মালতি মালে
মধুকর ভ্রমে মধুলোভে॥
নবচন্দ্র শিরোমণি　　কোলে নগনন্দিনী
কৈলাসে রহিলা কৌতুকে।
সেবকে অণ্ডরন করে　　একভাবে সেবে জারে
চারি অধিক দস লোকে॥
দ্বিভুজে সরল সঙ্খ　　আগে পাছে অতিরঙ্গ
মনী হেম গঠিত কঙ্কন॥
মৃণাল জিনিঞা ভুজ　　শুপক দাড়িম্ববিজ
বিজিতলে(?) সুরঙ্গ দসন॥
গলে গজমতিহার　　নিল পলে মনীমাল
কুচযুগ সিখরি বিলোলা।
স্যামলে ধবল মিলে　　কনক পৃথিবিবরে
গঙ্গা জমুনা জলধারা॥
রজতের তাড় হাথে　　পাশুলি অরুন পদে
কাঁচলি হৃদয় বিসালে।
অতুলিত সুললিত　　ক্রমিসুত্র বিরচিত
সুরঙ্গ বসন কলেবরে॥

তাম্বুলে মুখ রঙ্গে　　মাঝায় কেসরি গঞ্জে
কুন্দকুসুম দাম হাসে।
কনক চম্পক ছবি　　ললাটে উদিত রবি
সিন্দুরে তিমির বিনাসে॥
নাভি গভির সর　　উরু জিনি করিকর
মন্থর গতি গজরাজে।
মুখরিত কিঙ্কিনি　　কটিদেশে সুদ্ধনি
রত্ন নুপুর পদে বাজে॥
ভ্রূহি কামধনুসর　　কটাক্ষে জিবন হর
জর২ কৃত প্রাননাথে।
সেবিয়া সারদা পদ　　আনন্দেজনক গিত
বিরচএ মুকুন্দ পণ্ডিতে॥০॥৫॥

॥ সুইরাগ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর　　দেবরাজ পুরন্দর
সদয় হৃদয় সাকম্বরি।
(৪ক) বরুন পবন জম　　রবি সসি হুতাসন
নাটে গিতে তে(?)জ সুরপুরি॥
কিন্নরা কিন্নরি গায়　　গনেসে মৃদঙ্গ বায়
একতালে নাচে বিদ্যাধরি।
জগতিমণ্ডল মাঝে　　ছান্দলা বান্ধিয়া পুজে
জগজনে জানিঞা ইশ্বরি॥
উর চণ্ডি ভগবতি　　আনন্দে পুর্ণিতমতি
প্রণত সেবকে দিতে বর।
মৃদঙ্গ সঙ্গীত নাদ　　গায়েনে যুড়িল গিত
তেজ চণ্ডি দেবতা নগর॥
গলে নরশিরোমালা　　শিরে সোভে সশিকলা
প্রেতাসনে রঙ্গিনী বাসুলী।
কর্প প্রখর কাতি　　উজ্জল দশন জ্যোতি
ত্রিভুবনে তুমি ক্ষেমঙ্করি॥
সড়ঙ্গ মঙ্গল ধুপ　　বিবিধ নৈবেদ্য দিপ
নায়েকে রচিল পুজাবিধি।
বিসালাক্ষি শশীমুখি　　সংহতি করিয়া সখি
তনয়া কমলা সরস্বতি॥

বিরিঞ্চি প্রভৃতী জত দেবতা না জানে তত্ব
নাম জয়া অশুরদলনী।
শুন তিন বিত্তাবীনি আদি অন্ত নাহি জানি
অশেষ বিশেষ মায়াবিনী ॥
কুমতিনাসিনি সুখ সামির্দ্ধদাইনী দুঃখ
ভবভয় দুরিত হারিনী।
অজোনিসম্ভবা শতী শিবসক্তি জগদাদি
শ্রীজন পালন সংহারিনী ॥
তুমি নগনন্দিনী শূল চক্র সঙ্খিনী
গদিনি খড়্গিনী ঘোররূপা।
ললাটে ফলকে জার বিধি লিখে দুরাচার
বিপরিত তব কর কৃপা ॥
যে তোমার পদ সেবে অভিমত কর্ম্ম লভে
ক্ষিতি তার জনম সফল।
(৪) চণ্ডিপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচএ সরস মঙ্গল ॥ ● ॥৬

॥ পয়ার ॥

মঙ্গলকারিনী জয়া বিপত্যনাশিনী।
মহা মায়াবিনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥
সক্তিরূপা নিরুপারুপিনীশ্বরি দেবি।
জাহার প্রসাদে মূর্খজন মহাকবি ॥
তার পাদপদ্ম বন্দো সেবিয়া সতত।
প্রজাপতি বন্দো শ্বেত বিহঙ্গমরথ ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিভূসিত কর।
বিহঙ্গনাথের নাথ বন্দো দামোদর ॥
ভুজগ পট্টহ কর বিসাল লগুড়।
ব্রসব বাহনে প্রনমহো সশিচুড় ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন।
বন্দো গজমুখ নিললোহিত লোচন ॥
সরবনভব দেব ময়ুর বাহন।
পুর্ণসুধাকর মুখ বন্দো সড়ানন ॥
দিবসাধিপতি শুভ বন্দো অমরাট।
মোক্ষস্থান কৈলে মাতা রাজবলহাট ॥
সকল বিফল তার অভক্ত চণ্ডিরে।
সুরাশুর নর স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে ॥
হেম হৈম বিরচিত দেউল বিসাল।
জথা দেবি বৈসে সর্ব্বদেবতাবতার ॥
বন্দো বিসালাক্ষি দেবি গলে মুণ্ডমাল।
ডাহিনে বন্দিলু নন্দি বামে মহাকাল ॥
সমুখে ডামরসাই বির হনুমান।
ক্ষেত্র জাটুবটুধাটু বন্দো বলরাম ॥
ঐরাবতারুঢ় সচিনাথ পুরন্দর।
ত্রিদেব নগরপতি সচির ইশ্বর ॥
জার কণ্ঠে পারিজাত মালা জানুগতা।
রাত্রিদিবা সন্ধ্যাকালে (৫ক) নহে মলিনতা
মেরুপ্রদক্ষিণে অবিরত পরকাসি।
কমল কুমুদবন্ধু বন্দো রবিসসি ॥
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো জোড় করি কর।
কেবল ভরোসা দুর্গা চরণকমল ॥
ভকতভারন দিন রজনির নাথ।
বিহগনাথে জেঠ সুরশুতাজাত ॥
প্রনমহো তাঁর পদকমল যুগল।
কেবল কুর্পর জার প্রথিবিমণ্ডল ॥
পত্রে জার বৈশে বিষ্ণু অমিত চরিত্র।
পুষ্পমধ্যে প্রনমহো পরম পবিত্র ॥
গলিত তুলসিদল ভজে জেই জন।
অচিরাতে হয় স্বর্গ মর্ত্তের ভাজন ॥
উদয় পর্ব্বত গিরি হেম হিমাচল।
বন্দিলু নিবসে জথা দেবতা সকল ॥
দসরথ নৃপশুত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভরথ শত্রুঘ্ন বন্দো সিতার চরণ ॥
ভারথি কমলালয়া কৃষ্ণের যুবতি।
একত্রবাসিনি বন্দো সর্ব্বলোকে গতি ॥
ব্রহ্মাদি না জানে জার জলের কারণ।
ব্রহ্মকমণ্ডলু দ্রবরূপ নারায়ণ ॥
নবশশী সিরোমনি সিরে নিবাসিনী।
বন্দো ভাগিরথি মহাপাতকনাসিনী ॥

সরসিজাসনা সিজাতরুনিবাসিনী।
বন্দো বিষহরি দেবী ভুজগজননী ॥
কমলকানন ভবা হরের দুহিতা।
প্রণত জনেরে মাতা রক্ষিহ সর্ব্বদা ॥
প্রথমে বাল্মিক মুনি ব্যাস বন্দো সুক।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি বন্দো চারি যুগ ॥
নানা তির্থ ক্ষিতিতলে বন্দো যথা তথা।
ভকতি করিয়া বন্দো অনন্ত দেবতা ॥
ডাথীনি যোগিনী বন্দো ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা বন্দো গুরুজন ॥
বন্দিলু পণ্ডীত গদাধর খুল্লতাত।
সুসিক্ষিত কৈল (৫) জত্নে দিয়া বস্তুজাত ॥
শুমেরু লংঘিতে চাহি অলপ সকতি।
সমুদ্র তরণে ভেলা বান্ধিল দুর্ম্মতী ॥
অলংঘ্য শুমেরু গিরী অপার সাগর।
কেবল ভরসা দুর্গার চরণকমল ॥
কলিকালে কথা জত পুরাণঘোষনা।
আচম্বিতে হৈল মোর চঞ্চল ধীসনা ॥
শুনিয়া প্রবন্ধ মনে বাঢ়িল সন্তোষ।
ক্ষেমিহ পণ্ডীত জন যদি থাকে দোষ ॥
সেই সভা নহে যথা না থাকে পণ্ডিত।
এক চিত্তে সুন নর বাশুলীর গীত ॥
ত্রিপুরার গুণকথা জগতের হিত।
প্রবুদ্ধ তরুণ সিশু জন বিমোহিত ॥
জার মতী রহে চণ্ডীর চরণকমলে।
রোগ সোক দারিদ্র না থাকে কোন কালে
সাকে রষ রথ বেদ সসাঙ্ক গনিতে।
বাসুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥
চণ্ডীর চরণে মতী পূর্ব্বজন্মতপে।
পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে ॥
ত্রৈলোক্য না জানে কেহ দেবীর প্রভাব।
সুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ধনপুত্র লাভ ॥
সুখ মোক্ষ পায় যদি করে ভাল সেবা।
পরিবার লইয়া সুখে বঞ্চে রাত্রি দিবা ॥
জনক জননী বন্দো গুরুর চরণ।
প্রণাম করিয়া বন্দো সমস্ত ব্রাহ্মণ ॥
সুনারি সুনর ভজে নহে কুমিলন।
একভাবে পুজে জদি চণ্ডির চরণ ॥
বিপ্রকুলে জর্ম্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাঝ ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতির নন্দন।
পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরা স্মরণ ॥৬॥৭॥

॥ বসন্তরাগ ॥

দক্ষের দুহিতা সতি হিমালয়ের ঘরে।
ভবপত্নি জনমিলা মেনকাজঠরে ॥
জন্মিঞা বিজয়া (৬ক) জয়া লৈয়া দুই সখি।
তপস্যা করিতে গেলা রাকা সশিমুখি ॥
তপ করে ভগবত্তি মহেস ভাবিয়া।
দ্বাদশ বৎসর বনে পবন ভক্ষিয়া ॥
পার্ব্বতীর তপে স্থির নহে পশুপতি।
সত্তরে আইলা যথা বৈসে ভগবতী ॥
আচ্ছাদন কপিন নমেরুকরমালী।
কুশ কমণ্ডলু হাথে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
ত্রিপুরা নিকটে হর বলে ত্রিলোচনে।
কমলমুকুরমুখী তপ কি কারণে ॥
অসত্য না বল মোরে সুন সশীমুখি।
আমী তপস্বিনী বড়ু তোর দুঃখে দুঃখি ॥
তপের কারণ তোর আমি নাহি বুঝি।
কীয়ে হেতু পতীবর মাগ সুন মগঝি ॥
অনবধ্য(ত্ত ?) তন্থ কেহ মাগে স্বর্গবর।
উত্তম স্বরীর তোর স্বর্গে বাপঘর ॥
পুরুষরতন চাহে সর্ব্ব লোকে জানী।
রতন পুরুষ চাহে কোথাহ না শুনি ॥
যুবতীরতন তুমি না করিহ লাজ।
যদিবা পুরুষ চাহ তপে কোন কাজ ॥
প্রথম যৌবন তোর দুঃখ নাহি সহে।
ধর্ম্মের সাধন দেহ মুনিজন কহে ॥

অশ্বিনিকুমার বিধি হরি পুরন্দর।
আর বা কেমন দেব ইহ প্রাণেশ্বর ॥
বড়ুর বচনে বলে পরিহরি লাজ।
তপস্বিনি নারিরে জিজ্ঞাসা কোন কাজ ॥
ব্রাহ্মণের বচন না লংঘে তপস্বিনী।
পুনরুক্তি করি ইছি প্রভু শুলপানী ॥
শুনিঞা দেবীর বাণী হাসে ব্রহ্মচারী।
রূপগুণ জাতিকুল সকল বিচারী ॥
শুন ল সুমুখী নাহি বুঝ ভাল মন্দ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য মুকুন্দ ॥•॥

॥ কামোদ রাগ ॥

গলে হাড় মাল হস্তে নৃকপাল
জনম গেল চাঁদ বয়্যা।
প্রেত ভূত সঙ্গে বিভূতি মাথে রঙ্গে
পাগল ধুতুরা খায়্যা ॥
সকল গুণহিন (৬)রূপে ত্রিনয়ন
না জানী কোন জাতি জন্ম।
কাহার নন্দন বুঝি নে কী আছে ধন
লাজট পুরাতন তনু ॥
চল ল গুণবতি কে তোরে দিল মতী
নাত্তিনী ছলে উপহাষে।
এ বোলে করি ভর তপস্তা নিরন্তর
যুগল সখী দুই পাষে ॥
ভ্রুকুটী করি নাচে প্রতিজন নাছে
ভিক্ষা মাগে দেষে২।
ইছিলে ভালবর সশানে জার ঘর
সুনারী ভজে কুপুরুষে ॥
ধুস্তর ফুল কানে সন্তোষ বিষপানে
কখন পরে বাঘছাল।
হৃদয় দ্বিরষণ সুরভিনন্দন
বাহন সিরে জটাভার ॥
ব্রাহ্মণ বুদ্ধে সহি কি জানি কী কহি
সুনিঞা প্রভুতিরস্কার।
বড়ুরে প্রতিসেধ করহ সখী দ্রুত
মন্দ বলিবেক আর ॥
জে বলে মহাজনে মন্দ জেবা সুনে
তাহার পাপ দুর নহে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥•॥

॥ পয়ার ॥

ব্রাহ্মণের বদনে প্রভুর নিন্দা সুনী।
তপের কানন তেজে নগের নন্দিনী ॥
মরালগামিনী রামা জায় পদে২।
হাথ দিয়া ব্রহ্মচারি আগলিল পথে ॥
শশীমুখী বলে বড়ু কিরূপ তোমার।
আমি তপস্বিনি নারী ছাড় দুরাচার ॥
তোমারে জানিল আমি কপট তপস্বি।
কাননে ভুলিলে তুমি দেখিয়া রূপসী ॥
হরিনাম কর বৃথা হাথে জপমালা।
বাহিরে নলক্ষত ভাণ্ড ভিতরে মদিরা ॥
দেবীর বচনে উচ্চ বলে ব্রহ্মচারী।
আমি ত্রিনয়ণ শিব সুন প্রাণেশ্বরী ॥
তুমি ভূতনাথ দেব আমি নাহি জানি।
আপন মুরতী যদি ধর সুলপাণী ॥
চণ্ডীর বচনে ব্রহ্মচারী বেশ ছাড়ে।
আপনার কণ্ঠ উজ্জল কৈল হাড়ে ॥
হাতে নৃকপাল ধুস্তর ফুল কানে।
(৭ক) বিভূতি ভুসিল সকল অপচ্যানে (?) ॥
সুরনদি চীণ্ডির (?) ধবল কৈল জটা।
ললাটে উইল চাঁদ চন্দনের ফোঁটা ॥
মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী।
কান্ধে রাখে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধ ঝুলী ॥
মকর কুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাশী।
চন্দ্রিকা প্রকাসে যেন পুর্ণিমার সসি ॥
রূপে ত্রিভুবন মোহে দিতে নাহি সিমা।
উরিল রুচির কণ্ঠে গরল কালিমা ॥

পরিল বাঘের ছাল হৃদয় বাসুকী।
বলদ উপরে ত্রিনয়ন পঞ্চমুখি ॥
ত্রিশুল ভুসিত ভুজ ডমরু বাজায়।
পথে আগলিল গৌরি দেব মহাকায় ॥
তুমি প্রাণনাথ শ্বরহর ত্রিনয়ন।
আমার পিতার ঠাঞি কর নিবেদন ॥
বসিষ্ঠে ডাকিল দেব কুবেরের মিত।
উরিলা বসিষ্ট মুনি যুবতি সহিত ॥
মুনিরে পুজিয়া দেব বলে সুলপানি।
বিভাহ করিব আমি নগের নন্দিনি ॥
চল মহাসয় মুনি হিমালয়ের ঠাঞি।
উত্তম জনের কথা ব্যভিচার নাঞি ॥
হিমালয়ের ঠাঞি মুনি দিল দরসন।
মুনিরে পুজিয়া গিরি দিলেক আসন ॥
শুন মুনি মহাসয় তুমি সর্ব্ব জান।
কি হেতু আমার গৃহে করিলে পয়ান ॥
মুনি বলে সুন নগ নগের প্রধান।
মহাদেবে কর তুমি গৌরি কন্যা দান ॥
তোমার আদেষ ভাল বলে হিমালয়।
(৭) শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥•॥

॥ মল্লাররাগ ॥

গৌরি বিভা দিব হরে শুভক্ষণ বেলা।
বাহিরে বান্ধিল গিরি রতন ছান্দলা ॥
জানাজানি কৈল হিমালয় প্রতি ঘরে।
স্ত্রি-পুরুসে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥
নানা সব্দে বাদ্য বাজে যয়সঙ্খ ভেরি।
আনন্দিত হইল লোক নগনৃপপুরি ॥
সুরঙ্গ বসন পরে রত্নের কুণ্ডল।
ললাটে সিন্দুর কার নয়নে কজ্জল ॥
সধবা বিধবা নারী ভ্রমে নানা সুখে।
কেহ কাঁখে করি চুমু দেই সিশুমুখে ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গিত।
মঙ্গল উচ্চারে কেহো যুবতি সহিত ॥
কেহো পরিহাসে হলদি জল ছলে।
যুবতি জনের দেই নিতম্ববসনে ॥
সিশু বৃর্দ্ধ তরুন ত্রিবিধ জনে মেলা।
গুয়া পান লয় একে২ থই কলা ॥
কস্তুরি চন্দন গন্ধ কুঙ্কুমের খেলা।
বিভাহের কালে জত অবলা প্রবলা ॥
অধিবাষ কৈল শুক্র নগের ঝিয়ারি।
নান্দিমুখ জথাবিধি কৈল হেমগিরি ॥
মহেস বরিব সুখে গৌরি দিব দানে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥•॥

॥ মঙ্গলরাগ ॥

যতেক যুবতিগণ হইয়া হরসিত মন
জল সাহে দিয়া জয়ধ্বনি।
কক্ষে করি হেমঝারা কণ্ঠে দিয়া পুষ্প ঝারা
দ্বিরদগামিনি নিতম্বীনি ॥
পঞ্চশ্বরে গায় গিত ঘরে২ উপনিত
রাখে ঘট আলিপনা দিয়া।
নানা(৮ক)পরিপাটী করি আশীয়া গৃহের নারি
জল দিল তথি উভারিয়া ॥
ললাটে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল আর
কর্পুর তাম্বুল দিল ভুজে।
সঙ্খ ঘণ্টা বিনা বেনি দগড় কাঁসড় ধ্বনী
মৃদঙ্গ পটিহ সানি বাজে ॥
গৃহে আশী রামাগণ করে পড়া মঙ্গলন
ঘরে হইতে অম্বিকারে আনি।
চারিদিগে চারিকলা পুখুরের মাঝে সিলা
তদুপর বসিল ভবানী ॥
জয়২ উচ্চারণ অঙ্গে দেই উদর্ত্তন
কেহো২ জল ঢালে সিরে।
বসন পরিল গৌরি সুত্র দিয়া বেঢ়ে নারী
নানা বেস করে লইয়া ঘরে ॥
ঔসধ বাটিল নারি বরিবারে ত্রিপুরারী
সাজিয়া লইল হেম থালা।

ত্রিপুরাচরণ আসে কবিচন্দ্র মধু ভাসে
রক্ষ দেবী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ * ॥

॥ জতিছন্দ ॥

গৌরির বিবাহে রামা হরসিত হইয়া।
প্রেসিত পেসিত বাটিল মৌসধি
বক্ষে সর্করা দিয়া ॥
কুঞ্জরগামিনি জতেক রমনি
ভুজেতে ভেসজ ডালা।
বরিতে সঙ্কর চলিলা সত্বর
নিকটে উপনীত ভেলা ॥
ভুজপরি ভূজ্য জতেক সজ্য
নিছিয়া পেলই রঙ্গে।
মুকুটে মৌসধি মোক্ষতা যুবতি
দ্বিচরণ চলই ভঙ্গে ॥
গোশ্রবণ পতি গন্ধে ছোটই
হরিভুজ নথসই ছাল।
ভ্রূকুটিত নেত্রে বিভুসিত গাত্রে
হৃদয়ে অস্তিক মাল ॥
সিরোপরি গঙ্গ গৌরি আধ অঙ্গ
ত্রিশূল দিণ্ডিম ভুজে।
পেখি দিগাম্বর মহিলামণ্ডল
বদন লুকাঅহি লাজে ॥
ভুজঙ্গ মারে ছো না সম্বরে কো
(৮)নারী অতিরথ ছোটে।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঠেকাঠেকী ঝঞ্জন
কেহ কোথা পড়ে উঠে ॥
ঝম্পিত বসনা মিশ্রিত রষণা
হৃদয় মারল ভুক।
জামাতা লাঙ্গট দেখিয়া বিকট
সর্ব্বহু ভাবহুঁ দুঃখ ॥
ভেজ্জত নাটকী হাশত মুচকী
কেবল নারদ তন্ত্র।

শৈলসুতাপদ মজে মন্মথ
ভ্রঙ্গ ভনই কবিচন্দ্র ॥ * ॥

॥ মল্লার রাগ ॥

গলায় হাড়ের মাল জটা ধরে শিরে।
কিলী২ করে সাপ জটার ভীতরে ॥
ধুস্তর কুসুম কর্ণে সঙ্খের কুণ্ডল।
বিভুতি ভুষণ অঙ্গ বৰ্জ্জিত অম্বর ॥
আইমা২ আলো ঝিয়ে বিধাতা দুরন্ত।
গৌরীর কপালে ছিল যুগী জ্জরা কান্ত ॥
বাপ্তার নন্দন কিবা হেন মনে বাসি।
কোথা হইতে আইল বুঢ়া কুভণ্ড তপস্বি ॥
ঘটাইয়া দিল জেবা এমত কুকাজ।
অবস্য তাহার মুণ্ডে পড়িবেক বাজ ॥
না হউক বিবাহ গৌরি থাকু অবস্থিতা।
হেন বরে বিবাহ দেই দারুন তোর পিতা ॥
আল বুক মরো২ হেথা আইস গৌরি।
জনক জননী আজি তোরে হইল বৈরি ॥
লাঙ্গট দেখিয়া হরে বলে আইয়গন।
শুনিঞা মেনকা দেবি যুড়িল ক্রন্দন ॥
মহেসের তত্ব সবে জানে ভগবতি।
কবিচন্দ্র বিরচিল মধুর ভারথি ॥ * ॥

॥ কো রাগ ॥

দেখ গ যুবতিগণ বিধি বড় নিদারুন
কি করিব বল না ভারথি।
বিভুতি মাথিয়া গায় জ্জরা তনু অতিসয়
ঐ সিব গৌরার পতি ॥
গলায় বান্ধিয়া গৌরি হইমু জে দেসান্তরি
জেন বিভা না করে মহেস।
ছাড়িয়া গৃহের আস করিব কাননবাস
এই কথা কহিনু বিশেষ ॥
ত্রৈলোক্য সুন্দরি গৌরা বর কেন যুগি বুঢ়া
এত দুঃখ সহে মোর প্রানে।

করিয়া গরল পান　তেজিব আপন প্রান
যেন আমি না দেখি নয়ানে ॥
যুগল নয়ান খাইয়া　সম্বন্ধ ক'রল গিয়া
এত দুঃখ দেই তোর বাপ।
তোমার বালাই লইয়া জলে প্রবেশিব গিয়া
তবে সে খণ্ডিব মোর তাপ ॥
(৯ক) আগে বাপ দেখে বর তবে ধন কুল ঘর
আর জত তার অনুবন্ধ।
যদি দোস থাকে বরে　কি করিব কুল ঘরে
এই কথা বিধির নিবন্ধ ॥
ঘটক বসিষ্ঠ মুনি　কুচেষ্টা ক'রল কেনী
ধীর হইয়া হইল কুমতী।
বর্ণের নির্ণয় নাঞি　কাহারে কহিব মুঞি
বর আগ্য দিল ব্রষপতী ॥
পঞ্চম বৎসরের কালে তপস্যা করিতে গেলে
ক্রমে হইল দ্বাদশ বৎসর।
ধাতার দারুণ মতী　বুঝিতে নারিল গতি
পসুপতী তোরে দিল বর ॥
শুনিয়া মায়ের কথা　হৃদয়ে লাগিল ব্যথা
প্রভুনিন্দা সহিতে না পারি।
হৃদে চিন্তে নারায়ণী　নারদে ডাকিয়া আনী
কবিচন্দ্র রচিল মাধুরী ॥•॥

॥ পয়ার ॥

নারদে ডাকীয়া বলে অচলনন্দিনী।
সমোচিত রূপ ধর প্রভু সুলপাণী ॥
বিবাহের কালে এত নহেত উচিত।
ধরি মনোহর রূপ পালহ পিরিত ॥
নারদের বচনে প্রভু দেব স্মরহর।
ইঙ্গিতে ধরিল রূপ কামিনীমনোহর ॥
ইসত নয়নে আশী দেখিল মেনকা।
সরতের চন্দ্র জেন সম্পুর্ণ চন্দ্রিকা ॥
জামাতার রূপ দেখি পড়ি গেল ধন্দে।
রড়ারড়ি জায় রামা চুল নাহি বান্ধে ॥
আইস২ রামাগণ দেখ গ জামাতা।
সফল জঠরে আমি ধরিল দুহিতা ॥
মদনমোহন কিবা জামাতার রূপ।
আইস২ আইয়গণ দেখ গ স্বরূপ ॥
মেনকার বচনে সভে দিল দরসন।
দেখিল শিবের রূপ জিনি ত্রিভুবন ॥
মুরুছা পড়িল জত দেখিল যুবতী।
হৃদয় কুশুমবান হানে রতিপতী ॥
ফিরে২ জায় রামা রূপ নিরক্ষিয়া।
সভে মরি হরগৌরীর বালাই লইয়া ॥
দেখিয়া হরের রূপ জতেক অবলা।
আঁখি ঠারাঠারি করে হৃদয় চপলা ॥
জেন হাণ্ডি তেন সরা বিধীর ঘটন।
চামি মরকত জেন অভেদ মিলন ॥
হর হরি আরাধন কৈল ভাগ্যবতী।
তে কারণে বিধি হেদে দিলেন পসুপতী ॥
তরুণ যুবতি (৯)জত বৃদ্ধ জনে মেলা।
একে২ রামাগণ খায় মনকলা ॥
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার বরে।•
মনকলা খায় রামা দশম অক্ষরে ॥

॥ একাবলী ছন্দ ॥

তরুণী জতেক রামা বলে।
তপস্যা করিব সিন্ধুজলে ॥
তবে যদি না পাই ত্রিনয়ণ।
তবে সভে তেজিব জীবন ॥
তখনি কথিল যুবা নারী।
জনক জননী হৈল বৈরী ॥
হেন বর ছিল যদি দেশে।
তবে বাপ না কৈল উদ্দেসে ॥
বিবাহ না দিল হেন বরে।
বজ্র পড়ুক তার সিরে ॥
জখন ছিলাম অবস্থিতা।
যুগল নয়ন খাইল পিতা ॥

তখন কথিল বৃদ্ধ জন।
পুনরপি নেউটুক যৌবন ॥
দুরেতে তেয়াগিয়া রঙ্গ।
পরিতোশে আনি তবে গঙ্গ ॥
তবে সে পুরয়ে মোর আস।
হা হা বিধি করিল নৈরাস ॥
জখন ছিলাম বাপঘর।
কোথা ছিল হেন পোড়া বর ॥
অনঙ্গ আনন্দে সভে বলে।
কুমারের পোয়ান জেন জলে ॥
নীবারিল সভে চিত।
বরিতে চলিল তুরিত ॥
মেনকা লৈয়া জত সখা।
শিবের সমুখে দিল দেখা ॥
অম্বিকাচরণে দিয়া মতী।
কবিচন্দ্র কহে সুভারথি ॥•॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

মেনকা বরিল শিবে পায় দিয়া দধি।
দেউটী জালিয়া ফিরে সকল যুবতী ॥
গলায় মনর দিয়া ফিরে যথাবিধী।
মহেসের মুকুটে হাসিল কলানিধী ॥
রতনে ভুসিল গৌরী কলধৌতনিভা।
উচ্চারে মঙ্গল জত সধবা বিধবা ॥
অঙ্গনে সানন্দ জত কন্যাবরব্রজ।
ভুবনমোহন রূপ ব্রষে ব্রষধ্বজ ॥
সিংহপ্রষ্ঠে ত্রিপুরা দ্বিভুজে নাগদল।
চারি দিগে চারি রত্ন প্রদিপ উজ্জল ॥
ধরিলেক অন্তস্পট সুভক্ষন পাইয়া।
সমিরণ বেগে সিংহ জায় বইয়া২ ॥
প্রদক্ষিণ সাত বার দুই হাত বুকে।
ঘুচাইল অন্তস্পট শিবের সমুখে ॥
পাক দিয়া পেলে পান উর্দ্ধ দুই ভুজে।
হরগৌরীর বিবাহে সকল দেব নাচে ॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী(১০ক)দেবী বুঝে পরিপাটী।
দুই কর্ণে তুলি দিল চিরাতের কাঁঠি ॥
হরিল দুহাঁর মন নাচনে২।
মাল্য দিয়া ভগবতী বরে ত্রিলোচনে ॥
বিবিধ ঔষধ দিল মুকুটে মথিয়া।
নারিকেল পিয়ে প্রভুর বুকে হাথ দিয়া ॥
নায়েকে চামুণ্ডা চণ্ডী করিবে কল্যান।
তোমার প্রসাদে হউক ধনপুত্রবান ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরি ॥ • ॥

॥ কামোদ রাগ ॥

মধুর মাদল বাজে দুন্দবি দিমি২।
গৌরি মহেসে দুহেঁ করিল ছামনি ॥
প্রেত ভুত পিচাস সঘনে পেলে চেলা।
উরিল নারদ মুনি কন্দলমেখলা ॥
হুড়াহুড়ি মারামারি কন্যাবরগনে।
ব্যাকুল বসিষ্ট মুনি কন্দল মার্জ্জনে ॥
সগুড় চাউলি পেলে জত বিদ্যাধরি।
মধুকরকোলে কেলি করে মধুকরি ॥
নারদ কথিল ক্রুপা কর সর্ব্বজনে।
মাজ্জিল(১)কন্দলরে বিনা গুয়া পানে ॥
ধন্য হিমালয় গিরি ধন্য সে মেনকা।
কোটী চান্দ মুখবরে গৌরি দিল বিভা ॥
ধনি২ করে জত উর্ব্বসি গনিকা।
অন্তরে হরিস হইল মুনিজ্ঞা মেনকা ॥
বেদমন্ত্র পড়ে গুরু কোলে ভগবতি।
হুলাহুলি দিল আশী সকল যুবতি ॥
কন্যাদান জথাবিধি কৈল হিমগিরি।
সঙ্করেরে সংপ্রদান করিল সঙ্করি ॥
দক্ষিণা সন্তোসে দ্বিজ পড়ে সুভবেদ।
জে বচনে সকল দারিদ্র দুঃখ ভেদ ॥
খির ভোজন করে মহেস সঙ্করি।
সুখে পুষ্প গেল জত নগরে নাগরি ॥
পুষ্পের সয্যায় হর ত্রিপুরা সহিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাস্থলির গিত ॥ • ॥

॥ প্রথম পালা সমাপ্ত ॥

"গৌড়ীয় সমাজ"

প্রতিবাদ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়-রচিত ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৬০ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "গৌড়ীয় সমাজ" নামক প্রবন্ধে অনেকগুলি ভুল আছে। রীতি-বিরুদ্ধ কাজও প্রবন্ধকার যোগেশবাবু ইহাতে কিছু করিয়াছেন। এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

গৌড়ীয় সমাজ প্রবন্ধের সকল তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯-১৩ ; ৪০৭ হইতে নকল করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ নকলেও অনেক ভুল আছে। প্রথমে এই নকলের ভুলগুলির কথা বলিব ; সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছোটখাট ভুলগুলিও দেখাইব।

প্রবন্ধের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এবং অন্যত্র রামদুলাল দের পরে মূলাতিরিক্ত "সরকার" শব্দটি আছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে উহা চৌকা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। মূলের কাশীনাথ মল্লিক স্থলে উপরোক্ত অনুচ্ছেদেই হইয়াছে—"কাশীনাথ মান্না"!!! প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় "pp. 549-54. London" স্থলে—The Asiatic Journal, London, December 1823 হওয়া উচিত ছিল। নিগড় শব্দের প্রচলিত অর্থ—বেড়ী ; পাদবন্ধনী। যোগেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা (১৮ পৃষ্ঠা) "ভারতবাসীর গলায় পরিতে বাধ্য" করিয়াছেন। পত্রিকার ২১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অনুচ্ছেদে, মূলের "উত্তর২" [অর্থাৎ উত্তরোত্তর] স্থলে "সত্বরই" হইয়াছে। ঠিক পরের অনুচ্ছেদে 'সমাচার দর্পণ' "২০ ডিসেম্বর" স্থলে "২৩ ডিসেম্বর" হইয়াছে!!!

নকলকারীর দোষে যে এই ভুলগুলি হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ নকল করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধ নকল করিবার সময় তাহা মানিয়া চলা হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

নকলের ভুল ছাড়া প্রবন্ধটিতে অস্পষ্ট উক্তি অনেক আছে। একটি মাত্র দেখাইব। প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় যোগেশবাবু বলিয়াছেন : গৌড়ীয় সমাজের "মূল বাংলা অনুষ্ঠান-পত্রখানি পাইতেছি না।" এই অস্পষ্ট উক্তি হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও উহা পান নাই। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তকের ৪০৭ পৃষ্ঠার মন্তব্য অনুসরণ করিয়াও যদি তিনি উহা না পাইয়া থাকেন, অথবা ঐরূপ অনুসন্ধান করিবার সময় ও শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া লেখা কি তিনি উচিত মনে করেন না? ইতিহাসের ছাত্র তিনি ইহা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই শ্রেণীর অস্পষ্ট উক্তি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের গৌরব কতখানি লাঘব করে।

যোগেশবাবুর প্রবন্ধের কয়েক স্থানে গৌড়ীয় সমাজে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম আছে।

দুইটি স্থলে দলের প্রথম জনের নামের পূর্ব্বে "পণ্ডিত" শব্দটি আছে। প্রথম বার (পৃঃ ১৬) রামজয় তর্কালঙ্কারের নামের পূর্ব্বে এবং দ্বিতীয় বার (পৃঃ ২০) রঘুরাম শিরোমণির নামের পূর্ব্বে। এ রীতিও অপূর্ব্ব। পণ্ডিত শব্দটি যদি দলের প্রথম জনের বিশেষণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দলের অপর তর্কালঙ্কার শিরোমণিরা কি অপরাধে বিশেষণহীন ভাবে উল্লিখিত হইলেন। তাহা ছাড়া রামজয় তর্কালঙ্কার, রঘুরাম শিরোমণি প্রভৃতি যে অর্থে পণ্ডিত,—রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেই অর্থে পণ্ডিত নহেন। এই জন্য পণ্ডিত শব্দটি, কষ্টকল্পনা করিয়াও দলের সকলের বিশেষণ বলা যায় না।

"স্বদেশের হিত-সাধনের জন্য এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা একক ভাবে…" ইত্যাদি বাইবেলগন্ধী অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। ১৯ পৃষ্ঠার "We therefore…" প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট নকলের ভুলের (ঐ বাক্যের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে "And translators" শব্দের পর বাক্যের প্রধান ক্রিয়া undertake কথাটি না দেওয়ায়) সম্বন্ধেও কোন কথা বলিব না। কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজীর অনুবাদের মধ্যে—"এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে"—এই কথার মূল তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিব।

প্রবন্ধের সকল স্থানে এই ভাবে নানা রকম ভুল থাকিলেও যোগেশবাবুর ভঙ্গিটি বড়ই উপাদেয়। সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া (অংশ ১), অনুষ্ঠান-পত্রটির মর্ম্মালোচনায় আসিয়া (অংশ ২), পরবর্ত্তী অধিবেশনগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার পর—ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন (অংশ ৩)। সভার বিবরণ, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম, চাঁদার পরিমাণ—সমস্তই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে নকল করিয়া যোগেশবাবু ঐ আকর-গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করেন নাই। প্রমাণ লোপ করিয়া তাঁহার নকলের ভুলগুলি সংশোধনের পথও বন্ধ করিয়াছেন। ইহা ইতিহাস-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও কারণহীন নয়। পরিষদের নিয়মাবলীর ৪ ধারার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রবন্ধের মৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল।

প্রবন্ধের শেষের দিকে যোগেশবাবুর ঐতিহাসিক নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। অতি ছোট দুইটি খবরের পর ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থের নাম তিনি করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের স্থান-বিশেষে তাঁহার সাবধানতা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহার মতে সমাজের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। "চারিটি",—এই শব্দও তিনি অনেক সময়ে বিশেষণহীন ভাবে লিখেন নাই;—"অন্যূন চারিটি" লিখিয়াছেন। কিন্তু এত আড়ম্বর সত্ত্বেও তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় কৌতুককর।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে গৌড়ীয় সমাজের ছয়টি মাত্র অধিবেশনের উল্লেখ আছে।[১] যে

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তথা যোগেশবাবুর প্রবন্ধে ছয়টি অধিবেশনের উল্লেখই আছে। অথচ যোগেশবাবু বলিয়াছেন "অন্যূন চারিটি।" গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমরা পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এরূপ আপাদমস্তক গবেষণা আর দেখি নাই।

'সমাচার দর্পণ' অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক অধিবেশনের সংবাদ ছাপাইত, তাহাতেও পরবর্ত্তী অধিবেশনের কোন খবর নাই। সমাজগৃহ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হইলেও উহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালীশঙ্কর ঘোষালের 'ব্যবহারমুকুর' নামক গ্রন্থ সমাজের পক্ষ হইতে প্রকাশের কথা হইলেও সমাজ তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালের কোন গবেষণামূলক গ্রন্থের সঙ্কলক অথবা প্রকাশকদের কেহ নিজেদের পূর্ব্বগামী হিসাবে বা অন্য কোন ভাবে গৌড়ীয় সমাজের নাম করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গৌড়ীয় সমাজ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা তো ব্রজেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। এই জন্যই ব্রজেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছায়, সমাজের কর্ম্মের ও প্রভাবের কোন চিহ্ন পরবর্ত্তী কালে না থাকা সত্ত্বেও যোগেশচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিলেন (পৃ: ২২) :—"বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যে দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখী প্রসারলাভ—ইহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের মঙ্গল-হস্ত প্রত্যক্ষ (sic) করি" !!!

নকলের ভুল, ইংরেজীর অনুবাদের ভুল, কাঁচা অনুবাদ এবং প্রবন্ধের সমস্ত উপাদান ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া অতি অবান্তর দুইটি খবরের শেষে তাঁহার গ্রন্থের নাম করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথের কীর্ত্তিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করিবার ও পাঠকের নিকট সাধু সাজিবার অপচেষ্টা ছাড়া এই প্রবন্ধে যোগেশবাবুর নিজস্ব কিছুই নাই।

যোগেশবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আয়াস স্বীকার করিয়া এত কথা লিখিলাম। এই ধরণের প্রবন্ধ তাঁহার ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সুনাম কি ভাবে নষ্ট করিবে, তাহা তিনি দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। **ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মাল-মসলা আবিষ্কার না করিয়া নূতন কথা বলা যায় না।** এ সত্য তাঁহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস

উত্তর

শ্রীযুত প্রবোধকুমার দাসের প্রতিবাদ পাঠ করিলাম। ইহাকে প্রতিবাদ না বলিয়া 'অভিযোগ' বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রবোধবাবুর অভিযোগ—আমি মূল প্রমাণাদি লোপ করিয়া পূর্ব্ব-আলোচিত বিষয়ই উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কারণ "পরিষৎ নিয়মাবলীর ৪ ধারার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার [যোগেশবাবুর] প্রবন্ধের মৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল।" প্রবোধবাবুর আর একটি উক্তি—"ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মালমশলা আবিষ্কার না করিয়া নূতন কথা বলা যায় না। এ সত্য তাঁহার [যোগেশবাবুর] ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।" অভিযোগকারীর এই উক্তিগুলির সত্যতা প্রথমেই যাচাই করিয়া দেখা যাক্।

'গৌড়ীয় সমাজ' প্রবন্ধে আমার মূল বক্তব্য গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্র সম্পর্কে। এই অনুষ্ঠানপত্রের ভিত্তিতে আমি গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য, কর্ম্মপ্রণালী এবং অধিবেশনাদির আলোচনা করিয়াছি। অনুষ্ঠানপত্রখানি তখন বাংলায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলেও আমি এখানি ব্যবহার করিতে পারি নাই। এখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সনে 'ওরিয়েণ্টাল রিভিয়ু'তে। ইহার সঙ্গে সমাজের প্রথম দুইটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—মায় চাঁদার পরিমাণ ও সভ্যদের নাম—প্রদত্ত হয়। এ সকলই লণ্ডনের 'এশিয়াটিক জর্ন্যালে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমি সে যুগের ও এযুগের বহু ইংরেজী বাংলা পুস্তক দেখিয়াছি, পত্র-পত্রিকারও ফাইল ঘাটিয়াছি। কিন্তু কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচনা অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বহু অমূল্য জিনিজের মত এটিও লোকচক্ষুর অগোচরে অনাদৃত অবস্থায় ছিল।

১৮২৩-২৪ সনের 'সমাচার দর্পণে' 'গৌড়ীয় সমাজে'র কিছু কিছু বিবরণ বাহির হয়, যেমন ঐ সময়ের 'সমাচার চন্দ্রিকায়'ও বাহির হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৯-১১ পৃষ্ঠায় গৌড়ীয় সমাজের চারিটি অধিবেশনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৪০৭ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানপত্রখানি মূলে ও অনুবাদে কোথায় রহিয়াছে তাহার নির্দ্দেশমাত্র আছে। যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা দেখিতে পাইবেন—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় প্রদত্ত বিবরণগুলিতে গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্র হইতে কোথাও উদ্ধৃতি নাই। এখানির কথা মাত্র তিন বার অতি সংক্ষেপে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে: (ক) "... ঐ সভায় অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলেন" (পৃ. ৯); (খ) "...যে অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঠ করা গেল..." (পৃ. ১০); এবং (গ) "...সভায় অনুষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন..." (পৃ. ১১)। গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্রখানির, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত বিধায়, আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কোথায়ও অনুষ্ঠানপত্রখানির উল্লেখ বা ইহা প্রাপ্তির নির্দ্দেশমাত্র থাকিলেই 'এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে' এ কথা কোন সুস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন না।

অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধের আরও অনেক ভুল-ত্রুটি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এগুলির বেশীর ভাগই এত তুচ্ছ ও নিরর্থক যে, জবাবের অপেক্ষা রাখে না। অভিযোগকারী প্রবন্ধের কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই আমার পাণ্ডুলিপিতে ঠিকই ছিল। তথাপি মুদ্রিত ভ্রমগুলির সংশোধনও যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়াছি। অভিযোগকারীর মাত্র কয়েকটি অভিযোগের জবাব সংক্ষেপে এখানে দিব:

১। অভিযোগকারী 'নিগড়' শব্দের প্রয়োগে (পৃ. ১৮) ভুল ধরিয়াছেন। অভিধানে দেখিতেছি—'নিগড়' শব্দটির প্রচলিত অর্থ শৃঙ্খল, লোহার শিকল। মূল অর্থ 'পায়ের বেড়ী' বটে। অভিযোগকারী যে ভাষাতত্ত্বের এই সাধারণ কথাটিও জানেন না যে, শব্দের মূল অর্থ ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া গিয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্য।

২। অভিযোগকারী 'পণ্ডিত' শব্দটির প্রয়োগ লইয়া আপত্তি তুলিয়াছেন। এক জনের

প্রথম নামটির আরম্ভে পণ্ডিত থাকিলে, 'কমা' চিহ্ন দ্বারা স্বতন্ত্র করা সত্ত্বেও, শেষের দিকের 'রসময় দত্তও' 'পণ্ডিত' হইবেন বলিয়াছেন। অদ্ভুত যুক্তি! স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ 'কমা' 'কমা' দিয়া এইরূপ লিখিলে যে চিত্তরঞ্জন দাশকেও 'স্যার' উপাধিভূষিত মনে করিতে হইবে তাহা এই প্রথম শুনিলাম!

৩। অভিযোগকারী আমরা অনুবাদকে (পৃ. ১৭ : 'স্বদেশের হিতসাধনের জন্য…')' 'বাইবেলগন্ধী' বলিয়াছেন। এ বিষয়টি পাঠক-পাঠিকারই বিচার্য্য।

৪। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশের (পৃ. ১৯) অনুবাদে ভুল ধরিয়াছেন। আমি উহার আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই, তাৎপর্য্য মাত্র দিয়াছি।

৫। অন্যূন চারিটি সভার 'অন্যূন' বিশেষণটিতে আপত্তি তোলা হইয়াছে, 'অন্যূন' বলিবার হেতু এই : আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, গৌড়ীয় সমাজের আরও অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজের মূল উদ্দেশ্য—(ক) বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং (খ) শাস্ত্রালোচনার প্রসার দ্বারা খ্রীষ্টানির প্রতিরোধ। ক্রমে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি প্রকট হইয়া পড়ায় মিশনরী পরিচালিত 'সমাচার দর্পণে' ইহার সংবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই। অনুষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্তু এই কারণেই 'দর্পণে' স্থান পায় নাই বলিয়া মনে হয়। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম খণ্ড) প্রথম গ্রন্থনকালে বহু অনুসন্ধান করিয়াও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ঐ সময়কার ফাইল পাওয়া যায় নাই। এই সকল ফাইল পাওয়া গেলে গৌড়ীয় সমাজের পরবর্ত্তী অধিবেশনগুলির কথাও হয়ত জানা যাইত।

৬। অভিযোগকারীর মতে আমার 'শেষ সিদ্ধান্ত পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় কৌতুককর'। গৌড়ীয় সমাজের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না, সমাজ কর্ত্তৃক কেন বই ছাপা হয় নাই—এই সকল কারণে তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। ঐ সময়কার বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অভিযোগকারী এরূপ মন্তব্য নিশ্চয়ই করিতেন না। তখন নব্যশিক্ষার ফলে সবেমাত্র আমাদের সঙ্ঘ-জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল। গৌড়ীয় সমাজের মত একাডেমিক এসোসিয়েশান, সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা, ভূম্যাধিকারী সভা—কত সভা সে সময়ে স্থাপিত হইয়াছে আবার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রভাব বা দান আজিও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের কোনটিরই নিজস্ব বাড়ী ছিল না, ইহাদের দান বা কৃতি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ না থাকিলে, বা পরবর্ত্তীরা উল্লেখ না করিলেও কি এইজন্যই আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে? গৌড়ীয় সমাজ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সঙ্ঘ-জীবন বা সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পথিকৃৎ। ইহার প্রেরণা পরবর্ত্তী দশ-পনর বৎসরে সমগ্র বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর সমাজ-জীবনে উপলব্ধ হইয়াছিল।

৭। অভিযোগকারী আমাকে 'নকলকারী' বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছেন। অন্ততঃ দশ বার 'নকল' শব্দটিও উক্ত অভিযোগ-পত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'নকল' কথাটির প্রচলিত অভিধানিক অর্থ—'অনুকরণ,' 'প্রতিলিপি'। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে কোথায়

অনুকরণ বা প্রতিলিপির স্পর্শ পাইলেন বুঝিলাম না। আমি সমসাময়িক তথ্যসমূহ যাচাই করিয়া দেখিয়াছি, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'ও অবশ্যই দেখিয়াছি। যেখানে যেখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি সেখানে সেখানে গ্রন্থখানির উল্লেখও করিয়াছি।

অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধ লেখার মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন। তবে আমি যে ইহাতে নূতন বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি সে সম্বন্ধে আশা করি দ্বিমতের অবকাশ নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ প্রকাশিত হইবে না।—স. সা. প. প.]

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	হইবে না	হইবে
১৬	১৫	কাশীনাথ মান্না	কাশীনাথ মল্লিক
২১	২৮	২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩	২০ ডিসেম্বর ১৮২৩

সভাপতির ভাষণ

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হইতে চলিল, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ বর্তমান পরিষৎ-মন্দিরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব হয়। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন :

"আমাদের দেশ বহুকাল হইতে পুত্রহীন হইয়া শোক করিতেছে। সে যাহা আরম্ভ করে, তাহা কোনো একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়,—তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়াই চলিয়াছে, কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না।"

গত অর্ধশতাব্দীকাল বঙ্গমাতার বহু কৃতী সন্তান আমাদের এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির—অর্থাৎ, বাংলা দেশ ও জাতির বহুবিধ কল্যাণ ও উন্নতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্তই প্রায় ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলগতভাবে। নানা জনের সমবেত চেষ্টায় সার্থকতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। কখনও রামেন্দ্রসুন্দর-ব্যোমকেশ, কখনও হরপ্রসাদ-নলিনীরঞ্জন-অমূল্যচরণ, কখনও হীরেন্দ্রনাথ-রাজশেখর, কখনও যদুনাথ-ব্রজেন্দ্রনাথ পক্ষিমাতার মত এই প্রতিষ্ঠানকে বুকের উষ্ণতা দিয়া রক্ষা করিয়াছেন; শক্ত-আশ্রয়-নিরপেক্ষভাবে শুধু সাধারণ সদস্য ও কর্মীদের সেবায় ও টানে পরিষৎ-রথের চাকা চলে নাই। এই পদ্ধতির কুফল আজ আমরা শোচনীয়ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ যখন এক দুই বা তিন স্বার্থলেশহীন সহৃদয় ব্যক্তিকে পরিষৎ-মন্দিরের কার্যপরিচালনার জন্য আমরা একান্তভাবে পাইতেছি না, তখনই আমাদের অনুভব হইতেছে যে, এক দুই তিনকে বাদ দিয়া নিরানব্বই একশো একশো-এককে ধরিলে আমাদের এতখানি বিপদ্ হইত না। পরিষৎ এমন অসহায় হইয়া পড়িত না।

আগে এক দুই তিনের পিছনে রাজা জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন একাধিক; কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে ভরাডুবি হইতে বসিলে এক দুই তিনের প্রভাবে তাঁহারাই সামলাইয়া লইতেন। এই কাছি-টানা পরিবহন-নীতি সারা পৃথিবী হইতেই উঠিয়া যাইতেছে, বাংলা দেশের বড়লোকেরা গরীব হইয়া পড়াতে এখানে অনেক পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখিয়াছেন। এখানে পুরাতনের পতন হইয়াছে, কিন্তু নূতন তাহার দায়িত্ব একেবারেই লয় নাই। যতক্ষণ এই সব কার্যকরী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ তো এগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। নহিলে এই পরিষদেই বহু মূল্যবান্ পুথি, মূর্তি, মুদ্রা, চিত্র এবং অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য বইয়ের যে সম্পত্তি গত বাট বৎসরের চেষ্টায় জমা হইয়াছে, যাহা আর অন্য

কোথাও নাই, সেগুলি তছনছ হইয়া যাইবে। সর্বনাশ হইবে বাংলা দেশ ও জাতির। এখন আমাদের উপযুক্তপরিমাণ সভ্য নাই যে, তাঁহাদের চাঁদায় সব সুষ্ঠুভাবে চলিবে; এককালীন দান নাই, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সাহায্য হাস্যকরভাবে নগণ্য, করপোরেশন সামান্য যা দিতেন, তাহাও বন্ধ করিয়াছেন—পরিষৎ-প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আয় হইতে আমরা পরিষৎকে কোনো রকমে ভাসাইয়া রাখিয়াছি। এই ভাবে বই বেচিয়া পৃথিবীর আর কোনো সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে আত্মরক্ষা করিতে হয় বলিয়া আমার জানা নাই। এখানেই দেখুন, হিন্দী-সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাইয়া বাঁচিয়া আছেন। অথচ তাঁহারা দেশ ও জাতির জন্য যাহা করিতেছেন, পরিষৎ তাহার চেয়ে কম কাজ করিতেছেন না। যে কেহ পরিষদের পূর্বাপর ইতিহাস অনুধাবন করিলে ইহা উপলব্ধি করিবেন।

এখন এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? আবার নূতন করিয়া আমরা এই পরিষৎকে দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে চাই। তাঁহারাই ইহার সম্পত্তির দায়িত্ব লইবেন, ইহাকে চালু রাখিবেন। আমার হিসাবে পরিষৎকে সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে মাত্র দুই হাজার মাসিক এক টাকা হারের সভ্য চাই। তখন আর কাহারও দরজায় আমাদের যাইতে হইবে না—না সরকার, না জমিদার। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এটিকে তখন শুধু বইবেচা-প্রতিষ্ঠান হইয়াও থাকিতে হইবে না। এখন নিয়মিত চাঁদা দেন, এমন মাত্র পাঁচ শত সভ্য আছেন। আর মাত্র পনেরো শত সভ্য কি পরিষৎ কামনা করিতে পারেন না? এই দুই হাজার সভ্য নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিষদের পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিলে ব্যক্তি বা দলগত একনায়কত্বের যে সন্দেহ অনেকে করিয়া থাকেন, তাহারও আর অবকাশ থাকিবে না।

সম্পূর্ণ বিলোপ ও ভাঙন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই ধরনের পরিবর্তন করিতেই হইবে—এই আমার সুচিন্তিত অভিমত। আজ বাড়ি-ভাড়া দিয়া ও বই বেচিয়া যে পরিষৎ টিকিয়া আছে—ইহা সমগ্র বাঙালা জাতির অগৌরব। এই অগৌরব হইতে অবিলম্বে বাঙালী জাতিকে বাঁচানো দরকার। আমার এই আবেদন সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে।*

শ্রীসজনীকান্ত দাস
সভাপতি
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬০

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনষষ্টিতম বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বর্ষে ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিল। ৫৯ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী সংক্ষেপে সদস্যবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

শোক-সংবাদ—বিগত বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল পরম হিতৈষী সদস্যবর্গকে হারাইয়াছি, প্রথমেই তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতেছি।

বিগত ১৭ই আশ্বিন সুসাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিগত ১৮।২০ বৎসর তিনি পরিষদের নানা বিভাগে কাজ করিয়া পরিষদের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের কি ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথের কি ছিলেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই জানেন। দারুণ আর্থিক অসঙ্গতির সময় তিনি কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া তিনি পরিষদ্‌কে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাবলম্বী করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরে আমরা ২৩এ কার্ত্তিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্য, প্রাক্তন সহকারী-সভাপতি ও বিশিষ্ট-সভ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে হারাইয়াছি। পরিষৎ-পুথিশালায় কাজ করিতে-করিতেই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুথি আবিষ্কার করিয়া ও বিস্তৃত টীকা-সহযোগে পরিষৎ-মন্দির হইতে তাহা প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে তাঁহার সহিত পরিষৎও অবিস্মরণীয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। বিগত ১৫ই আষাঢ় বিখ্যাত মনোবিদ্‌ ও প্রাক্তন সহকারী-সভাপতি ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরীন্দ্রশেখর তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভাদ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত জাতির অন্তরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ সদস্য ডাঃ অনিল সেন, ভূতনাথ কর, এস. আর. দাশ, সুরেন্দ্রনাথ দে, দৈবকীপ্রসন্ন রায়ের মৃত্যুও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাক্তন সদস্য সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাজনীতিজ্ঞ নলিনীরঞ্জন সরকার, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্রের মৃত্যুও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌরপতি নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সদস্য না হইলেও পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেশনেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল-বিয়োগে সমগ্র জাতি আজ শোকদগ্ধ। রাজনীতি-ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ না করিলেও

শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার দান এবং বাংলা ভাষার প্রসার ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার অপরিসীম চেষ্টা তাঁহাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সুসংবাদ :—পরিষদের এবং বাংলা-ভাষাভাষীর পক্ষে দুইটি আনন্দের সংবাদ আমি ঘোষণা করিতেছি। প্রথম, পরিবর্ত্তিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার পরিষদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা সাহিত্যের কর্ম্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ পরিষদের সভাপতিকে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সুবিবেচনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

আর একটি সুসংবাদ—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাষার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এবং অবাঙ্গালী নেতৃবর্গ বাংলা ভাষাকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য নির্লজ্জভাবে যে চেষ্টা করিতেছেন সেই কথা স্মরণ করিয়া আমরা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি. এস. কৃষ্ণকে তাঁহার এই উদার মনোভাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমি পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রধান শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান" পুস্তকখানির জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এখন আমাদের নিজের কথায় আসিতেছি।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছে :—শ্রীনরসিংহ মল্লদেব।

সদস্য—১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এইরূপ :—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযদুনাথ সরকার, ও ৩। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৯। শ্রীহরিহর শেঠ, ১০। ডাঃ শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১১। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১২। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১৩। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৪। ডাঃ শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৫। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৬। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৭। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৮। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ১৯। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২০। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২১। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২২। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ২৩। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ২৪। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২৫। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ও ২৬। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন।

সহায়ক-সদস্য—বর্ষশেষে ১৫।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সংখ্যা ৬৫১।

অধিবেশন :—আলোচ্যবর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (১) অষ্ট-

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—২৯এ ভাদ্র ১৩৫৯, (২) বিশেষ অধিবেশন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২৭এ আশ্বিন ১৩৫৯, (৩) প্রথম মাসিক অধিবেশন—৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৪) বিশেষ অধিবেশন—বসন্তরঞ্জন রায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২০এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৫) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৬) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৬এ পৌষ ১৩৫৯, (এই দিন পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য" বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।) (৭) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৪এ মাঘ ১৩৫৯, (৮) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—৩০এ ফাল্গুন ১৩৫৯, (৯) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মরণোৎসব—(এই বিশেষ অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের চারিখানি উপন্যাসের মধ্য হইতে একটি করিয়া দৃশ্য অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন 'জয়শ্রী সঙ্ঘে'র সদস্যাগণ।)—২৮এ চৈত্র ১৩৫৯, (১০) সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১৯এ বৈশাখ ১৩৬০, (১১) অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৬এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, (১২) সমাধিক্ষেত্রে ও পরিষদ্-মন্দিরে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মরণে বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ় ১৩৬০ (এই দিন ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর পরলোকগমনে শোক-সভা হয়।) (১৩) বিশেষ অধিবেশন—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২৪এ আষাঢ় ১৩৬০।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের উদ্যোগে আলোচ্য বর্ষে বিশেষজ্ঞ-দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল বক্তৃতায় পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক ব্যক্তি যোগদান করেন। সে বক্তৃতাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।—

(১) লোক-সঙ্গীত (গম্ভীরা সঙ্গীত) :—আলোচনা : শ্রীসজনীকান্ত দাস, ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও তৎসম্প্রদায়—৩ মাঘ ১৩৫৯ ; (২) লোক-সঙ্গীতে বঙ্গ মহিলা—শ্রীকামিনীকুমার রায়—১০ই মাঘ ১৩৫৯ ; (৩) ম্যাজিক লণ্ঠন সংযোগে বক্তৃতা—বক্তা : শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু। (ক) শিল্পশাস্ত্র ও ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির—১৭ই মাঘ ১৩৫৯ ; (খ) রেখ দেউলের প্রকারভেদ—২৪এ মাঘ ১৩৫৯ ; (গ) বাংলা দেশের মন্দির—২রা ফাল্গুন ১৩৫৯ ; (ঘ) উড়িষ্যার মন্দির ও মূর্ত্তি—৯ই ফাল্গুন ১৩৫৯ ; (৪) সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি—বক্তা : ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত—২৩এ ফাল্গুন ১৩৫৯ ; (৫) কবিকৃতি ও সমালোচনা—বক্তা : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—৩০এ ফাল্গুন ১৩৫৯ ; (৬) উড়িষ্যার ভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার বর্ত্তমান রূপ—বক্তা : শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব—২রা চৈত্র ১৩৫৯ ; (৭) জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—বক্তা : ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে—৭ই চৈত্র ১৩৫৯ ; (৮) ম্যাজিক লণ্ঠন সংযোগে বক্তৃতা—বক্তা : ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৫ই বৈশাখ ১৩৬০ ; (৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—১২ই বৈশাখ ১৩৬০ ; (১০) হিন্দী সাহিত্য ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা—বক্তা : ডাঃ শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা—১৯এ বৈশাখ ১৩৬০ ; (১১) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব—(ক) ২৫এ বৈশাখ ১৩৬০ কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সঙ্গীত ; "গীতোত্রী" সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন।

(খ) ২৬এ বৈশাখ—রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত—বক্তা : শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত পরিবেশন—"বৈতানিক" শিল্পীবৃন্দ শ্রীপ্রসাদ সেনের পরিচালনায় সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন ; (গ) ২৭এ বৈশাখ ১৩৬০—অভিনয় "গান্ধারীর আবেদন" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"—পরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ; (১২) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; (১৩) আধুনিক বাংলা ভাষা—বক্তা : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; (১৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ।

কার্য্যালয়—সভাপতি : শ্রীসজনীকান্ত দাস। **সহকারী সভাপতি :** শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযদুনাথ সরকার ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। **সম্পাদক :** শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৭।৬।৫২ তারিখে ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। শূন্যস্থানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হন। **সহকারী সম্পাদক :** শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল—ইনি পরে সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইলে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন, ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। **কোষাধ্যক্ষ :** শ্রীগণপতি সরকার। **চিত্রশালাধ্যক্ষ :** শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। **পুথিশালাধ্যক্ষ :** শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। **গ্রন্থাধ্যক্ষ :** শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। **পত্রিকাধ্যক্ষ :** শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য—(ক) সদস্যপক্ষে : ১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীইন্দ্রজিত্ রায়, ৪। ফাদার এ দোঁতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ১৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১৬। শ্রীবরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ১৭। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৮। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ও ২০। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়। শৈলেন্দ্রবাবু সহকারী সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইলে শূন্যস্থানে শ্রীপুলিনবিহারী সেন নির্ব্বাচিত হন। (ঘ) **শাখা-পরিষদ-পক্ষে :**—২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, ও ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন :—

১। (ক) কবিবর হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলী ১৩৬০ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করিতেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস। (খ) এতদ্ব্যতীত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি" টীকা-টিপ্পনী সংযোগে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব বসন্তবাবু পরিষৎকে দান করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

২। গত ৮ই শ্রাবণ পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই বৎসর পরিষদের হীরক-জয়ন্তীর বৎসর। ইহার জন্য এই বৎসরের শীতকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

৩। পরিষদের ইলেকট্রিকের তার প্রভৃতি জীর্ণ হওয়ায়, আশু সংস্কারের প্রয়োজন। এজন্য যথাসম্ভব শীঘ্র এগুলি সংস্কার করিয়া যথাযথ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনে ভোট গণনা করিবার জন্য শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস ও শ্রীহেমরঞ্জন বসুকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়।

৫। পরিষদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে পরামর্শ দিবার জন্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই শাখা-সমিতিতে আছেন,—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীসুশীলকুমার দে এবং পরিষদের সম্পাদক ও সভাপতি।

৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যে সহায়তার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস শাখা গঠিত ও আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশালা ও ছাপাখানা সমিতি গঠিত হয়।

প্রতিনিধি প্রেরণ—আলোচ্য বৎসরে পরিষৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সমিতিতে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও সমিতির পরিষৎ-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক, পুরস্কার ও বক্তৃতা সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—

(ক) কমলা-বক্তৃতা সমিতি—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

(খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বক্তৃতা সমিতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল,

(গ) শরৎচন্দ্র-বক্তৃতাসমিতি—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

(ঘ) সরোজিনী বসু-পুরস্কার সমিতি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

২। গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বর্ষিক অধিবেশনে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৩। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বিগত মে মাসে 'ভারতীয়-ভাষা-বিকাশ-পরিষদ্' নামে এক সর্ব্ব-ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার এই অধিবেশনে পরিষৎ-পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

৪। পরিষদ-সম্পাদক পদাধিকার বলে 'নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে'র কার্য্যকারী সমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও উনষষ্টিতম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় নূতন সংগৃহীত নিম্নলিখিত ২০ খানি পুথির মধ্যে ১৭ খানি উপহার স্বরূপ এবং বাকী ৩ খানি পুরাতন পত্র-রাশি বাছিয়া পাওয়া গিয়াছে।—

ক্রমিক সংখ্যা	পুথির নাম	রচয়িতা		
১	মহাভারত—সভাপর্ব্ব	বেদব্যাস	১৭১৬	শকাব্দ
২	„ —বনপর্ব্ব	„	১৭২১	„
৩	„ —বিরাট পর্ব্ব	„	১৭২০	„
৪	„ —উদ্যোগ পর্ব্ব	„	১৭১৮	„
৫	„ —ভীষ্ম পর্ব্ব	„	১৭১৮	„
৬	„ —দ্রোণ পর্ব্ব	„	১৭১৯	„
৭	„ —কর্ণ পর্ব্ব	„	১৭১৯	„
৮	„ —শল্য, গদা, সৌপ্তিক ও স্ত্রী পর্ব্ব	„	১৭১৭	„
৯	„ —শান্তি ও রাজধর্ম্ম পর্ব্ব	„	১৭২০	„
১০	„ —শান্তি ও দান পর্ব্ব	„		
১১	„ —শান্তি ও মোক্ষ পর্ব্ব	„	১৭২০	„
১২	„ —হরিবংশ পর্ব্ব	„	১৭২০	„
১৩	রামায়ণ—আদি, অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড	বাল্মীকি	১৬৯৩-৯৪	„
১৪	„ —কিষ্কিন্ধা, সুন্দরা ও লঙ্কা কাণ্ড	„	১৬৯৪-৯৫	„
১৫	অধ্যাত্ম রামায়ণ	মহাদেব কথিত		
১৬	মাধব মালতী	রামচন্দ্র মুখুটী		
১৭	নামহীন পুথি	কপি পীমাম্বর		
১৮	অমরু শতক	অমরু কবি	১৫৮৭	শকাব্দ
১৯	ছন্দোমঞ্জরী	গঙ্গাদাস কবিরাজ	১৬৫০	„
২০	বৃন্দাবন কাব্য	উগ্রসেনাত্মজ মানাঙ্ক		

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষে ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং অফিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণদিগস্থ বারান্দা 'সাহিত্য-পরিষদ্—পোষ্ট অফিস'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান—"Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০৲ দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্যও ১২০০৲ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবেদন করা হয়। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি আমরা পরিষদের বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যের পরিকল্পনা সমেত অর্থসাহায্যের জন্য একটি আবেদন করি। পরিতাপের বিষয়, আমাদের

সে আবেদনের কোন ফলই হয় নাই। সরকার পরিষদের পুস্তকাদির তালিকা প্রণয়নের জন্য ১৫০০০৲ দিতে স্বীকৃত হইয়া ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ৫০০০৲ দান করেন। ইহাতে আংশিক ভাবে তালিকা সঙ্কলনের কাজ হইয়াছিল; বাকী সাহায্য না পাওয়ায় এই কাজ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্বন্ধে যদি তাঁহারা উদার মনোভাব প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন, তাহা হইলে দেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রই সঙ্কুচিত হইবে এবং অদূর-ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থের অনটনের জন্য পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সম্পূর্ণ না হওয়াতে অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণ তাঁহাদের কার্য্যে পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে পারিতেছেন না। পরিষদ্-মন্দির সংস্কারের অভাবে জীর্ণ এবং যে কোন দিন যে কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। পরিষদ্, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসাধারণের সম্পত্তি। এই কথা বিবেচনা করিয়া আশা করি সরকার তাঁহাদের বদ্ধমুষ্টি সম্প্রসারিত করিয়া পরিষদ্‌কে সাহায্য করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখিতে অগ্রণী হইবেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ—১। সাধারণ তহবিলের অর্থে। (ক) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় নূতন ৯১।৯৩।৯৪ সংখ্যক পুস্তকে গিরীশচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলা নাগ ও নিরুপমা দেবীর জীবনী ও ৯২ সংখ্যক পুস্তকে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'রামপ্রসাদ সেনে'র জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই চরিতমালায় ২৪।২৫ সংখ্যক পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ ও ৪১ সংখ্যক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ২। ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল হইতে ইতিপূর্ব্বে (ক) 'রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী'র ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বর্ষে ২য়, ৪র্থ, ও ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে রামমোহনের সমগ্র বাংলা রচনাবলী এক খণ্ডে বাঁধানো হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডটির ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) দীনবন্ধু মিত্রের 'দ্বাদশ কবিতা', 'কমলে কামিনী', 'বিবিধ-গদ্যপদ্য', 'নবীন তপস্বিনী,' 'লীলাবতী,' 'সুরধনী কাব্য,—এই ছয় খানি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজ সিংহ' (৪র্থ সং), 'লোক রহস্য' (৩য় সং) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষেও 'রিকার্ডো'র ধনবিজ্ঞানে'-এর মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। আশা করা যায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের মধ্যেই পুস্তকটির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে।

শাখা-পরিষৎ:—আলোচ্য বর্ষে মানপুরের (মানভূম) 'মিলনী সঙ্ঘ'কে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তবে ইহার উদ্বোধন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

এতদ্ব্যতীত মূল পরিষৎ এবং ইহার শাখাগুলির সহিত পরিষদের সম্পর্ক সুনির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশমত শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। নানা কারণে এই শাখা-সমিতির কোন সভা অদ্যাবধি আহ্বান করা যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বৎসর এ বিষয়ে একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শিলং শাখা তাঁহাদের নিজস্ব পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিলং-এর কর্ম্মীবৃন্দকে এজন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর একটি তৈলচিত্র গত ৬।৮।৫৯ তারিখের প্রথম মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তৈলচিত্র বসিরহাটের ভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী-স্মৃতি-সমিতি দান করিয়াছেন।

নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন : গত ২৮।১২।৫৯ তারিখের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ৯ সংখ্যক নিয়মাবলীতে সংযোজনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

"যে কোন সাধারণ সদস্য যিনি একাদিক্রমে অন্যূন ১৫ বৎসর পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত আছেন, তিনি এককালীন ১৫০ টাকা পরিষদ্‌কে দান করিলে, কার্য-নির্ব্বাহক সমিতি ও সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আজীবন সদস্যরূপে গণ্য হইবেন।"

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান :—বিগত বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণে উল্লেখ করিবার পর আলোচ্য বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে পরিষদকে একটি 'জনহিতকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান' বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়াছেন এবং সরকারী গেজেটে এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি পরিষৎ, পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য হইতে কেন বঞ্চিত হইল তাহার কারণ আমরা জানি না। আশা করি, পৌর প্রতিষ্ঠান তৎপর হইয়া তাঁহাদের সাহায্য অবিলম্বে প্রদান করিবেন। অবশ্য পূর্ব্বের ন্যায় এ বৎসরও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার :—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে সাত জনকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নী, একজন মহিলা সাহিত্যিক ও একজন পুরুষ সাহিত্যিক।

এই ভাণ্ডার প্রধানত পুলিনবিহারী দত্ত প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় নূতন অর্থ সাহায্য দ্বারা ভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধি না হইলে ভবিষ্যতে পরিষদের এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যটি বন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। আশা করি, দেশবাসী এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবেন।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ৬৭ ও উপহারপ্রাপ্ত ১৯৭ খানি) সংযোজিত হইয়াছে।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে দুই-আড়াই বৎসরের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১২৬০।৬১।৬২ সাল) উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বর্ষে বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষৎ-গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পত্রিকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

উপসংহার:—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬০ বর্ষে পদার্পণ করিল। পরিষদের এই ৫৯ বৎসরের ইতিহাস যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের ও গর্ব্বের বিষয়। তৎসত্ত্বেও পরিষদের বর্ত্তমান কর্ম্মী-পরিষদ্ উপলব্ধি করেন যে অনেক কিছুই করা উচিত ছিল, যাহা নানা কারণে করা যায় নাই এবং অদূরভবিষ্যতে যুগোপযোগী অনেক কিছুই করিবার প্রয়োজন আছে। অনারব্ধ কার্য্য করিবার দায়িত্ব দেশের ছাত্র, যুবক ও নবীন-সাহিত্যিকদের। ভাগ্যহত বাঙ্গালী নানা প্রকারে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলা বিচ্ছিন্ন এবং অ'জ বাঙ্গালী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। দুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিবেশীরাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর একমাত্র গর্ব্বের বস্তু তাহার ভাষা ও সাহিত্য। সেই ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার গৌরব ও প্রসারিত করিবার দায়িত্ব দেশের বর্ত্তমান ও অনাগত দিনের যুবকদের। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষদের কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার জন্য দেশের যুবক ও ছাত্রদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা আমার নাই। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আবার সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী, বিশেষত: যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে পরিষদের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া, পরিষদের বার্দ্ধক্য-পীড়িত কর্ম্মীদের অবসর দিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বহুজনের কথিত ভাষা হিসাবে হিন্দী সরকারী ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লক্ষ্য বাংলা ভাষাকে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতির ভাষায় পরিণত করা। আশা করি আমরা সকলে এ বিষয়ে অবহিত হইব। ইহাই আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নিবেদন। বন্দেমাতরম্।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সম্পাদক

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে [illegible]কুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীগণপতি সরকার — শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় — শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীইন্দ্রজিৎ রায় — শ্রীমনোমোহন ঘোষ
শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার — শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ২। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘো
৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যা
৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ ফাদার
দ্যোতেন, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীপ্রবোধকুম
ঘোষ ১৩। শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, ১৪। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীবিজনবিহার
ভট্টাচার্য্য, ১৬। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ১৮। শ্রীযোগেশচ
বাগল, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, ২১। শ্রীচিত্তরঞ্জন রা
২২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচি

*

তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সহ কয়েকখানি

বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রামাণিক সংস্করণ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৬০

কবীর ও পূর্ব্বভারতীয় সাধনা

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

(২)

গত বার আলোচনা করে দেখিয়েছিলাম যে, কবীরের সঙ্গে পূর্ব্বভারতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্মমতের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। দেখিয়েছিলাম যে, সিদ্ধাচার্য্যদের সহজ সাধনার ধারা, আউল-বাউলের সাধনার ধারা, বৈষ্ণব সাধনা, নাথধর্ম্ম ও মহাযান সম্প্রদায়ের ধারা, সবই এসে কবীরের মাঝখানে মিশেছে। আরও দেখিয়েছিলাম যে, বাংলার চর্য্যাপদ, চণ্ডীদাসের সাহিত্য ও বাংলা মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে কবীরের কি অদ্ভুত মিল আছে। এবার দেখা যাক যে, কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা কেমন করে একটি স্তররূপে আজও বিদ্যমান আছে, তার পর কবীরে বাঙালীজনোচিত মনোবৃত্তি এবং কবীরের "ঘর" ও "বোলী" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

কবীরের ভাষা

যদি আমরা কবীরের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব—কবীরের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন ভাষা এসে তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণীকে চিরন্তন করে রেখেছে। শ্যামসুন্দর দাস "কবীর গ্রন্থাবলী"র মাঝখানে দেখিয়েছেন যে, কবীরের ভাষা "খিচরী" অর্থাৎ খিঁচুড়ী বা মিশ্রিত ভাষা। এর মধ্যে আছে পঞ্জাবী, রাজস্থানী, ব্রজভাষা, আউধী, বিহারী, বাংলা, ফার্সী ও আরবী। এই বহুভাষাসমন্বয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব ব্যাপার নয়। যদি আমরা বৌদ্ধ গাথা-সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সুরু করে আধুনিক কালে টি. এস. এলিয়টের সাহিত্য পর্য্যন্ত আলোচনা করে দেখি, তবে দেখবো যে, এই ভাষা-সমন্বয় একটা পুরানো রীতি মাত্র। অনেক দিন ধরে এর ধারা চলে আসছে এবং আজ পর্য্যন্ত এর জের শেষ হয়নি। অনেকে কবীরের এই ভাষা-সংকরতাকে ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু হিন্দীর সমালোচকেরা কি করে ভুলে যেতে পারেন রহীমের অপূর্ব্ব সুন্দর "মদনাষ্টক" কবিতাকে; বাঙালী সমালোচকেরা নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'কে এই ভাষা-সংকরতার জন্য অপছন্দ করেননি। কবীরের মধ্যে পঞ্জাবীর প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তবে রাজস্থানী ও ব্রজভাষার ব্যবহার কবীরের পক্ষে খুব অসম্ভব মনে হয় না। কারণ, উত্তরভারতের বিভিন্ন অংশে রাজস্থানী ভাষায় বিরচিত 'বীরগাথা কাব্য' তখন প্রচলিত ও ব্রজভাষার ঢেউ তখন সমস্ত উত্তরভারতকে বিচলিত করেছে। ফার্সী ও আরবী ভাষার ব্যবহারও কবীরের পক্ষে মোটেই অসম্ভব মনে হয় না। কেন না, এই দুইটি ভাষা রাজকীয় সমাদরের কল্যাণে বহুল প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ মুসলমানগৃহে লালন-পালন ও

মুসলমান গুরুসম্প্রদায়ে বিচরণ কবীরের বাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে বই কি! কিন্তু কবীরের পক্ষে বাঙলা ও বিহারী ভাষার ব্যবহার একটু বিচিত্র বলে মনে হয়। বিহারের ভাষা ও বাংলার ভাষা বেশী সমাদর তো প্রাকৃত আমলে পায়নি। বিদ্যাপতির জন্য মৈথিলী অনেক পরবর্ত্তী কালে সমাদৃত হয়েছিল এবং তারও অনেক পরবর্ত্তী কালে বাংলা। কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বিহারী ভাষার ব্যবহার বিশেষ বিস্ময়কর। কেউ কেউ বলেছেন, কবীর বিহার ও বাংলার অনেক সাধুসন্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে মিশেছিলেন ব'লে তাঁর মধ্যে বাংলা ও বিহারী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। যদিও এই ব্যাখ্যা খুবই নির্ভরযোগ্য, তবুও কবীরের মধ্যে বাংলা ও বিহারী ভাষার ব্যবহারের আর কোন কারণ থাকতে পারে না কি? এ আলোচনা পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকদের জন্যে রেখে দিয়ে আমরা এখন দেখি, কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা কি রকম ভাবে আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কবীরের মধ্যে পঞ্জাবী ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করব। কেন না, কবীরের মধ্যে শ্যামসুন্দর দাস যেখানে পঞ্জাবী ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখেছেন, সেখানে কোনও কোনও জায়গায় বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্যামসুন্দর দাস কবীরের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কবীরের মধ্যে পঞ্জাবী ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:—

১। "ন" স্থলে "ণ"

২। পঞ্জাবী বহুবচন, যথা—

(ক) লুণ বিলূগা পাণিয়া, পাণী লুণ বিলূগ [ভূমিকা; ক, গ্রন্থাবলী; দাস: পৃষ্ঠা ৬৮]

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে কবীরগ্রন্থাবলীতে শ্যামসুন্দর দাস বলেন যে, এর মধ্যে (ক) বাংলা ধাতু √আছ, ও (খ) "ইল" প্রত্যয় আছে। যেমন:—

'কহ কবির কছু আছিল জহিয়া'

(গ) বাংলা ধাতু √পার (হিন্দী—সকনা) ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

'সাঁঈ কু ঠাকুর খেত কু নেপই, কাইথ খরচ ন পারই'

তুলসীদাস ও জায়সীর ভিতর অনুরূপ ব্যবহার আছে। শ্যামসুন্দর দাসের মতে কবীর যে 'উপকারী' স্থলে 'উপগারী' ব্যবহার করেছেন, তা অপভ্রংশ রীতিরই বিচিত্র জের টানা মাত্র। সম্পাদকের মতে কবীরের রচনাতে "দাহন" স্থলে 'দাঝন'-এর ব্যবহার বিস্ময়কর। এই ব্যবহারের কোনও সন্তোষজনক কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সম্পাদকের মতে কবীরে যে দুটি প্রধান 'বোলী' দেখা যায়, তা হল আউধী এবং বিহারী।

'কবীরগ্রন্থাবলী'র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে 'কবীরগ্রন্থাবলী'র যে আলোচনা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য হলেও বোধ হয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। পঞ্জাবী ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে

তিনি দন্ত্য 'ন' স্থলে মূর্দ্ধণ্য 'ণ'এর যে ব্যবহারের কথা আলোচনা করেছেন, তাকে পঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য না বলে অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। আর যেহেতু পঞ্জাবী ভাষায় এখনও অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য (ইথ, হথ, গড্ডী ইত্যাদি) দেখা যায় সেই জন্য (এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত "ইণ্ডো-এরিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দী" পুস্তক দ্রষ্টব্য) পঞ্জাবীতে দন্ত্য 'ন' স্থলে "ণ" ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু কবীরের সমসময়ে প্রাচীন মধ্যবাংলায় এই অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বেশী মাত্রায় দেখা যায়। প্রাচীন মধ্যবাংলার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত। আমরা বসন্তরঞ্জন রায়সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ হতে এই ধরণের কয়েকটি কথা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা নীচে দিলাম :—

জাণো (৮১); পুণ (৮২); আপণ (৮২); দাণ (৮৩); মণে (৮৫); পাণে (৮৬); কাহিণী (৮৯); মহাদাণী (৮৯); ভালমণে (৯০); আলিঙ্গণে (৯১)। সুতরাং দন্ত্য "ন" স্থলে 'ণ' ব্যবহার পাঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। এটি একটি অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক বাংলা পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায়।

পঞ্জাবী সুভাষিত বলে সম্পাদক "লুণ বিলগা পাণিয়া, পাণী লুণ বিলগ" গ্রহণ করেছেন। কবীর-ব্যবহৃত ঐ অংশটির বাচ্য অর্থ "নুন মিশে যায় জলে, জল মিশে যায় নুনে"। এর গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ বাদ দিয়ে দেখা যাক, এই ধরণের ব্যবহার বাংলাতে কবীরের সমসময়ে ছিল কি না? কবীরের সমসময়ে বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে (১৫শ—১৬শ শতাব্দী) অনুরূপ প্রকাশভঙ্গীর উদাহরণ পাওয়া যায়। বিরহক্লিষ্টা রাধার "তানব" অর্থাৎ ক্রমক্ষীয়মানতার বার্ত্তা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির হয়েছে বড়ায়ি। বলছে :—

'চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে॥'

অর্থাৎ, 'কৃষ্ণ, রাধা তোমার বিরহে মারা যেতে বসেছে। রসের সাগরে তার দেহ 'লুণী'র মত।'" নুনের পুতুল রসের সাগরে বা প্রেমের সাগড়ে পড়ে ক্রমশঃ নিঃশেষ হ'তে চলেছে।" [বসন্তরঞ্জন বাবু গ্রহণ করেছেন 'লুণী' অর্থাৎ 'নবনী'। অর্থাৎ নবনী-সুকুমার দেহবিশিষ্টা রাধা রসের বা প্রেমের সাগরে পড়ে মারা যেতে বসেছে।' এ ক্ষেত্রে বসন্তবাবু সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান লেখক তাঁর অর্থ গ্রহণ ক'রতে পারছেন না। কারণ 'নবনী' থেকে 'লুণীর' বিবর্ত্তন স্বাভাবিক হলেও এ ক্ষেত্রে অর্থবোধ হয় না। দেহকে 'নবনীর' সঙ্গে তুলনা করা অনেক ক্ষেত্রেই হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে নবনী-সুকুমার দেহের ক্ষীণতা বোঝাবার জন্ত 'প্রেমের রৌদ্র' বা 'প্রেমের অনল' প্রভৃতির ব্যবহার উচিত ছিল। (লবণ >লোণ> লুণ, লুণ) লবণ অর্থে 'লুণ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন মধ্যবাংলায় ছিল। এখনও 'লবণ-হীন' অর্থে 'আলুনি' শব্দের ব্যবহার বাংলাতে ও 'লুণ' শব্দের ব্যবহার ওড়িয়াতে আছে।

কবীর-সমসময়ে বা অল্প পরবর্ত্তী কালে বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এও এই ধরণের 'সুভাষিত' ব্যবহারের নিদর্শন আছে। যথা :—

"লুনির পুতুল যেন মিলায় সরিরে।"

বিরহক্লিষ্টা রাধাকে (=চৈতন্যকে) প্রেমের সলিলে (=সরিরে ; র=ল) লবণের পুতুলের মত ক্রমশঃ বিলীয়মান বলা হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থ—"নবনীর (কোমল) পুতুলের মত শরীর (শ=স) বিরহে মিলিয়ে যাচ্ছে।"—গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' 'রসের সাগরে নবনী-দেহা রাধিকা' অর্থ করা অপেক্ষা "প্রেম-রসের সাগরে লবণ-পুত্তল সদৃশ দেহ" অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। যদি তাই হয়, তা হলে কবীরের "লুণ বিলগ পাণিয়া, পাণী লুণ বিলগ" কেবল পঞ্জাবী প্রভাব বলা ঠিক হবে কি? এ ধরণের ব্যবহার বাংলাতে বা পূর্বভারতেও ছিল। কবীর, যিনি সম্পাদকের মতে বাংলা 'আছ', 'ইল', 'পার' প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, তাঁর পক্ষে এ ধরণের ব্যবহার বাংলা বা পূর্বভারতীয় সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হয় না। অবশ্য পঞ্জাবী ভাষা হতে এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ কবীরে আসা অসম্ভব, এ কথা আমরা বলতে চাই না। তবে পূর্ব্বভারতীয় ভাষার প্রভাবকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল পঞ্জাবীর প্রয়োগ বলাতেই আমাদের আপত্তি।

সম্পাদক কবীরের দ্বারা 'উপকারী' স্থলে 'উপগারী' ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু এই অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য এখনও বাংলায় চলে। বাংলাতে কথাবার্ত্তায় 'উপকার' স্থলে 'উবগার্' বলা হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দাস কবীরের "দাজ্ঝন" শব্দে ('দাহন' অর্থে) বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন—বাংলাতে "দাহ্," "সহ্," "বাহ্" ইত্যাদি শব্দ "দাজ্ঝ," "সজ্ঝ" "বাজ্ঝ" ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। সুতরাং 'দাহ্' (দাজ্ঝ) শব্দের উচ্চারণ প্রভাবে 'দাজ্ঝন' (দাহন) শব্দের বিবর্ত্তন হয়েছে মনে করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। আর 'হ্' যদি 'জ্ঝ' রূপে বাংলার আশে-পাশে কবীরের সময়ে ব্যবহৃত না হয়, তা হ'লে এটিকে কবীরের উপর বাংলার প্রভাব বলা অসঙ্গত হবে না বোধ হয়। তবে মনে রাখতে হবে, 'হ্' > 'জ্ঝ' প্রাকৃত যুগ থেকে চলে আসছে। 'মহ্যম্' শব্দ থেকে 'মজ্ঝ', 'মঝু' শব্দের বিবর্ত্তন এমনি করেই হয়েছে।

কবীরের 'বানী', 'বাণী' কথাটি নাথযোগীদের মাঝখান দিয়ে এসেছে অনেকে বলেন। আর নাথধর্মের সঙ্গে বাংলার যোগ কিরূপ নিবিড় ছিল, তা এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য। নাথধর্ম্মের আদি গুরু 'মীননাথ' বাঙ্গালী ছিলেন বলেই সাধারণ বিশ্বাস। এটি কি পঞ্জাবী প্রভাব?

কবীরের "সাখী" শব্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কবীরের 'সাখী' ভারত-বিখ্যাত। এই পর্য্যায়ের পদের ভিতর কবীর সংসার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। এই তাঁর সাক্ষীর কাজ। কবীর বলেছেন :

"সাখী আঁখী জ্ঞানকী, সমঝ দেখু মন মাহি।
বিমু সাখী সংসারকা ঝগড়া ছুটত নাহি"।"

'সাখী হল জ্ঞানের চোখ, মন দিয়ে সমঝে দেখ। সাখী (সাক্ষী) বিনা সংসারের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয় না।' সংসারের মত ও পথের ঝগড়া দূর করতে কবীর 'সাখী' রচনা করেছেন। কিন্তু এই 'সাখী' শব্দের ব্যবহার সহজযানীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যথা "সাখি করিব জালন্ধরী পাএ"। (চর্য্যা : ১৬)। সাক্ষী অর্থে 'সাখি' 'সাখী' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন মধ্য-বাংলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের (২য় সংস্করণে ৫৭, ৬৯, ৮৫, ৯৪, ১৪৯, ১৭৪ পৃষ্ঠার) ভিতরে পাওয়া যাবে। কবীরের এই 'সাখী' পদগুলি সম্ভবতঃ সহজ-যানী সম্প্রদায়ের পদ রচনার একটি ধারা বলে মনে হয়। আর সহজযানএর সঙ্গে বাংলা বিহারের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল, তা সবাই জানেন। দ্বিবেদী-জী বলেন : অসল মেঁ সাখী কা মতলব হী য়হ্ হৈ কি পূর্ব্বতর সাধকোঁ কী বাত পর কবীর দাস অপনী সাক্ষী য়া গবাহী দে রহে হৈঁ।—হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা : পৃ. ৩৬।

কবীরগ্রন্থাবলী আলোচনা করলে দেখা যায়, কবীরের মধ্যে নিম্নলিখিত পূর্ব্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান—(১) সাখী, (২) বাণী, (৩) ভবিষ্যতে 'ইব'* (৪) অতীতে 'ইল,' (৫) 'আছ' ধাতু, (৬) 'পার' ধাতু, (৭) জ্ ঝ, ক>গ ইত্যাদি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, (৮) 'কিছু' (– কছু), 'তোর,' 'মোর' শব্দের ব্যবহার। (৯) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদসাম্য, (১০) বৈষ্ণবীয়তা ও সহজীয়তা। ['খসম' শব্দের ব্যবহার নিয়ে দ্বিবেদী-জী "কবীর" গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা বিশেষ স্মরণযোগ্য। অবশ্য চন্দ্রাবলী পাণ্ডের কথাও অগ্রাহ্য নয়।]

উল্লিখিত আলোচনাগুলি দেখলে কবীরের সঙ্গে বাংলা-বিহারের যোগ কত নিবিড় ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, 'ব্রজভাষা' ব্যবহার তখনকার কবির পক্ষে এক বিশেষ রীতি। 'ব্রজভাষা' তখন প্রধান কাব্যভাষা এবং প্রায় প্রতি প্রদেশের লোকই ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করছিলেন। তাই বলত,

"ব্রজভাখা হেত ব্রজ বাস ন অনুমানিয়ে।"

কিন্তু বাংলা বিহারের ভাব, ভাষা, ধ্বনি, ধর্ম্ম কি ভাবে কবীরে স্থান পেয়েছে দেখে বিস্মিত হতে হয়। 'ব্রজভাষা'র যা সম্মান, সে সম্মান বাংলার ত ছিল না, তবে ?

* ভবিষ্যতে 'ইব'কে রাজস্থানী 'বা', হিন্দী 'না', বাংলা 'তে' বলে গ্রহণ করা যায় কি ? দেখুন :—

(১) বৈ দিন কব আবৈঙ্গে ভাই,

জা কারনি হম দেহ ধরী হৈ, মিলিবৌ অংগি লাগাই। [এখানে "আবৈঙ্গে" ভবিষ্যৎকাল নির্দেশক]—পৃ. ১৯১।

(২) উন দেস জাইবো রে বাবু, দেখিবো রে লোগ কৈছু লো।

উড়ি কাগারে উন দেস জাইবা, জাসু মেরা মন চিত্ লাগা লো ॥—পৃ. ২১৩

কবীরের মধ্যে বাঙ্গালীসুলভ মনোবৃত্তি

মনে রাখতে হবে, কবীরের কাশীতে আবির্ভাবের পূর্ব্বের ইতিহাস আমরা কিছুই জানি না। আর কবীর কাশীতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে যাঁরা বলেন, তাঁরা অনেক কিম্বদন্তীর সঙ্গে উল্লেখ করেন কবীরের কথা :—

"কাশীমেঁ হম প্রগট ভয়ে হৈঁ রামানন্দ চেতায়ে।"

অর্থাৎ কবীর বলছেন, 'কাশীতে রামানন্দ কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি প্রকট হয়েছি।' অনেকে অর্থ করেন :—'কাশীতে আমার জন্ম এবং রামানন্দ আমাকে চেতিয়েছেন।' কিন্তু 'প্রগট' (প্রকট) শব্দের অর্থ আবির্ভূত করাই ঠিক হবে। কবীর কাশীতে উদ্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন দেশের লোক ছিলেন তিনি। সাধারণতঃ সাধু সন্ন্যাসীরা নিজের গ্রামে বা দেশে 'ভাব' পান না। অন্যত্র আবির্ভূত হওয়াই তাঁদের রীতি। বিশেষতঃ বংশ-কৌলীন্যহীন কবীরের পক্ষে আপন জীবদ্দশায় কাশীর মত স্থান থেকে সম্মান লাভকে নিজের দেশ থেকে সম্মান লাভ বলা যায় কি? আর কাশীতে বাস করলেই তাঁকে কাশীর লোক মনে করতে হবে কেন? কাশী প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের প্রধান তীর্থক্ষেত্র! কবীরের পূর্ব্বে বিখ্যাত বাঙ্গালী, মনুর টীকা 'মন্বর্থমুক্তাবলী'র লেখক কুল্লুক ভট্ট (গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ। কাশ্যা-মুত্তরবাহি জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈস্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী।) কাশীতে জাহ্নবীতীরে টীকা রচনা করেছেন। আর কবীরের পরে বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতী তুলসীদাসকে হিন্দী রামায়ণ রচনায় কি সাহায্য করেছিলেন, জানবার জন্য রামনরেশ ত্রিপাঠী রামচরিতমানস : তুলসীজীবনী, পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন। কাশী আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর প্রধান তীর্থস্থান। সুতরাং 'কবীর'কে কাশীতে 'প্রগট' হওয়ার জন্য কাশীর লোক বলা কি উচিত হবে?

শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত কবীরগ্রন্থাবলীতে কবীরের একটি পদ আছে, যেটিকে তত্ত্বব্যাখ্যাশূন্য করলে পদটিতে বাঙ্গালী-মনের ছাপ লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। কবীর বলছেন :—

বাগড় দেস লুবন কা ঘর হৈ,
তহঁা জিনি জাই দাঝন কা ডর হৈ ॥ টেক ॥
সব জগ দেখৌ কোই ন ধীরা, পরত ধুরি সিরি কহত অবীরা ॥
ন তহঁা সরবর ন তহঁা পাণী, ন তহঁা সদ্‌গুরু সাধু বাণী ॥
ন তহঁা কোকিল ন তহঁা সুবা, উঁচে চঢ়ি চঢ়ি হংসা মুবা ॥

—ক.গ্র : পৃ. ১০৯

অর্থাৎ :—

বাগড় দেশ 'লু' (গরম হাওয়া)-এর ঘর। সেখানে যে যায় তার দাহন ভয় ॥
সকল জগৎ দেখলাম, ধীর নয় কেউ ; পড়ে ধুলি শিরে বলে আবীর ॥

না সেখানে সরোবর না সেখানে পানী (জল), না সেখানে সদ্‌গুরু সাধুর বাণী ॥
না সেখানে কোকিল, না সেখানে শুক ; উঁচুতে চড়ে চড়ে হংস মারা পড়ে ॥

এখানে লক্ষ্য করা যায়, কবির মনে ভাসছে সেই দেশের কথা, যেখানে 'লু' নেই, জল বা সরোবর সেখানে প্রচুর। যেখানে রয়েছে কোকিল, হংস, শুক। আর যেখানে নেই লাল ধুলো, যা মাথায় পড়লে মাথা আবির-রাঙা হয়ে যায়। এ কি কবির Nostalgia ?

যে তিনটি পাখীর কথা কবীর বলেছেন, সেই তিনটিই বাংলার ঘরের প্রধান পাখী ছিল বলে সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' (২য় সং পৃ. ৩৫) আছে :—

'হংস রএ সরোঅরে সুআ হো প্যঞ্জরে
কুইলি সে নন্দন বনে।'

এ পাখীগুলি অবশ্য কেবল বাংলারই বলা উচিত হবে না। বাংলার আশে-পাশে সর্ব্বত্রই এদের প্রতি প্রীতি দেখা যাবে। কিন্তু বাঙ্গালীর 'লু'-ভীতি ও সরোবরভরা দেশ যেন কবীরের ঐ কবিতা থেকে কেমন একরকম ভাবে ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়। এত সরোবর এবং লাল ধূলিবিহীন দেশ কি বিহার বা কাশী ? কবীর কীর্ত্তনিয়াদের কোথায় দেখলেন ? সহজযান ও বৈষ্ণবধর্ম্ম কেমন করে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করল !

কবীরের বোলী

কবীরের বোলী পূর্ব্বের। কিন্তু এ পূর্ব্ব শব্দের অর্থ কি ? কবীরের একটি পদে কবীর বলছেন :—

"বোলী হমারী পূর্ব কী, হমেঁ লখৈ নহীঁ কোয়।
হমকো তো সোই লখৈ, ধুর পূরব কা হোয় ॥" বীজক মূল : রাঘব দাস।

এর বাচ্যার্থ হল :—'বুলী আমার পূর্ব্বের ; কেউ আমায় দেখেনি বা বোঝে না। আমাকে সেই দেখে, যে পূর্ব্বদেশের যাত্রী।' এর একটি পাঠান্তর অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের 'কবীররচনাবলী'তে (পৃ. ২৪এ) পাওয়া যায়। সেখানে 'ধুর পূরব কা' না বলে 'ঘর পূরব কা হোই' বলে কবীর বলছেন দেখা যায়। অর্থাৎ 'পূর্ব্ব দেশে যার ঘর, সেই আমাকে বুঝবে বা দেখবে' বলা হয়েছে।

এই পূর্ব্ব শব্দের অর্থ কি ? বিহারকে পূরব বলা হত মধ্যযুগে। এ ক্ষেত্রে বাংলা বিহারের কোনও স্থানকে বলা হয়েছে কি ? যতদূর আমার মনে হয় কবীরের জন্ম বাংলা-বিহারের কোনও অঞ্চলে। তাই বাংলা বিহারের সাধনরীতি, সাহিত্য, ভাষা, উচ্চারণ এই ভাবে কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে কবীরের সাহিত্য ভারতের সাহিত্য, কবীরের পথ 'ভারত পন্থ'।

গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা

(প্রতিবাদ)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ মহাশয় গত বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫৯ ভাগ, ৩৮ পৃঃ) "গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—সেখ ফয়জুল্লা নহেন" প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন লেখক ; তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি সত্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই জন্য আমাকে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

পরলোকগত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের পর শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 'গোর্খবিজয়' নামে যে একটি উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬ সাল), তাহা প্রবন্ধলেখক দেখিয়াছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। অধিকন্তু তিনি ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণও দেখেন নাই। তার পর মধ্যযুগের মুসলমান-রচিত সাহিত্যের সহিত প্রবন্ধলেখকের পরিচয় থাকিলে তিনি কখনই লিখিতে পারিতেন না—"অবশ্য, ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা—এই মতের স্বপক্ষে বলা যায় যে, এখানে মুসলমান কবি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিধিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু আজি হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার অন্ধতামস যুগে—যখন স্বধর্ম্মে দৃঢ় অন্ধ বিশ্বাস ও পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের চরমতম ও পরমতম বৈশিষ্ট্য, তখনকার সেই অসভ্য বর্ব্বরোচিত ধর্ম্মান্ধতার দিনে মুসলমান কবি ফয়জুল্লার পক্ষে 'কাফের' হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধিকে তদীয় কাব্যে প্রচারিত করা সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।"

মধ্যযুগের শতাধিক মুসলমান বৈষ্ণব কবি আছেন। এই যুগের সৈয়দ সুলতান, সাবিরিদ খাঁ, মুহম্মদ খাঁ, সৈয়দ আলাওল, শেখ চাঁদ প্রভৃতির রচনায় যথেষ্ট হিন্দুয়ানি আছে। নাথপন্থা সম্বন্ধে আবদুল শুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' প্রকাশিত হইয়াছে (ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী নং ৯, ১৩৩২ সাল)। তাহাতে আছে (শোধিত বানানে)—

"চৌদ্দ সহস্র ভুবন নিজ নামে হবে পার।
শুকুর মুহম্মদে কহে ব্রহ্মনাম সার॥
এহি ত নামের গুণ সাবধান হৈয়া শুন
পূর্ব্বে জপিল রঘুনাথ।
সেহি নিজ নামের বলে পাষাণ ভাসিল জলে
সমরে রাক্ষস করিল নিপাত॥

শতেক প্রহরের সেতু বান্ধিল রামের হেতু,
ভল্লুক বানর হৈল পার।
নিজ নাম জপন করে তক্ষকে রাক্ষস মারে
সুবর্ণপুরী লঙ্কা কৈল ছারখার ॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম লৈয়া গেল নিজধাম
লোকে গায় অপযশ কথা।
লোকের গঞ্জনা কথা জতুঘরে তরিল সীতা
নিজ নামের বলে পাইল রক্ষতা ॥
পাণ্ডব রাজার নারী পিতার ঘরে অকুমারী
গুরুমুখে নাম কৈল শিক্ষা।
কুন্তী রাজার কন্যা, গুরুমুখে নাম ধন্যা,
নিজ নাম জপিয়া কৈল দীক্ষা ॥
নিজ নাম জপিল মনে সূর্য্য দেখিল তানে
নিকুঞ্জেত ভোগ কৈল রতি।
অকুমারী গর্ভ ধরে কর্ণ হৈল কর্ণাধারে
নিজ নামে রক্ষা পাইল সতী ॥
নিজ নামে করি পূজা শিব পাইল দশভুজা
পুত্র যার দেব লম্বোদর।
শনির দৃষ্টে গেল মুণ্ড কুটি গজমাথা শুণ্ড
নিজ নামে স্থাপিল কলেবর ॥
দশভুজা মহামায়া শিবমুখে নাম পায়া
কালীরূপে বধিল অসুর।
মথুরাত জন্মিল হরি নিজ নাম জপ করি
বধ কৈল দুষ্ট কংসাসুর ॥
ইন্দ্র স্বর্গ ভুবনে গৌতম মুনির স্থানে
নিজ নামে স্বর্গ-অধিকারী।
নিজ নাম সাধিল মনে সাধন ভজন গুণে
সৃষ্টি কৈল অমরানগরী ॥
ব্যাস আদি সুধীর মুনি জপে নিজ নাম ধুনি
নামের প্রভাবে হৈল স্বর্গবাসী।
নদিয়া নাম নগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে
নিজ নামে চৈতন্য সন্ন্যাসী ॥" (৯ পৃ.)

এই সকল উক্তি কি একজন স্বধর্ম্মান্ধ মুসলমান কবির লেখা বলিয়া মনে হয় ?

গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয় যে সেখ ফয়জুল্লার লেখা, তাহার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি ২৪ পরগণার বারাসতের নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ীতে কতকগুলি পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতা পান। তাহার একটির মধ্যে ছিল—

"গোর্খবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী,
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কথন,
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।"

(মাসিক মোহম্মদী ১৩৪২, পৃ. ৫৩৬—৩৭, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৯২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শেখ ফয়জুল্লা প্রথমে কাহারও নিকট শুনিয়া গোর্খবিজয় বা গোরক্ষবিজয় রচনা করেন। তাহার পর তিনি গাজীবিজয় লেখেন। এই গাজীবিজয়ে রঙ্গপুরের খোঁটাদুয়ারের পীর ইস্মাইল গাজীর বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইস্মাইল গাজী ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শহীদ হন। তাঁহার তৃতীয় রচনা সত্যপীর সম্বন্ধে। ইহার রচনাকাল "মুনিরসবেদশশী" শকাব্দ। রসকে ছয় ধরিলে আমরা ১৪৬৭ শকাব্দ বা ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পাই, আর রসকে নয় ধরিলে আমরা পাই ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুহৃদ্বর ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন "মুনিরসবেদশশী" পাঠকে কেন যে "নিশ্চয়ই ভ্রান্ত" স্থির করিয়া "মুনিবেদরসশশী" শুদ্ধ পাঠ মনে করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না (ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য)। উদ্ধৃত অংশে শেখ ফয়জুল্লার রচিত যে সত্যপীরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ইহার একটি ভণিতা এইরূপ—

"গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন।"

(ডক্টর সেনের ঐ পুস্তক, পৃঃ ১০৪২-১০৪৪)।

চেষ্টা করিলে হয় ত তাঁহার গাজীবিজয় পাওয়া যাইতে পারে।

এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয়ের বিভিন্ন পুঁথিতে যে ভীমদাস, ভীমসেন রায় বা শ্যামদাস সেন ভণিতা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত মাত্র। গোর্খ-বিজয়ের দুই স্থানে (৮৭, ৮৮ পৃঃ) জ্ঞাননাথেরও ভণিতা আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লা সম্বন্ধে ডক্টর সেন বলেন যে, উভয়ের "রচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীর যে, দুই জনকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দুরূহ।" (ঐ পুস্তক)। গোরক্ষবিজয়ে যে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র দাসের ভণিতা আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ডক্টর সেন কবীন্দ্র দাসের পৃথক্ অস্তিত্বে সন্দিহান। তিনি বলেন, "কবীন্দ্র দাস ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের

নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয় (ঐ পুস্তক, ৭৫২ পৃঃ)। আমরা ফয়জুল্লার উদ্ধৃত অংশে দেখিয়াছি—

গোর্খবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সত কথা শুনিলাম যত।"

আমি মনে করি, ফয়জুল্লা যে নাথগুরুর নিকট হইতে গোরক্ষকথা শুনিয়া গোরক্ষবিজয় (বা গোর্খবিজয়) রচনা করেন, তাঁহার নাম বা উপাধি ছিল কবীন্দ্র। ফয়জুল্লা তাঁহার শিষ্য বলিয়া কবীন্দ্র দাস ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। স্বর্গীয় আবদুল করিম সাহেবের সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের মাত্র একখানি পুঁথিতে চারি স্থানে কবীন্দ্র ও কবীন্দ্র দাসের নাম পাওয়া যায়।

কহেন কবীন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥ (পৃঃ ১০)

ইহার পাঠান্তরে তাঁহার ২য় ও ৩য় পুঁথিতে "কবীন্দ্র" স্থানে "ভীমদাস" এবং "বলিল" স্থানে "রচিল" আছে। তাঁহার ৭ম পুথিতে ভণিতা "ফজুল্লা" এবং "রচিল" পাঠ আছে। "রচিল" পাঠই শুদ্ধ। ইহার কর্ত্তা "আম্মি" উহ্য। গোরক্ষবিজয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি পুস্তকে উত্তমপুরুষের এই বিভক্তিহীন রূপ পাওয়া যায়। এখানে "ভীমদাস" প্রক্ষিপ্ত ; শুদ্ধ পাঠ কবীন্দ্র বটে। "আদ্য কথা" আদ্য পুরাণ, যাহা অবলম্বনে গোরক্ষবিজয় (বা গোর্খবিজয়) রচিত হইয়াছে। ফয়জুল্লা এই আদ্য পুরাণ কবীন্দ্রের মুখ হইতে শুনিয়া গোরক্ষবিজয় (বা গোর্খবিজয়) রচনা করেন। এখানে প্রসঙ্গ হিসাবে গোরক্ষবিজয় হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আদ্য পুরাণ কথা এহিরূপে কহে।
বুঝি চাহ পণ্ডিত হএ কি না হএ॥
হইলে রাখএ পণ্ডিত যদি মনে লএ।
এহি তত্ত্ব পুরাণে কহিছে গোর্খের বিজয়॥
কহেন কবীন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥"

(তুং গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৯, ১০ ; গোর্খবিজয়, পৃঃ ৫)

আর একটি ভণিতা হইতেছে—

"কবীন্দ্র-বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া।" (গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৩০)

এই ভণিতায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কবীন্দ্রের বচন শুনিয়া, ফয়জুল্লা ভাবিয়া মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইলেন। এখানে "বুঝাইয়া" অতীত কালে প্রয়োগ। ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার লক্ষণ। "ফজুল্লাএ" কর্ত্তায় এ। আবদুল করিম সাহেবের ২য় ও ৩য় পুঁথিতে ভণিতায় কবীন্দ্রের উল্লেখ নাই। তৃতীয় ভণিতাটি হইতেছে—

"গোর্খের বিজয় কথা কবীন্দ্র রচিল।
সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥" (ঐ, পৃঃ ১৫৩)

এখানে মনে হয়, শুদ্ধ পাঠ "বলিল" স্থানে "রচিল" হইয়াছে। পূর্ব্বে ১ম ভণিতায় যেমন দেখান হইয়াছে যে, শুদ্ধ পাঠ "রচিল" স্থানে "বলিল" হইয়াছে। "দিল" ক্রিয়ার কর্ত্তা আমি অর্থাৎ আমি ফয়জুল্লা। চতুর্থ ভণিতাটি হইতেছে কবীন্দ্র দাসের নামে—

"কহেন কবীন্দ্রদাসে শুন নরগণ।
সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী শুন বিবরণ॥" (ঐ, পৃঃ ১৫০)।

এখানে কবীন্দ্র দাস স্বয়ং ফয়জুল্লা।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি গোরক্ষবিজয়ের বা গোর্খবিজয়ের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র একটিতে এই কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র দাসের ভণিতা আছে। সুতরাং ভীমদাস, শ্যামদাস ইত্যাদির ন্যায় ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও কেহ বলিতে পারেন। ভণিতা বিচার করিলে আমরা দেখিব যে, পুঁথিতে ফয়জুল্লার ভণিতার বাহুল্য। মরহুম আবদুল করিম সাহেব আটখানি পুঁথির ভণিতাগুলি দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম পুঁথির (৫৪৪ নং) পাঠ এইরূপ—

কহে সেক ফজুল্লাএ শুন গুরু মীনরাএ
ভাবহ আপন চিত্ত সার।
কাম শাস্ত্র বুঝী পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোরক্ষের বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর॥ (পৃঃ ২৯)

কহে সেক ফজোল্লাএ মনেতে ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুজিআ॥ (পৃঃ ৩২)
কহে সেখ ফজোল্লাএ বিচারিয়া মন।
স্ত্রির বিষম মায়া অমূল্য রতন॥ (পৃঃ ৫৫ ক)

এই পুঁথিখানির লিপিকাল ১১৮১ মঘী।*

এই নয়খানি পুঁথির অতিরিক্ত মীনচেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং বিশ্বভারতীর পুঁথি আছে। এ স্থলে এই বারখানি পুঁথির ভণিতার নির্ঘণ্ট দিতেছি।

আবদুল করিম সাহেবের নয়খানি পুঁথিতে—

১। কবীন্দ্র, কবীন্দ্র দাস, ফয়জুল্লা
২। ভীমদাস, ফয়জুল্লা
৩। ভীমদাস, ফয়জুল্লা
৪। ভীমদাস, ফয়জুল্লা

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহায়ক (Research Assistant) জনাব আহম্মদ শরীফ এম্-এ এই পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন।

৫। শ্যামদাস, ফয়জুল্লা

৬। ফয়জুল্লা

৭। ফয়জুল্লা

৮। ফয়জুল্লা

৯। ফয়জুল্লা

১০। মীনচেতনে—শ্যামদাস

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে—ভীমদাস, ফয়জুল্লা

১২। বিশ্বভারতীর পুঁথিতে—ভীমসেন রায়।

ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বারখানির মধ্যে মাত্র তিনখানি পুঁথিতে ফয়জুল্লার ভণিতা নাই এবং চারিখানিতে কেবল ফয়জুল্লার ভণিতা আছে। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ফয়জুল্লার নাম কাটিয়া ভীমদাস, ভীমসেন রায়, শ্যামদাস ভণিতা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষবিজয়ের আসল ভণিতাগুলি এই :—

(১) কহেন কবীন্দ্র আগু কথা অনুমানি।
শুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥

(২) কহেন কবীন্দ্রদাসে শুন নরগণ।
সিদ্ধার সঙ্গীতবাণী শুন বিবরণ॥

(৩) কবীন্দ্র বচন শুনি ফৈজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥

(৪) গোর্খের বিজয় কথা কবীন্দ্র বলিল।
সঙ্গীত পাঁচালি করি প্রচারিয়া দিল॥

(৫) কহে শেখ ফৈজুল্লাএ   শুন গুরু মীন রাএ
এবে আপনা চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা   বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খবাক্যে পিণ্ড রক্ষা কর॥

(৬) কহে শেখ ফৈজুল্লাএ বিচারিয়া পাজি।
স্ত্রীর বিষম মায়া বাদিয়ার বাজি॥

ভীমদাস উপরের ১ নং ভণিতায় নিজের নাম ঢুকাইয়া দিয়াছেন। ২ এবং ৪ নং ভণিতা কেবল একখানি পুঁথিতে আছে। ৩ নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ এবং সেন শ্যামদাস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। এই ভণিতায় সকলগুলি নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যথা—

কহে সেক ফওজল্লাএ মনেত্য চিন্তিআ।
মীননাথ সে জে গুরু চরিত্র বুঝিআ।—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
কহে ভীমসেন রাএ মনেতে চিন্তিয়া।
মীননাথ গুরুর যে চরিত্র বুঝিয়া।—(বিশ্বভারতী)

কহে সেন শ্যামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন যে গোর্খনাথে স্থিরতা করিয়া।—(মীনচেতন)

৫নং ভণিতায় কোন প্রক্ষেপ নাই।

৬নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর পুঁথিতে ভীমসেন রায়ের একটি বিশিষ্ট ভণিতা আছে—

কহে ভীমসেন রাএ মনেতে ভাবিয়া।
কহিল অপূর্ব্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া॥ (পৃঃ ৩৭)

পূর্ব্বের ৩টি ভণিতায় প্রক্ষেপের নজিরে আমরা বলিব, এই পাঠেও ভীমসেন রাএ প্রক্ষিপ্ত। আসল পাঠ ছিল—

কহে শেখ ফৈজুল্লাএ মনেতে ভাবিয়া।
কহিল অপূর্ব্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া॥

কিংবা আমরা ইহাতে বলিতে পারি যে, ইহা ষোল আনাই প্রক্ষিপ্ত।

মীনচেতনে শ্যামদাস সেনের ২টি ভণিতা আছে।

১। কহে সেন শ্যামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন যে গোক্ষ'নাথে স্থিরতা করিয়া॥—(পৃ. ২৪)

২। সেন সাম দাসে কহে গোক্ষ মহাশয়।
আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয়॥—(পৃ. ৪৭)

প্রথম ভণিতাটি মূল গোরক্ষবিজয়ের ৩ নং ভণিতার প্রক্ষিপ্ত রূপ। দ্বিতীয় ভণিতাটিতে সম্ভবত 'শেখ ফৈজুল্লাএ' মূল পাঠ ছিল কিংবা এই দুই চরণই প্রক্ষিপ্ত। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"বিভিন্ন গ্রন্থে একই স্থানে ভণিতাপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।...ভণিতাংশ আসিলে একই স্থানে প্রত্যেকের নাম ঢুকাইবার জন্ম কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।"—(গোর্খবিজয়, ভূমিকা)। কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"ইঁহারা সকলেই প্রচলিত গোর্খ-গীতিকার গায়ক ছিলেন"—তাহা শেখ ফয়জুল্লা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সম্ভবতঃ কবীন্দ্র উপাধিধারী কোনও নাথগুরু ছিলেন। শেখ ফয়জুল্লা তাঁহার নিকট হইতে বিষয়বস্তু শুনিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবীন্দ্র ইহার রচয়িতা নহেন। "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে"র কবি আবদুল শুকুর মহম্মদও এইরূপে হিন্দুর পুরাণ শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন।

"শুকুর মহম্মদ ভণে শুনিয়া হিন্দুর পুরাণে
মোছলমানের এই বাণি নয়।
যে কিছু কিতাবে কয় সে কথা অন্যথা নয়
হাদিছে জানহ মোছলমানি॥"—(পৃঃ ২৬)।

ফয়জুল্লার কাব্যখানির নাম কি? একখানি পুঁথিতে আছে—"সমাপ্ত হইল জল মীনের চেতন"। আর একখানিতে আছে—"গোর্খা বিজয়াএ পুস্তক সমাপ্ত।" তৃতীয়

একখানির পুষ্পিকা "ইতি মিননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাপ্ত।" (গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৯৯, ২০০)। ইহাতে বুঝি যে, গ্রন্থখানির পুরা নাম হইতেছে "মীননাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজয় ইহার সংক্ষেপে মীনচেতন এবং গোরক্ষবিজয় (গোর্খবিজয়) নাম প্রচলিত হইয়াছে।

কতগুলি শব্দ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয় একজন মুসলমানের রচনা।—

আমল—পবন আমলে করতারে রাখি বান্ধি। (গোর্খবিজয়, পৃঃ ১১০)
পবন আমল করি তারে কর সন্ধি। (ঐ, পৃঃ ১১৭)।
পবন আমল তুমি যদি সে করিলা। (ঐ, পৃঃ ১১৭)।

সম্পাদক এই দ্বিতীয় উদ্ধৃত চরণে 'আমল' স্থানে "আসন" পাঠ শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃত চরণ হইতে আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারি যে, "আমল" পাঠই শুদ্ধ। তুলনীয়,

পবন য়ামল কর বাউ কর বন্দি। (ঐ, পৃঃ ১৭৮)।

এই আমল শব্দটি আসলে আরবী 'আমল' শব্দ। ইহা বাঙ্গালী মুসলমানগণ অভ্যাস, বিশেষত সূফী মতের 'দোআ,' 'ইসম' প্রভৃতি অভ্যাস সম্বন্ধে ব্যবহার করেন। কোনও হিন্দু লেখক ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। মরহুম আব্দুল করিম সাহেবও বলিয়াছেন, "'আমল' শব্দের প্রয়োগে মুসলমানেরই হস্তচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।"—গোরক্ষবিজয় (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫৮)।

গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতন, উভয় পুস্তকে খাক, আসমান, জমিন এবং নূর শব্দগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। আমি গোর্খবিজয়ের (ক ২) পরিশিষ্ট হইতে পদগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

খাকেত (খাক্তেত) মিশিব খাক রৈব মাত্র সার,
ভস্ম ছালি হৈয়া যাইব দেহা আপনার। (পৃঃ ১৩৭)
পূর্ব্বদিন হইল তার আসমান জমিন,
হাড়মাংস খাইল তার নিঠুর পবন। (পৃঃ ১৪২)
চারিদিন থাকিতে নাসাএ না পায় নূরে,
তিনদিন থাকিতে যে হংসাহংসী চরে। (পৃঃ ১৪৫)

এইগুলি বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে সুপ্রচলিত। কোনও হিন্দু কবি এইগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ বলিয়াছেন যে, মরহুম আবদুল করিম-সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের আরম্ভে আছে—

ওঁ হরি। নমো গণেশায় নমঃ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌপান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গোরক্ষবিজয় হিন্দুর রচিত। কিন্তু ইহা যে, হিন্দু লিপিকরের যোজনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, এই আরম্ভ গোরক্ষবিজয়ে বা গোর্খ-বিজয়ের একখানি পুঁথি ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, গোরক্ষ-বিজয় বা গোর্খবিজয়ের কবি শেখ ফয়জুল্লা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিবিদনাথ রায়

(চ) সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—কদম্বতরুতলে যখন সুন্দর বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন সেই নগরের রম্ভানাম্নী মালিনী রাজকন্যা বিদ্যাকে পুষ্প দিয়া গৃহে ফিরিবার পথে লোকমুখে সুন্দরের কথা শুনিয়া ত্বরিতপদে গিয়া তাহাকে দেখিল এবং

"শুনিল যতেক রূপ দেখিল নয়নে।
একদৃষ্ট হইয়া তার চাহে মুখ পানে ॥
ধন্য জননী ইহার উদরে ধরিল।
ধন্য ধন্য-কুমার যে নয়নে দেখিল ॥"

সুন্দরকে দেখিয়া মালিনীর বাৎসল্য রসের উদয় হইল। সে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া গোপনে আপন গৃহে আশ্রয় দিল।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনীও বিদ্যার গৃহে ফুল যোগাইয়া ফিরিবার পথে লোকমুখে রূপবান্ সুন্দরের কথা শুনিয়া, তাহাকে দেখিতে আসিল। সুতরাং এই সাক্ষাতের সময় নিশ্চয়ই মধ্যাহ্নের পূর্বে। কিন্তু ভারতচন্দ্র স্পষ্ট বলিতেছেন—

"সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন—সুন্দর যে পুষ্পোদ্যানের সন্নিকটে সরোবরতীরে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া মালিনী সুন্দরের গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

"সরোষে রাজার সুত কহেন তখন।
প্রবাসী পুরুষ কাছে নারী কি কারণ ॥
কোন্ প্রয়োজনে প্রমদারে পরিচয়।
যাও গো ভবন ভাব ভঙ্গী ভাল নয় ॥"

মালিনী বলিল, "এই উদ্যান মহারাজা বীরসিংহের কন্যার।" এই বলিয়া সরাসরি তাহার রূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে—

"কপটে কুপিয়া তবে কহে কবিমণি।
কে তোর রাজাধিরাজ কে তার নন্দিনী ॥
উত্তম মধ্যমাধম বিধি যে কর্য্যাছে।
এ কথা আনিলি কেন সন্ন্যাসীর কাছে ॥"

তখন মালিনী সুন্দরের কপট বাক্য বুঝিয়া বিদ্যার পণের কথা বলিল ও তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। এখানে রাধাকান্ত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া প্লটটি কাঁচাইয়া ফেলিয়াছেন।

বলরাম লিখিয়াছেন,—সুন্দর নগর পরিভ্রমণকালে

"নগরে পসারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইৎসায় সভে বেচাকিনি করি॥
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে॥"

তাহার পর মালিনী তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং সুন্দর আশ্রয় খুঁজিতেছেন জানিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় দিতে চাহিল এবং কহিল—

"পতিপুত্রহীনা　　আমি ত কুলীনা
নাহি মোর অন্য জন।
তুমি পুত্র সম　　ইথে নাহি কম
চল মোর নিকেতন॥"

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, দ্বিজ রাধাকান্ত ও বলরাম, কেহই মালিনীর রূপবর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদ কিন্তু তাহার চরিত্রের আভাস দিয়াছেন, এই বিষয়ে এবং তাহার নাম ধার করিয়া তিনি ভারতচন্দ্রের কাছে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের সুন্দরমালিনীসাক্ষাৎ তুলনা করিলে রামপ্রসাদ যে কৃষ্ণরামের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা সহজেই ধরা পড়ে।

ভারতচন্দ্র হীরাকে চোখের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মালিনীর স্বরূপ-বর্ণনা আর কেহই এরূপ করেন নাই —

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকিমালা গলে।
কানে কড়ি ক'ড়ে রাড়ি কত কথা ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটাফোটা তন্ত্র মন্ত্র আছে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

বলরামের মালিনী সুন্দরকে পুত্রসম বলিয়া তাহার গৃহে যাইতে বলিলে সুন্দরই মালিনীকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

"বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর
নামে হৈলে মোর মাসী।
বলেন কুমার তুমি যে আমার
হৈলে বড় হিতাশী ॥"[২]

৩। মালিনীর দৌত্য

(ক) সুন্দরের মালিনীর গৃহে গমন

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী সুন্দরের সহিত সাক্ষাতের পরই তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে যাইতে সুন্দরের অনুরোধে বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়াছে। গোবিন্দদাসের ও বলরামের মালিনী বিদ্যার রূপবর্ণনা মোটেই করে নাই। দ্বিজ রাধাকান্ত সুন্দরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই মালিনী কর্তৃক বিদ্যার সংক্ষেপে রূপবর্ণনা করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কিন্তু মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন অপরাহ্নে বিশ্রামকালে মালিনীকে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিদ্যার রূপবর্ণনা করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের 'প্লট' স্বাভাবিক হইয়াছে। মালিনী কর্তৃক একজন নবাগত বিদেশীর নিকট সরাসরি সেই দেশের রাজকন্যার রূপবর্ণনা করা কিংবা সেই বিদেশীর পক্ষে নব-পরিচিতা বর্ষীয়সী রমণীকে সহসা রাজকন্যার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করা যেমন অশোভন, তেমনই অস্বাভাবিক। আমরা পরে বিভিন্ন কবির "বিদ্যার রূপবর্ণনা" প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—সুন্দর একরাত্রি মালিনীর গৃহে থাকিবার পর নদীতটে শিবপূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, মালিনীর মালঞ্চ শুষ্ক তথায় ফুল নাই। পুষ্প বিনাই শিবপূজার উদ্যোগ করিতেই শুষ্ক মালঞ্চ মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মালিনী বিস্মিত হইয়া সুন্দরকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল ও স্তুতি করিল। ভারতচন্দ্র এইরূপ অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার সুন্দর মালিনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

(২) পূর্বে উদ্ধৃত ভারতচন্দ্রের সুন্দরের মালিনীর প্রতি উক্তির সহিত এই উক্তির অদ্ভুত মিল হইতে ভারতচন্দ্রের প্রভাবেরই স্পষ্ট সূচনা করে না কি? এইরূপ উক্তি বলরামের সুন্দর আর একবার করিয়াছেন নিজ-পরিচয় দানকালে—

"তুমি মোর মাতা খুড়ী তুমি মোর মাসী।
তুমি মোর বন্ধুজন তুমি সে হিতাশী।"

(কালিকামঙ্গল, ২য় সং, পৃঃ ১৭)

"চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি ঘুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি ॥
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥"

বঙ্গদেশে মালিনীর, বিশেষতঃ যে মালিনী রাজবাটীতে ফুল সরবরাহ করে, তাহার মালঞ্চে ফুল থাকিবে না ও তাহা শুষ্ক হইয়া থাকিবে, ইহা যেন কল্পনাই করা যায় না। কালীভক্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া গোবিন্দদাসপ্রমুখ কবিগণ স্বভাবকে বিকৃত ও কাব্যের পরিকল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সেই দিনই আহারাদির পর মালিনীকে কার্যে সাহায্য করিবার জন্য সুন্দর ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিলে মালিনী সাজিতে পুষ্প সাজাইয়া ও মালা লইয়া বাড়ী বাড়ী পুষ্প যোগান দিতে দিতে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। বিদ্যার সখীগণ পুষ্প দেখিয়া আশ্চর্য হইল ও মালাখানি লইয়া, তাহা কে গাঁথিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে মালিনী বলিল, সে নিজেই গাঁথে—যখন যেরূপ তাহার মনে লয়—

"পতি পুত্র নাহি মোর ভাই সহোদর।
কেবা আছে কেবা গাঁথে কি দিব উত্তর ॥"

কৃষ্ণরাম মূলতঃ গোবিন্দদাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার সুন্দর স্পষ্টই বলিয়াছে—

"শুন মাসি অদ্য বসি আমি গাঁথি মালা।
তুষ্ট হৈয়া নেবে মালা নৃপতির বালা ॥"

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, সুন্দর মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া পূজায় বসিলে—

তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসি নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট বাজার কে করে ॥

(৩) বলরামের মালিনীর গৃহের বর্ণনা অনেকটা এইরূপ—
"প্রাচীর চৌদিকে ঘর মধ্যভাগে
শোভয়ে ফুলের গাছে।
বড় রম্য স্থল নিকটেতে জল
পড়সী নাহিক কাছে ॥"

সুতরাং দ্বিতীয় দিনে সুন্দর মালা গাঁথিয়া দেন নাই, বিদ্যারও কোন সন্দেহ হয় নাই। রামপ্রসাদের সুন্দর কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া একেবারে সাংকেতিক লিখন সহ পরিচয়পত্র দিয়া মালা গাঁথিয়াছেন এবং মালিনী হাট হইতে ফিরিয়া সেই মালা সহ সাজি লইয়া রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—শুষ্ক মালঞ্চ মঞ্জরিত হওয়ায় হীরা সানন্দে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া—

"দ্বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাণ্টি কত বার খোলে।
ভুজপাশ উদাস, গা ভাঙ্গে হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষতঃ নীচজাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী॥
প্রমথ পতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এতো বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে।
দেখ দেখি নৃপতিনন্দিনী কিবা বলে॥"[৪]

মধুসূদন চক্রবর্তী রামপ্রসাদের ন্যায় দ্বিতীয় দিনেই (?) মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া সুন্দরকে দিয়া মালা গাঁথাইয়াছেন। কিন্তু সুন্দর সে দিন কোন সাংকেতিক লিপি দেন নাই। মালা দেখিয়া রাজকন্যার সন্দেহ হইয়াছে এবং মালিনী তাহার ভগিনীপুত্র মালা গাঁথিয়াছে বলিলে রাজকন্যা ধমক দিয়া তাহার নাম জানিয়া লইয়াছেন এবং—

"বিদ্যা বলে হইয়া হরষিত।
তোর বোলে না যাব প্রতীত॥
সে জন যে কহে তোর তরে।
তাহা আসি কহিবে আমারে।

(৪) রামপ্রসাদ মালিনীকে একেবারে নির্লজ্জা ও নষ্টচরিত্রা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এরূপ আর কেহ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের হীরাও সুন্দরের নিকট কোনরূপ কামেঙ্গিত করে নাই।

(থ) মালিনীর হাটে গমন ও সুন্দরের সাংকেতিক পত্র সহ মাল্য গ্রন্থন

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, প্রথম দিন রাজকন্যা মালা দেখিয়া সন্দেহ করার পর গৃহে ফিরিয়া মালিনী সুন্দরের নিকটে আসিয়া আপনা হইতেই সুন্দরের নিকট বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া বলিল—"তুমি ভিন্ন বিদ্যার উপযুক্ত বর আর কেহ নাই। সুন্দর বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বলিলেন, বিদ্বান্ হইলেই যে সে সুপাত্র হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? বিদ্বান্‌দিগের মধ্যেও অনেক অসজ্জন আছে। সুতরাং বিদ্যা নিতান্ত অবোধের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহার পরদিন সুন্দর বিনা সুতায় মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গুরীয় পড়িয়া রাখিয়া দিলেন। তাহা হইতে সূর্যের ন্যায় কিরণ বিকীর্ণ হয়। গোবিন্দদাস মালিনীর হাটে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন নাই।

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন চক্রবর্তী মালিনীর হাটে যাইবার কথা লিখিয়াছেন। মধুসূদন লিখিয়াছেন—সুন্দর মালিনীকে একটি টাকা দিয়া হাটে পাঠাইতে চাহিলে সে বলিল, তাহাকে রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইতে হয় ; সে কিরূপে হাটে যাইবে ? তখন সুন্দর মালা গাঁথিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে প্রথমে মালিনী বিশ্বাস করতে পারিল না যে, সুন্দর মালা গাঁথিতে পারিবে। কিন্তু সুন্দরের দৃঢ় মতি দেখিয়া—

> "এত বলি হরষিত হৃদয়ে মালিনী।
> হাতে তঙ্কা করি হাটে চলিলা মালিনী ॥
> ভাঙ্গায় তঙ্কার মুল্য করিয়া বিচার।
> ধূপ দীপ আদি যত কিনে উপহার।
> কিনিঞা পূজার দ্রব্য কিনিল বেসাতি।
> ভ্রমণ করিল হাটে হয়ে হৃষ্টমতি ॥"

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের সুন্দর এই দিন কোন সাংকেতিক পত্র দেন নাই। পরদিন পূর্ববৎ মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া মাল্যের মধ্যে সাংকেতিক পত্র লিখিয়া দিলেন। মাল্য গ্রন্থনের বিশেষ বর্ণনা মধুসূদন করেন নাই। কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন বর্ণনা করিয়া কেতকী পুষ্পে সুন্দর কর্তৃক নিজ সমাচার লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে মাল্য গ্রন্থন ও পরিচয় লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পদ্মদলে অক্ষর দ্বারা সুন্দর কর্তৃক নিজ পরিচয় লিখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর মালায় কারিগরী না করিয়া কেয়াপাতার কৌটার মধ্যে পুষ্পময় রতি কাম গড়িয়া, কেয়াপাতায় চিত্রকাব্যে শ্লোক[৫] লিখিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ ভাবে কৌটা নির্মাণ হইল যে, কৌটা খুলিলে মদনের ফুলবাণ বিদ্যার বুকে গিয়া লাগে। মধুসূদনও ভারতচন্দ্রের ন্যায় সাংকেতিক পত্রে এই শ্লোকই লিখিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ এই শ্লোকটি

(৫) "বসুনা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেপ্যহম্ ॥

বিদ্যার সহিত বিচারপ্রসঙ্গে বিদ্যা কর্ত্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া সুন্দরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

বলরাম মধুসূদনের ন্যায় মালিনীকে একটি টাকা দিয়া বাজার হইতে ভক্ষ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিতে বলিলে, সে ঐ একই অজুহাত দেখাইয়া বলিল, রাজকন্যাকে ফুল জোগাইয়া তাহার পর সে হাটে যাইতে পারে। তখন সুন্দর বলিলেন যে, তিনি নিজেই ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়াছেন। তখন মালিনী হাটে গেল। বলরাম বিশদভাবে সুন্দরের পুষ্পচয়ন ও মাল্য গ্রন্থন বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সুন্দর এবং ফুলের সাঁপুড়া তৈয়ারি করিয়া সাফল্যের সঙ্গে তালপাতে দীর্ঘ লিখন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র হীরার হাটে গমন ও দোকানীদের তাহাকে দেখিয়া আতঙ্ক অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা আর কোন বিদ্যাসুন্দরে নাই। ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের চণ্ডী হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের দুর্বলার হাটের হিসাব পরবর্তী কবিগণের মালিনীর বেসাতির হিসাবের আদর্শ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সুন্দর মালিনীকে পূজার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাঠান নাই, ভক্ষ্য দ্রব্য কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুন্দর তাহাকে বাজারের জন্য দশ টাকা ও পারিশ্রমিক স্বরূপ দুই টাকা, মোট বারো টাকা দিয়াছিলেন, এ বিষয়েও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের নিকট ঋণী।

মালিনীর বেসাতির হিসাবে কৃষ্ণরামের যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে এবং ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। আমরা নিম্নে উভয় কবির মালিনীর বেসাতির হিসাব দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি—

কৃষ্ণরাম

হেন কালে মাল্যানী আইল নিজ পুরী।
বোঝা তুলাইয়া কহে বচন চাতুরী॥
পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা॥
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত (?) বাট্টা কমি।
বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।
থোকে ছয় তঙ্কার বণিক দিব্য জাত॥
কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড়্যা।
তিন টাকা ছিল তোলা আজি তার দেড়্যা॥
অগৌর চন্দন চুয়া আছে কি পাইতে।
চক্ষু ঠেকরিয়া গেল চাহিতে চাহিতে॥
জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ হাটে নাঞি।
কিছু কিছু আনিলাম আমি বুঝি তেঞি॥
তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই।
আগুন লাগিল কড়ি কম দর পাই॥
আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়।
চাহিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায়॥
ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক॥
কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি॥
বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কারো।
এ জন্য দ্রব্যের দর বাড়িআছে আরো॥*

(*) ইহার পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ আছে—
"পশিতে নারিলাম গুয়া পবনের বাড়া। যেন তেন ছাঁচের আছয়ে একগুণ।
পোণেকে দুই পোন পান সেহ মহে সাড়া॥ সস্তে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চুণ॥

লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ যতগুলা।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা॥
গণ্ডা দশ বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল॥
মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান।
দশের অর্দ্ধেক তঙ্কা তার জলপান॥
সুন্দর শুনিয়া হাসে বড় কুতুহলে।
চোরের উপরে চুরি কৃষ্ণরাম বলে॥"

ভারতচন্দ্র

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হবে প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ আনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক্॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভুমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

বিষয় বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মৌলিকত্ব দেখান নাই বটে, তবে কাব্যে অনুপ্রাসযমকের দ্বারা শব্দ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখাইয়াছেন।

(গ) বিদ্যার রূপবর্ণনা

মালিনী বাজার করিয়া আনিলে সুন্দর রন্ধন করিয়া আহারাদি করিলেন। ভারতচন্দ্র তাহার পরেই মালিনীর সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। বলরাম প্রথম দিনেই এই পরিচয়াদি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিদ্যার রূপবর্ণনা করেন নাই। আমরা এইবার অন্যান্য কবির রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া তাহার তুলনা-মূলক সমালোচনা করির।

কৃষ্ণরাম

"রামা রমা সমা শ্যামা সেবার কারণে।
জিনল জাবকবিম্বা দশন-বসনে ॥
উচ্চ হয় কুচ দুটি বিবাদ করিয়া।
দাড়িম্ব বিদরে যেন শোভা না ধরিয়া ॥
দিঘল লোচন জোর কি বলিব তায়।
হরিণী হারিল আর উপমা কোথায় ॥
নহে নিরমল চাঁদ বদনের তুল।
কি আর গরব করে কমলের ফুল ॥
কষিল কষিল সোণা কলেবর মাঝে।
হারিয়া সুবর্ণ নাম হারাইল লাজে ॥
বিশেষ সংসারে তার না হয় তুলনা।
ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা ॥
বাহু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিস।
গমনে যেমন গজ মরালের ইষ ॥
সভায় মুকতি আশা নাশায় শিশির।
লীলায় লইল সুধা হরিয়া শশীর ॥
জিনিয়া রম্ভার স্তম্ভ উরুযুগ সাজে।
অধোমুখ করিবর করিলেক লাজে ॥
খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ব্বসহা।
নিতম্বের ভরে এবে ঘুচাইল তাহা ॥
পামর করিল কেশ চামরের চয়ে।
কৃপাবন্ত জলদ বিষাদবন্ত হয়ে ॥
জিনি মৃগরাজ মাজা অতিশয় খিনি।
কিসের ঈশের আর ডম্বুরু বাখানি ॥
মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে।
তাহার কটাক্ষবাণ বিন্ধে এক টুকে ॥

রামপ্রসাদ

"চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গৃধিনী ॥
ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে ॥
অমিয়া জড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥
পুষ্পধনু ধনু অণু কি ভুরু ভঙ্গিমা।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥
যৌবন জলধি মধ্যে মন্দ মত্ত গজ।
উরে দুষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভস্থান ॥
কিম্বা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন ॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য ॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম পারাবার পার সার অবলম্ব ॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থিরা হয়।
তবে বুঝি তনু শোভা হয় কি বা নয় ॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায় ॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কত কোটি খর শর সে নয়ন কোণে ॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর ॥

ভারতচন্দ্র

"বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার মাথে কতগুলা ॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ॥

কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম ॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার ॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥
কুচ হইতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে ॥
কত সরু ডমরু কেশরিমধ্যখান।
হরগৌরী করপদে আছে পরিমাণ ॥
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু ॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥
জিনিয়া হরিদ্রাচাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত ॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥"

অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবিদিগের মধ্যে কেবল দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যার রূপবর্ণনা পাই। যথা—(১) মালিনীর সহিত সুন্দরের সাক্ষাৎকালে মালিনী কর্ত্তৃক রূপবর্ণনা, (২) অশোকবনে মদনপূজার্থিনী বিদ্যার বর্ণনা ও (৩) বিদ্যা ও সুন্দরের রহস্যালাপ প্রসঙ্গে। কিন্তু পূর্বোক্ত কবিত্রয়ের কাহারও সহিত সে বর্ণনার তুলনা করা যায় না।

কৃষ্ণরাম এই রূপবর্ণনায় অনুপ্রাস অতিশয়োক্তি ও ব্যতিরেক অলঙ্কার যথেষ্ট ব্যবহার করিলেও অলঙ্কারভারে তাঁহার ভাষা ভারাক্রান্ত হয় নাই। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে একটা সহজ ভাব রহিয়াছে। রামপ্রসাদের বর্ণনায় সেই সহজ ভাব নাই এবং ভাষা অলঙ্কারপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা শব্দলালিত্যে ও সুবিন্যস্ত অলঙ্কারসংযোগে অপরূপ। এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে তাঁহার বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণরাম নারীর রূপ-বর্ণনার সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ মস্তক হইতে পদতল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণনা, ঠিক অনুসরণ করেন নাই; কিন্তু অপর দুই জন তাহা যথাযথ করিয়াছেন।

(ঘ) মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন

মালিনী সুন্দরের গাঁথা মালা ও পত্রাদি লইয়া বিদ্যার ভবনে গেলে, বিলম্ব দেখিয়া রাজকন্যা মালিনীকে তিরস্কার করিলেন। গোবিন্দদাসের সুন্দর কেবল বিনি সুতায় মালা গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, কোন পত্রাদি দেন নাই। কিন্তু নিজ অঙ্গুরী তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মালিনীকে বিদ্যার নিকট তিরস্কৃত হইতে হয় নাই। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

"বলিতে বলিতে বাণী রম্ভা যে মাল্যানী
হরষিত করিলা গমন।
পুষ্পসাজি লৈয়া করে হরষিত অন্তরে
গেলা রাজকন্যার সদন ॥
নেতের দিব্য বসন করিয়া যে পিন্ধন
করেতে লইয়া গুয়াপান।
গলিত কুচ যুগ সদায় হাস্য মুখ
হরষিতে করিলা গমন ॥"

তাহার পর মালিনী রাজবাটীতে সকলকে পুষ্প দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যার নিকটে গেল। বিদ্যা শিবপূজা করিতেছিল। মালিনী গিয়া সখী চিত্ররেখার হাতে মাল্য দিলে

"জল ক্ষণ দিয়া মালা লইল করে।
সূর্য্যের কিরণ দেখে মালার ভিতরে ॥
হরগৌরী পাদপদ্মে দিল পুষ্পহার।
নৈবেদ্য রচনা দিয়া কৈল নমস্কার ॥
দণ্ডবৎ করি কন্যা রহিল ঐ মনে।
লজ্জায় উঠিয়া বৈসে চাহে সখি পানে ॥"

এইখানে মনে হয়, বিদ্যা সম্ভবতঃ দৈবপ্রভাবে সুন্দর যে মালা গাঁথিয়াছেন, তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার পরেই মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে মালা গাঁথিয়াছে? মালিনী সরাসরি উত্তর দিল যে, সুন্দর নামে তাহার 'বুহিনীনন্দন' সেই মালা গাঁথিয়াছে। কিন্তু রাজকন্যা সে কথা বিশ্বাস না করিয়া চাপাচাপি করিতেই মালিনী বলিল—

"মাল্যানী বলেন কন্যা মোর কিবা ডর।
সার্থক পূজিলা তুমি ভবানী শঙ্কর ॥
কতকাল ছিল কন্যা তোমার আরাধনা।
যে কারণে পাইলা বর মনের বাসনা ॥"

ইহার পরেই মালিনীর সহিত বিদ্যা সুন্দরকে দেখিবার পরামর্শ করিয়াছেন।

কৃষ্ণরামের মালিনী বিলম্বে ফুল লইয়া গেলে—

সমুখে বিমলা দেখি বিমল কমলমুখী
বলে বিদ্যা ঘুরায়া লোচন।
সুখে থাক নিজালয় আমারে না করে ভয়
ফুল আন যখন তখন ॥
প্রায় কর অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
কবে আর পূজিব ভবানী।
যেমত তোমার কাজ অভাগ্য চক্ষের লাজ
নহে পারি শিখাইতে এখনি ॥"

মালিনী ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইলে বিদ্যা বিনা সুতে গাঁথা মালা দেখিয়া ও লিখন পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, পূজার ধ্যান ঘুরিয়া গেল। মালিনী তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত-চিত্তে গৃহে গমন করিল।

বলরাম লিখিয়াছেন, মালিনীর বিলম্বে বিদ্যা উদ্বিগ্ন হইয়া—

গঙ্গাজলে করি স্নানে   আছয়ে পূজার স্থানে
মালিনী আসিব কতক্ষণে।
করিয়া পূজার সাজে   আছয়ে পুষ্পের ব্যাজে
ঘন আদেশয়ে সখীগণে॥
সখীগণ বলে বাণী   অই আইল মালিনী
বলে বিদ্যা নৃপতিনন্দিনী।
হইল উছুর বেলা   মোর কাযে কর হেলা
কবে আমি পূজিব রঙ্কিনী॥

মালিনী পুষ্প অন্বেষণে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ওজর দেখাইল, বিদ্যা সাঁপুড়া দেখিয়া খুশী হইল ও কে সেই সাঁপুড়া চিত্রিত করিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মালিনীর সম্মুখেই তাহা খুলিয়া ফেলিল। সাঁপুড়া মধ্যে পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করিয়া মালিনীকে সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন। মালিনী বিলম্বে ফুল লইয়া গেলে

দাঁড়াইল আগে   সতী কহে রাগে
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান   করি সমাধান
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল   এবে ঠাকুরাল
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে   পথে যাও হেঁটে
ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই   নিজে ভাল নই
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার   জানি প্রতিকার
যেমন তোমার কাজ॥

হীরা ভূমিতে সাজি রাখিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সজলনেত্রে গৃহে চলিয়া গেল। তাহার পর মালা দেখিয়া বিদ্যা উৎকণ্ঠীতা হইয়া পড়িলেন।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা হীরার বিলম্ব দেখিয়া ঘূর্ণিতলোচনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন—

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কাল শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥"

মালিনী বিনয় করিয়া ক্ষমা চাহিলে বিদ্যার রোষ চলিয়া গেল, রসিকতা করিয়া—

বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥

এইবার হীরার অভিমানের পালা—

হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

তাহার পর কৌটা খুলিয়া দেখিতে বলিলে, বিদ্যা যেই কৌটা খুলিলেন, অমনি হাত হইতে পুষ্পময় মদনের ফুলশর তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। শ্লোক পড়িয়া বিদ্যা আরও বিকল হইলেন।

মধুসূদনের সুন্দর প্রথম দিন মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া যে মালা গাঁথিয়া দিয়াছিলেন বিদ্যা সেই মালা দেখিয়া মালিনীকে, কে মালা গাঁথিয়াছে জানিতে চাহিলে —

কহে তবে মালিনী সভয়।
মোর এক ভগিনীতনয়॥
আইল আমায় দেখিবারে।
সে ফুল গাঁথিয়া দিল মোরে॥
শিশু নাহি জানয়ে গাঁথনি।
অপরাধ খেম ঠাকুরাণি॥

বিদ্যা তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া সুন্দরের পরিচয় জানিয়া আসিতে বলিলে, দ্বিতীয় দিন মালিনী সুন্দরের সাংকেতিক পত্র সহ মাল্য লইয়া বিদ্যাকে দিল। এই পত্রে সুন্দর আপনাকে রত্নাবতী পুরীর অধীশ্বর গুণসিন্ধুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহা হইতে জানা যায় যে, মধুসূদনের বিদ্যার পিত্রালয় কাঞ্চী। মধুসূদন গোবিন্দদাসের ন্যায় মাল্য-মধ্যে সুন্দরকে দিয়া অঙ্গুরী পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সুন্দর মালিনীর অগোচরে ফুলের মধ্যে পত্র রাখিয়াছেন। এই পত্র পড়িয়া বিদ্যা কামশরে জরজর হইলেন। দ্বিজ রাধাকান্তের সুন্দর পত্রাদি না পাঠাইয়া দেবীদত্ত মায়াকজ্জলে অদৃশ্য হইয়া বিদ্যাকে দর্শন করিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্র হীরা ও বিদ্যার মধ্যে যে কথোপকথন রচনা করিয়াছেন তাহাতে কাব্য সরস হইয়া উঠিয়াছে, এই অংশ এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে তাহার দু-একটি অংশ আজও প্রবাদে পরিণত হইয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুর

শ্রীমাণিকলাল সিংহ এম. এ.

বাংলার সকল গ্রামে, সকল গৃহেই ষষ্ঠীপূজার রীতি আছে। কিন্তু সিনি ঠাকুরের ছড়াছড়ি বিশেষভাবে বাঁকুড়া জেলায়—খাতড়া, ওলদা, পাঁচাল, ছাতনা অঞ্চলে খুব বেশী, অন্যত্র মাঝামাঝি। বাঁকুড়া বীরভূমের প্রান্তসীমায় যে সব আদিবাসী কাঁসাই-দ্বারকেশ্বরের প্রবাহ ধরে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চল ছেড়ে নেমে এল, তারাই এই দুটি ঠাকুরের প্রবর্ত্তন করেছে। তাই কাঁসাই-সভ্যতার এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে এদের পূজা। ঠাকুর দুটি fertility বা উর্ব্বরতার প্রতীক। আদিবাসীরা fertility চাইত দুটো জিনিষ থেকে—মাটি ও মেয়ে।

জমির উর্ব্বরতার জন্ম চাইত জল আর বংশবৃদ্ধির জন্য চাইত ছেলেমেয়ে। জগতের অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও এই জাতীয় পূজার প্রচলন রয়েছে। মেক্সিকোর Zunitribes-দের মধ্যে এর রীতি আছে। ওদের মধ্যে—"Rain, however, is only one aspect of fertility for which prayers are constantly made in Zuni. Increase in the gardens and increase in the tribe are thought of together. They desire to be blessed with happy women." (Patterns of Culture)

প্রজননের দেবতা ষষ্ঠীপূজা আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল চারটি—

(১) জামাই ষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাস।

(২) মন্থন বা মাথান ষষ্ঠী—ভাদ্র মাস।

(৩) জিতা ষষ্ঠী—ভাদ্র বা আশ্বিন।

(৪) নলডাকা ষষ্ঠী—৩০শে আশ্বিন।

জামাই ষষ্ঠী ও মন্থন ষষ্ঠী প্রজনন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। জিতা ষষ্ঠী বংশ-সংরক্ষণের জন্য পূজা, আর নলডাকা ষষ্ঠী বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় শস্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ষষ্ঠীপূজায় শিল-নোড়া পূজার রীতি বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। হলুদে ডুবানো টুকরো কাপড় বা কানি দিয়ে শিলকে ঢেকে দেওয়া হয়। পূজায় শামুক, বাঁশপাতা, কলাই ইত্যাদি দেওয়ার রীতি আছে। এর মধ্যে আদি অষ্ট্রিকজাতীয় পূর্ব্বপুরুষের প্রভাব যে কতখানি তা সহজেই বোঝা যায়।

ষষ্ঠীপূজার মতই অনুর্ব্বর রাঢ় অঞ্চলে বৃষ্টি এবং শস্যবৃদ্ধির জন্য সিনি ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সিনি ঠাকুর রয়েছেন, যেমন নাগাসিনি, ভেড়ুয়াসিনি, পরশাসিনি, ভাঁড়াসিনি, করমাসিনি, রাজবাঁধসিনি, ঝেপড়াইসিনি, কুর্দ্দাসিনি, কটভাসিনি

ইত্যাদি। সিনি ঠাকুরগুলি এক একটি অমসৃণ পাথর। বাগদী, মেটে, মাঝি, লোহার, খয়রা ইত্যাদি অনুন্নত জাতির লোকেরাই বিশেষ ভাবে এই সিনি দেবতার পূজা করে। গ্রামে বা অঞ্চলে বৃষ্টি না হইলেই সিনি ঠাকুরের থানে জাতাল বা খেঁচুড়ী ভোগ দেওয়া হয়। সিনি ঠাকুরগুলি ক্ষেত্রদেবতা হিসাবেও পরিগণিত হন। তাই ক্ষেতের ধান উঠার সময় কাটা ধানের প্রথম আটিটি সিনি ঠাকুরের থানে দেওয়া হয়।

সিনি ঠাকুরের নামের সঙ্গে মাথনা শব্দটির যোগও কোন কোন জায়গায় আছে। সিউনি করে খেতে জল দেওয়া হয়, আরম্ভের জায়গাটিকে বলা হয় সিনি মাথনা। এই সিনি মাথনার সঙ্গে যে মাথনা সিনির কোন সংযোগ নাই, তা কে বলতে পারে? সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হয় তো বৃষ্টির জন্য, নয় জল পাওনোর বা জল সেচনের জন্য সিনি দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হচ্ছে। মকরসংক্রান্তি ধরে উৎসব Winter Solstice আদিবাসীদের সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুরের পূজায় প্রস্তরপূজার এই রীতি প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন।

রাধিকার বারমাস্যা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি, এস-সি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার বাংলা পুথির তালিকায় ১২৬৫ সং পুথির নাম 'রাধিকার বারমাস'; প্রদাতার নাম নাই। পুথিখানি খুলিয়া দেখিলাম, ইহা একখানি বড় তুলট কাগজ—আকার ১০ ইঞ্চি × ১৩·৭ ইঞ্চি। পুথিতে তারিখ—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৯ সাল। নিম্নে পুথিখানি মুদ্রিত হইল; ইহার ভাব ও ছন্দ দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা গীত হইতে পারে। এবং ইহাকে 'রাধিকার বারমাস্যা' বলিলে ভাল হয়।

উদ্ধব হইলেন কৃষ্ণসখা। দেহত্যাগের পূর্বে কৃষ্ণ ইঁহাকে দ্বারকায় আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুব্জা হইলেন মথুরার রাজা কংসের সৈরিন্ধ্রী। কিন্তু ইঁহার কৃষ্ণপ্রীতি এতই প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া ইঁহার পদে পদ দিয়া চিবুক ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে সহজ সুন্দরী করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্য ও কৈশোর গোকুল ও বৃন্দাবনে কাটাইয়া, কৃষ্ণ পরে মথুরায় গিয়াছিলেন। আর গোকুল বা বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। ইহাই লইয়া তাঁহার সখা ও গোপীগণের বিস্তর খেদোক্তি আমরা বিবিধ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিয়াছি।

ফুল্লরার বারমাস্যার সহিত এই বারমাস্যার সামঞ্জস্য নাই। কালিদাসের এক ঋতুবর্ণন আছে। তাহার গন্ধও ইহাতে নাই। ইহা কতকটা বিলাপের মত—'উদ্ধব কহে বারে বার—মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর,' এই কথাটিই 'ধুয়া'।

এই বারমাস্যার আরম্ভ হইয়াছে মাঘ মাস হইতে। ইহার কারণ কি? কৃষ্ণ মাঘ মাসে বৃন্দাবন ছাড়িয়াছিলেন কি? তাই কি সেই মাস হইতে ইহা সুরু? একদা এদেশে অগ্রহায়ণে [অগ্র + হায়ণ (বৎসর)] বৎসরের প্রথম সূচিত হইত। খৃষ্টানেরা পৌষের মধ্যভাগ হইতে বৎসর গণনা করেন। সবই শীতকাল।

এই পুথির রচয়িতা কে? পুথির পৃষ্ঠে দুই লাইন ফার্সি লেখা আছে। আচার্য্য যদুনাথ উহা পাঠ করিয়া যাহা বলেন, তাহার অর্থ এই যে, কেহ তাহার মনিবকে পত্রে লিখিতেছিল—"সেরাইকেল্লা জমিদারীর অন্তর্গত সুনি (বা লুনি) টপ্পা(তহশিলে)র গৌরীপুর মহাল গাড়ী (মাটির কেল্লা) সমেত, যাহার মালিক ডবুয়া মোকামের গৌরীপ্রসাদ খোণ্ড, তাহা অনেক দিন হইতে রাজমোহন খোণ্ডের নামে ইজারা…" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর লেখা হয় নাই। সেই কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় এই 'রাধিকার বারমাস্যা'। এই ফার্সিভাষার পত্রলেখক ও বাংলাভাষায় 'বারমাস্যা' লেখক এক ব্যক্তি কি-না বলিতে পারি না।

৶ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণ শরণং ॥

মাঘে মাধব কৈল মথুরা গমন।
শূন্য হইল দশ দিগ্‌ শূন্য বৃন্দাবন ॥
তাহে মরমে গৌরী হৈ গেল দুখ।
গমন সময়ে না দেখিলাম চান্দমুখ ॥

উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ দুখ চিতে উঠে বহল।
গোকুলে গোবিন্দ নাহি কে করিবেক দোল ॥

আগর চন্দন চুয়া দিব কার অঙ্গে।
ফাগুয়া আবির খেলা খেলিব কার সঙ্গে ॥
ফাগু হেরি ফাগু খেলি ফাগু দিলাম তার
পায়।
চতুর্দ্দিকে ব্রজবধূ মধ্যে শ্যামরায় ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী নিভৃত মন্দিরে।
পিয় পিয় রব করি ডাকে উচ্চস্বরে ॥
মোর পিয়া মধুপুরে অধিক সন্তাপ।
দ্বিগুন দগধে হিয়া শুনি কোকিল আলাপ ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
বৈশাখে বিদেশে গেলা পিয়া গুণমন্ত।
অহর্নিশি কান্দে প্রাণ দুঃখে নাহি অন্ত ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
জ্যৈষ্ঠে যমুনা জলে খেলে বনমালি।
শ্যাম অঙ্গে দিথাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
চতুর্দ্দিকে ব্রজবধূ মধ্যে দামোদর।
ফুটিল কমল যেন শোভিত ভ্রমর ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
আষাঢ়ে অধিক দুষ্‌খ বাড়িল অন্তরে।
কালিয়াবরণ দেখি নব জলধরে ॥
নব জলধর দেখি ফাটে মোর হিয়া।
না জানি কি করি গেল শ্যাম বিনোদিয়া ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
শ্রাবণে সপনে উদ্ধব শ্যামের সঙ্গীত।
নিভৃত মন্দিরে বসি গাহিবে...... ॥
... ...হিয়া পাশে।
সেই রাত্রি শুনি আমি বিরল হুতাশে ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
... ...যমুনা পাথার।
গতায়াত নাহি যাব [মথুরার পাড়] ॥
পাখী হয়ে উড়ে যাই পাখা না দেয় বিধি।
মারিয়া প্রেমের শেল গেল গুণনিধি ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
অম্বিকা উৎসব দিনে আসিবেন বৃন্দাবনে ॥
আজি কালি করি　　দিবস গোঙাই হরি
দিবস দিবস করি মাসা।
মাসা মাসা করি　　বছর গোঙাই হরি
হরি হরি কি মোর জীবন আশা ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
কার্তিকে করিলা হরি কালীয় দমন।
কুসুমের ফুল ও যে অঙ্গের ভূষণ ॥
কালিয়া কুসুম তুলি গলে বনমালা।
না জানি কি হয়ে গেল বিনোদিয়া গলা ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
অগ্রাণে শুনেছি এক অপরূপ কথা।
মথুরাতে মাধব দণ্ডধারী ছাতা ॥
সেই সঙ্গে এক কথা শুনি ভাগ্য মানি।
শুনেছি কুবজা নাকি হইছে পাটের রাণী ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
পৌষে লিখিলাম পত্র প্রিয়সখীর হাথে।
মথুরা যাইব বলি এলাম এই পথে ॥
ভাল হইল এলে উদ্ধব হোলো দরশন।
কি বোল বলিবেন মোরে শ্রীমধুসূদন ॥
উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১ পহিলা জ্যৈষ্ঠ।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

[গত সংখ্যায় এই 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্য পুথিকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে নানা বর্ণাশুদ্ধির জন্য অর্থ গ্রহণের বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া এইবার হইতে প্রকাশ করা হইতেছে।—সংকলক]

[১০] দেখিয়া প্রভাত কালে হরগৌরীর মুখ।
সুবর্ণ কঙ্কণ কেহ দিলেক যৌতুক॥
শ্বশুরচরণে হর করিয়া বিদায়।
বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায়॥
কথ দিন ভগবতী মহেশ সহিত।
প্রসবিলা দুই পুত্র দেবতার হিত॥
কেহ স্তন পান করে কেহ বৈসে কোলে।
হাসি হাসি চুমু দেই বদনকমলে॥
হাসে নাচে ঘরে বুলে ছাওয়াল যুগল।
ঘরে ভাত নাহি গৌরী আরম্ভে কন্দল॥
শুন লো বিজয়া জয়া বল ত্রিলোচনে।
কোথাহ না যায় বুঢ়া বস্যা থাকে কোণে॥
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে যুগল ছাওয়াল।
প্রতিদিন কত আমি করিব উধার॥
উধার করিলে সখি শোধ নাহি যায়।
কি করিব কহ সখি বল না উপায়॥
গৌরীর বচনে বলে দেব স্মরহর।
আজিকার মত প্রিয়ে করহ সম্বল॥
উগরে পীযুষকণা যেন সুধাকর।
প্রভাতে আনিঞা আমি শুধিব সকল॥
মহেশবচনে গৌরী রন্ধনে দিল মন।
ইঙ্গিতে রান্ধিল অন্ন অমৃত ব্যঞ্জন॥
ভোজন করিয়া শোএ শয়নের গৃহে।
রজনী হইল শেষ কবিচন্দ্র কহে॥০॥

॥ মালসী ॥

বাঘছাল পরি কুণ্ডল কাণ।
পূর্ণ সুধাকর ভরলি ভাল॥
শৃঙ্গনাদ গলে ত্রিশূল হাথ।
ভিক্ষে চলে নগনন্দিনীকাত॥
দিমি দিমি দিমি ডমরু বায়।
বৃষে চাপি হর মন্থর জায়॥
পাকিল বিম্ব মধুর হাসি।
ললাট মাঝে উয়ে নব শশী॥
জাগে যেন হইল প্রভাত কাল।
তণ্ডুলপাত্র লগে চলে থাল॥
যার ঘরে শিব পুরে শৃঙ্গনাদ।
স্বর্গে নাচে তার পুরুষ সাত॥
ভিক্ষা দেই কেহ [১১ক] শিবের থালে।
যমের দায় নাহি কোন কালে॥
ভিক্ষা কৈল দেব বলদকেতু।
যুগল নন্দন সন্তোষ হেতু॥
সত্বর চলিলা আপন গৃহে।
ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ কহে॥০॥

॥ মল্লার রাগ ॥

শুন গো জননি বাজে ডমরু।
আমার বাপ আইসে তব গুরু॥
দুই ভাই গণ ময়ূরনাথ।
করতালি দেই বাজায় হাত॥

অঙ্গুলি দেখায় ঘুচায় দুঃখ।
হাসি হাসি পেখে মায়ের মুখ॥
গৌরীপতি নব চন্দ্র ললাটে।
উপনীত হইল গৃহ নিকটে॥
পঞ্চস্মরহর ডমরু হাথ।
তেজিল বলদ বলদনাথ॥
জীবননাথেরে দেখিয়া গৌরী।
সম্ভ্রমে উঠে হাথে জলঝারি॥
চরণের ধূলি বিনাশিল জলে।
আসন আনি দিল বসিবারে॥
আমোদিত কৈল গায়ের বাসে।
বসিল শঙ্কর গৌরীর পাশে॥
মুকুন্দ কহে ঝুলি এড়ি কাছে।
দেখি দেখি বাপু কি আনিঞাছে॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখ মাই মোরে কিছু নাই দেই।
একেলা গণেশ সকলি লেই॥
সর্প শ্রুতিমুখ সঙ্গে সেনানী।
ঝুলি ঝাড়ি হাসে পিনাকপাণি॥
তিলের মোদক রম্ভার ফল।
কাড়াকাড়ি দুহেঁ হাসি বিকল॥
হাথ পাঁচ কায় দেখিতে খর্ব্ব।
চারি ভুজে লোটে না ছাড়ে দর্প॥
স্বভুজে যুঝে অপর ভুজে খায়।
ষড়মুখ দেব ঘন ডাকে মায়॥
অচলনন্দিনী পগনকেশ।
দুঁহে বলি পুত্র শুন সুরেশ॥
ইন্দুরন্দুরনাথ গণেশ।
অনুজ ভাইরে কিছু দেহ শেষ॥
তণ্ডুল দেখি সুধাকরমুখী।
হাসি গালে হাথ চকোর আঁখি॥
কবিচন্দ্র কহে শুন হে নাথ।
যতনে হয়ে আজিকার ভাত॥

[১১]॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

লোকে বলে ভাল যৌবন উজ্জ্বল
পরম সুন্দরী গৌরী।
আত্মকর্ম্মফলে স্বামী পাগলে
বুঢ়া জনমভিখারী॥
চল রে নন্দি যাইব নাইর
কি মোর ঘরকরণে।
অন্নহীন জনে শান্তি নাই মনে
কন্দল রজনী দিনে॥
কেশরী শার্দুল ইন্দুর ময়ূর
বলদ আমার গৃহে।
আর ফণিবর সভে স্বতন্তর
কার বশ কেহ নহে॥
যুগল নন্দন এক ষড়ানন
আওর কুঞ্জরমুখ।
পঞ্চমুখ প্রভু মীনকেতুরিপু
সকল বিরূপ দুঃখ॥
নন্দী কহে বাণী শুন নারায়ণি
না যাইহ পিতৃঘরে।
অচলনন্দিনী হরের ঘরণী
কে তোমা চিনিতে পারে॥
জনপদ যত হইব এমত
আসা তেজ পিতৃবাসে।
সৃজিলে সংসার যত চরাচর
শুনিঞা চণ্ডিকা হাসে॥
যে সহে সে বড় অভিরোষ ছাড়
ভক্তজনে কর দয়া।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিলা প্রবন্ধ
সকলি তোমার মায়া॥০॥

॥ মল্লার রাগ ॥

নারদ আসিয়া খণ্ডায় দুঃখ।
পুরিজন মেলি হাস্য কৌতুক॥
নাটকী ভেজান আইল মুনি।
উপনীত যথা হর ভবানী॥

হাসিতে হাসিতে বলে নারদ।
বাপে ঝিয়ে আজি কেন বিরোধ ॥
লজ্জায় অম্বিকা গেলেন ঘর।
নারদ যুড়িল নাটকী শর ॥
মহেশেরে বলে নারদ মুনি।
দুই জনে আজি কন্দল কেনি ॥
নিবেদন করি শুন হে বোল।
অন্নের ভরেতে কেন কন্দল ॥
তুমি নাহি জান অচলঝি।
ও হি থাকিতে বা অন্নের কি ॥
নানা রত্ন আছে ওহার অঙ্গে।
পাশা খেলাইয়া জিনিহ রঙ্গে ॥
একত্র বা মাত্র জিনিঞা লবে।
কত কাল অন্ন বসিয়া খাবে ॥
[১২ক] মুনিবর কহে তত্ত্ববিশেষ।
বড় প্রেতিআশে যায় মহেশ ॥
দুই জনে শুন হাস্য কন্দল।
মুকুন্দ কহে বাশুলিমঙ্গল ॥•॥

॥ গৌরী রাগ ॥

নিবেদন করি শুন লো গৌরি।
রোষ না করিলে বলিতে পারি ॥
অনেক দিবস মনের আশা।
আজি দুই জনে খেলিব পাশা ॥
প্রভুর বচনে বলে ত্রিপুরা।
নিশ্চয় বিজয়া ধরিল পারা ॥
চরণে পড়হুঁ চল ভাঙ্গড়া।
কাটা ঘায় কত লোন ছোবড়া ॥
আল আল জয়া হেদে লো শুন।
ঘরে ভাত নাহি রঙ্গেতে মন ॥
ছি ছি লাজ নাহি তোমার মুখে।
পাশা খেলাইবে কেমন সুখে ॥
দিনের সম্বল মিলাইতে নার।
পাশা খেলাবারে ভাল সে পার ॥

নাহি হও বাম শুন লো প্রিয়ে।
অবশ্য পাশা খেলাব দুহেঁ ॥
হাসিতে হাসিতে বলিলা গৌরী।
যদি হার তবে তোমার কি করি ॥
হারিবে প্রভু না ছাড় মায়া।
টিটিকারি দিব জয়া বিজয়া ॥
গিরিজাবচনে গিরিশ বলে।
হারি জিনি আছে খেলার কালে ॥
দেখিব চাতুরি আমার ঠাঞি।
আমি গ খেলা জানি গ নাঞি ॥
পণ কর দুহেঁ পাতিব খেলা।
মনে মনে হাসি সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ ভাষে।
জয়া বিজয়া রহে দাণ্ডুড়ি আশে ॥•॥

॥ কামোদ রাগ ॥

বলে ত্রিলোচনী যদি হারি আমি
গায়ের ভূষণ দি।
যদ্যপি খেলিবে শুন সদাশিবে
হারিলে তোমার কি ॥
কহে ত্রিলোচন যদি তুমি জিন
আজি দুহেঁ করি কেলি।
শুন মোর পণ ডমরু বাজন
সিঙ্গা শূল কাঁথা ঝুলি ॥
মহেশ শ[১২]ঙ্করী দুহেঁ খেলে সারি
রচিয়া হীরার পাটী।
নন্দী মহাকাল দশদিগপাল
সাক্ষী আর যত চেটী ॥
দশ দশ দশ ডাকে ভবকেশ
বারচর গোঞে খেলে।
মানসের সুখে পাটী ঘষ বুকে
পাঁচনি চৌবঙ্ক পেলে ॥
হাথে করি সারি বলে ত্রিপুরারি
আজি এক দুই কাট।

দুই চারি করি   ডাকে শিবনারী
দুয়া চারি হৈল নাট ॥
সাতা দুয়া চারি   ডাকে ত্রিপুরারি
ত্রিপুরা পেলিল বিন্দু।
পড়িল দুতিয়া   শুখাইল হিয়া
হারিল বলদকেতু ॥
আঁখি ঠার দিয়া   সখারে পাঁচিয়া
শিখীর ঈশ্বর মাতা।
বাজন ডমরু   সিঙ্গা আর ত্রিশূল
কাড়ি নিল ঝুলি কাঁথা ॥
বুদ্ধি হইল লোপ   শিবে বাঢ়ে কোপ
বলে পাত্র আর চাল।
ভিক্ষার কারণ   চলিব সকাল
জিনি লহ বাঘছাল ॥
পাশা কর দূর   শুন হে ঠাকুর
সভাকার আছে কাজ।
তুমি ভূতনাথ   শুন মোর বাত
হারিলে পাইবে লাজ ॥
চাল পাতি ভুবি   পাটি ঘষে দেবী
ক্রমে দশ দুই চারি।
সাতা বিন্দুবিন্তি   পেলে ভগবতি
পাঁচনি করিলা সারি ॥
বারে বারে পেলে   বামঞ্চ দুতিয়া
হারিলা লাঞ্চন মৌলি।
আছাড়িয়া পাটী   ছাড়ে মহেশ্বর
মুচকি হাসিল গৌরী ॥
আসুকু দিবস   আছে গৃহদোষ
পশ্চাত নিবসে কাল।
হারিয়া শঙ্কর   দেব দিগম্বর
ছাড়িল বাঘের ছাল ॥
পাশা ছাড়ি যান   করিল ভোজন
ভিন্ন কভু দুহেঁ নহে।
শ্রীযুত মুকুন্দ   রচিলা প্রবন্ধ
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥•॥

॥ সুহই রাগ ॥

অমৃত সমান ভাষ   শিবদুর্গা পরিহাস
কুতূহলে শুন সর্ব্বজন।
[১৩ক]শঙ্কর হারিয়া পাশা   ছাড়িল সকল ভূষা
দিগম্বর হইল ততক্ষণ ॥
দিগম্বর প্রাণপতি   আনন্দিত ভগবতী
জিজ্ঞাসিতে করে অনুবন্ধ।
জানয়ে বিবিধ কলা   চতুর বিজয়ামালা
বচনে পাতিয়া যায় ছন্দ ॥
কেবা তুমি কহ মোরে কিবা কাজে হেথাকারে
পরিচয় দেহ দিগাম্বর।
বলে শিব আমি শূলী শুন গো তোমারে বলি
পরিচয় করিনু গোচর ॥
বলে দেবী সুলোচনী   চিকিৎসক নহি আমি
চলি যাহ ভিষক আগার।
আছে যদি শূলব্যাধি   ঔষধ করহ বিধি
যাহাতে পাইবে প্রতিকার ॥
শুন গো অবলা বালা   মধুতে মধুতা ভোলা
স্থাণু আমি তুমি নাহি জান।
অম্বিকা করিল আজ্ঞা   স্থাণু পদে বৃক্ষ সংজ্ঞা
গৃহমাঝে বুঢ়া গাছ কেন ॥
শুন গো প্রমুগ্ধ কান্তা   মনে না করিহ চিন্তা
নীলকণ্ঠ আমার খেয়াতি।
চণ্ডী প্রকাশিল তুণ্ড   শিখিপদে নীলকণ্ঠ
কেকাবাণী ডাক সুভারতী ॥
হিমালয় সুতাধর   তোমারে কি বলিব আর
পশুপতি কহিল নিদান।
শুনিঞা প্রভুর বোল   চণ্ডী হাসি উতরোল
এত তুমি পাইলে সন্ধান ॥
যদি তুমি বৃষেশ্বর   তৃণাহারী বনচর
শৃঙ্গ পুচ্ছ চারি চরণ।
তবে কেন হেন গতি কোথা আছে নিজাকৃতি
কহ মোরে ইহার কারণ ॥

হারিয়া চণ্ডীর ঠাঞি পূর্ব্বপক্ষ আর নাঞি
লজ্জায় মলিন ভোলানাথ।
বসিয়া চণ্ডীর পাশে জয়া বিজয়া হাসে
চারু ঝাঁপি বদনেতে হাথ॥
অনঙ্গ তরঙ্গ সঙ্গ সম্বরিতে নারে অঙ্গ
ভঙ্গ দিয়া যায় পঞ্চজনে।
অম্বিকা আঁখির ঠারে কহিল সখীর তরে
প্রভুরে রাখিহ দুইজনে॥
দেবীর আদেশে সখী শিবেরে ধরিয়া[১৩]রাখি
শিব তবে সৃজিল উপায়।
ধরিয়া দুর্গার হাথে সংযোগ করিয়া মাথে
বলে ব্রীড়া সনে বরদায়॥
পরিহার করোঁ তোরে বাঘছাল দিবে মোরে
শুন ষড়াননের জননি।
চণ্ডিকা বলেন প্রভু এ কথা না কহ কভু
ছাড়িয়া না দিব ছালখানি॥
বৃষভ ডমরু থাল কাঁথা ঝুলি অস্থিমাল
শেষ শিঙ্গা শূল আভরণ।
এ সব অবধি দিল অবিচারে লৈয়া চল
বাঘছাল আমার জীবন॥
ক্ষুধাতুর ষড়ানন আইল নিজ নিকেতন
জননীর কোলে স্তন পিয়ে।
দিগম্বর দেখি পিতা কহিতে লাগিল কথা
জিজ্ঞাসা পড়িল মায়ে পোএ॥
কোলে করি তারকারি পরিহাস হরগৌরী
এইরূপে পাল ভক্তজনে।
অম্বিকাচরণপদ্ম অভয় শরণ সদ্ম
শ্রীযুত মুকুন্দ সুরচনে॥০॥

॥ একাবলি ছন্দ॥

একাসনে হরগৌরী।
দিগম্বর ত্রিপুরারি॥
স্তন পিয়ে হেন কালে।
কুমার মায়ের কোলে॥
ল্যাঙ্গট দেখিয়া হরে।
প্রশ্ন করে কুতুহলে॥
শুন হিমালয়সুতা।
কহিবে না মোরে মিথ্যা॥
বাপার মস্তকে আজি।
কি দেখি ধবল রুচি॥
না ধর আঁচল তেজ।
পুত্র বাপে জিজ্ঞাসিয়া বুঝ॥
চরণে পড়হুঁ মাঞি।
কথিল চাঁদ গোসাঞি॥
কি আন ললাটের মাঝে।
কথিলে থাকিব কাছে॥
নাছে গিয়া তুমি খেল।
গত করি মাই বল॥
আঁচল না ধর পুত্র।
কথিল তৃতীয় নেত্র॥
কি আর কণ্ঠপ্রদেশে।
জলধ প্রতিমা ভাসে॥
বুদ্ধি নাহি মোর পোয়ে।
মাই পড়োঁ তোর দুই পায়ে
কোলে থাকি পুত্র উঠ।
খ্যাতি বিষ কালকূট॥
ধরিল অধরপুটে।
কি নামে নাভির হেটে॥
স্বরূপ করিয়া বল।
চণ্ডী হাসে খলখল॥
কাঁথে করি মহাসেনে।
চণ্ডী গেলা নিকেতনে॥
[১৪ক] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে।
রক্ষ দেবী নিজজনে॥০॥

॥ পয়ার॥

প্রভুরে বিদায় করি সখীর সংহতি।
পর্যটন করিল সকল বসুমতী॥

দিগেদেশ ভ্রমিঞা সিংহাসনে সুরলোকে।
ত্রিপুরা অমরাবতী বসিলা কৌতুকে ॥
উপকথা কহে কেহ শুনে ভগবতী।
শরৎকালে পূজ দুর্গা করিয়া ভকতি ॥
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে স্ত্রীপুরুষে।
মহেশের সেবা কেহ করে মধুমাসে ॥
চণ্ডীর অর্চনা করে পতিপুত্রবতী।
কেহ লক্ষ্মী পূজে কেহ পূজে সরস্বতী ॥
ব্রহ্মার অর্চ্চনা কেহ করে যজ্ঞ দান।
অনন্ত মানসে কেহ পূজে ভগবান ॥
ভুজগজননী জ্যৈষ্ঠ মাসে অবতরে।
যত দেবতার দাস দাসী ক্ষিতিতলে ॥
সেবক নাহিক শুনি হাসিল চণ্ডিকা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশে চন্দ্রিকা ॥
অযোনিসম্ভবা কহে বিশাললোচনী।
সৃজিয়া সেবক দাসী লব পুষ্পপাণি ॥
শনি কুজ বারে মোরে বিবিধ প্রকারে।
পূজিব সেবক লোক করিয়া প্রচারে ॥
কিন্নরা কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধর।
দেবগণ সঙ্গে যথা দেব পুরন্দর ॥
মন্দ মন্দ চলে দেবী আপনার কাজে।
সখী সঙ্গে উপনীত দেবতা সমাজে ॥
পদ্মযোনি সুরপতি হর বনমালী।
দাণ্ডাইল দেবগণ দেখিয়া রঙ্কিণী ॥
অর্চ্চনা পাইয়া দেবী বৈসে নিজাসনে।
হেন কালে সুখাসীন বলে মুনিগণে ॥
জিজ্ঞাসে ক্রোষ্টিক মুনি মৃকণ্ডুনন্দনে।
মন্বন্তরকথা কহ কি হৈল অষ্টমে ॥
মৃকণ্ডুনন্দন বলে ক্রোষ্টিক বচনে।
আজন্ম প্রভৃতি আমি আছি তপোবনে ॥
দেবকার্য্য যত কথা কহিতে না পারি।
আমার নিদেশে তুমি চল বিন্ধ্যগিরি ॥
পিঙ্গাক্ষ বিবাদ আর সুবৃত্তি সমুখে।
পক্ষ চারিজন তথা নিবসয়ে সুখে ॥
উলূক কুরণ কাক বক তপোধন।
সানন্দে নিবসে তথা পক্ষ চারিজন ॥
আমার নিদেশে তুমি নিবেদিহ তাঁরে।
মন্বন্তরকথা জানে দ্রোণ মুনিবরে ॥
[১৪] কথিব বিচিত্র কথা পয়ার রচিয়া।
মুনির নন্দন শুন সাবধান হৈয়া ॥
বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।
পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্মরণ ॥০॥

মুনি চলিল মুনির নিদেশনে।
যথা বিন্ধ্য নামে নগ উলূককুলে কাক
বক পক্ষ রথ চারি জনে ॥
এড়াইয়া নগ নদী বিষম কানন ক্ষিতি
তপোবনে করিয়া বিদায়।
গজ সিংহ শার্দুল মহিষ ভল্লুক গৌল
শশ মৃগ সুখে তৃণ খায় ॥
বিহগনন্দন পেখি বলে মুনি ক্রোষ্টিকি
আইলাঙ তোমার সন্নিধানে।
কহিবে অষ্টম মনু বিবরিয়া খগতনু
মৃকণ্ডুনন্দন নিদেশনে ॥
বলে পক্ষ শুন মুনি আমরা তির্য্যক্‌যোনি
তোমারে উচিত গুরু নহি।
মৃকণ্ডের তনয় কহিলেন মৃন্ময়
পক্ষের বচনে সেই ঠাঞি ॥
মৃন্ময় মুনির পদ কমল পূজিয়া ব্রত
কথা শুনিবারে পক্ষের ঠাঞি।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
রমানাথে রক্ষিহ সদাই ॥০॥

॥ বারাড়ি ॥

শুন মুনি মহাশয় সূর্য্যের তনয়
সাবর্ণি জঠরে যার জন্ম।

স্বারোচিষান্তর বর পূর্ব্ব মন্বন্তর
চৈত্র বংশ নৃপমণি।
সকল ধরণীতলে নৃপ হইল পুণ্যবলে
সুরথ সুরথ নামখানি ॥
অকাতর হয়ে দানে রূপে কামদেব জিনে
রণভূমি বিপরীত সত্ব।
ঔরস নন্দন ঘরে যেন প্রজাপতি পালে
কি কহিব তাহার মহত্ত্ব ॥
অশেষ বিদিত কলা প্রজা সুললিত বোলা
পুরিতে হইল পরিপন্থী।
আছিল সেবক যত হরিল পত্তিক রথ
গৃহদোষে হয়বর দন্তী ॥
সুরথ অনেক সৈন্য লোকে তারে ঘোষে ধন্য
বলহীন পুরিজন বৈরী।
তা সনে করিয়া যুদ্ধ হা[১৫ক]রিল আপন রাজ্য
নিজপুরে হত অধিকারী ॥
বিপক্ষে বেঢ়িল পুরি রাজা মনে মনে করি
হয়ারূঢ় মৃগয়ার ছলে।
ত্যেজিলা যতেক ধন নিজদারানন্দন
একেলা চলিলা বনস্থলে ॥
ধন উলটিয়া চায়ে বিপক্ষের প্রতি ভয়ে
রাজা হইয়া জীবনে কাতর।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ গৌরীরাগ ॥

মহিপাল সুরথ শঙ্করদাস।
নগর ত্যেজিয়া প্রাণের ভয়
করিল কাননবাস ॥
বনের ভিতর মেধসের ঘর
যথা বৈসে শিষ্য মুনি।
সফল দিবস দেখিয়া তাপস
ধায় বেদধ্বনি শুনি ॥
দেখিয়া অতিথি করিয়া ভকতি
মুনি মহাশয় মেধা।
শ্বাপদ মিলনে হরিণ দেখিয়া
নৃপ কথোদিন তথা ॥
মুনির আশ্রমে ঠাঞি ঠাঞি ভ্রমে
মমত্ব বিকল মনা।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
নৃপতি চিন্তয়ে নানা ॥০॥

॥ পয়ার ॥

পূর্ব্বপুরুষ মোর পালি নিজ পুরি।
রক্ষিতে নারিল আমি কেন নাহি মরি ॥
আমার কিঙ্কর যত দুষ্ট মহাশয়।
পালে বা না পালে রাজ্য ধর্ম্ম প্রতি ভয় ॥
ময়গল হস্তী মোর মহা বলবান।
না জানি কি খায় কিবা শুখায় পরাণ ॥
অনুগত জন মোর খাইত নানা সুখে।
বিপক্ষেরে সেবে মনে পাইয়া মনদুঃখে ॥
অনেক যতনে ধন করিল সঞ্চয়।
দুষ্ট রিপু জনে তাহা করিলেক ব্যয় ॥
সরসা সঞ্চিত মধু যেন থাকে বনে।
প্রতিপালে আপুনি বিনাশে দুর্জ্জনে ॥
এই কথা ভাবি মনে পাঁচ সাত করে।
মেধস মুনির কাছে বসি তরুতলে ॥
আসিয়া মিলিল হেন কালে এক নর।
দুই জনে দরশন জীবন সফল ॥
প্রফুল্ল বদনে কহে নৃপতিপ্রধান।
কে তুমি বলহ মোরে আপনার নাম ॥
শোকাকুল মন দেখি বিরস বদন।
কি হেতু কানন মাঝে করিলা গমন ॥
প্রণয় বচন নৃপতির মুখে শুনি।
অবনত পথিক কথিল শু[১৫]দ্ধবাণী ॥
সমাধি আমার নাম জন্ম বৈশ্যকুলে।
আমি ধনবান সুখে আছিলাম ঘরে ॥
না লংঘে বচন পুত্র করিত সন্তোষ।
হরিলেক সেই ধন করি মহারোষ ॥

গ্রহদোষে হইল মোর যুবতী কুমতি।
ধনলোভে খেদিলেক নাঞি বলে পতি ॥
বন্ধুজন সহিত কন্দল প্রতিদিনে।
ধনপুত্রহীন আমি প্রবেশিলুঁ বনে ॥
পুত্র মিত্র বন্ধুজন যুবতীর তরে।
ভাল মন্দ তার ভাবি মন মোর ঝুরে ॥
ত্যেজিল সকল সুখ শয়নমন্দির।
শোকেতে সৃজিল বিধি আমার শরীর ॥
কানন ভিতরে বসি করি অনুতাপ।
না জানি কেমতে মোরে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥
সুপথে কুপথে কিবা পুত্রবধূ ঘরে।
না জানি মঙ্গলে কিবা আছে অমঙ্গলে ॥
সুরথ নৃপতি বলে বৈশ্যের বচনে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষবহ্নি দিয়া মোরে　　প্রমদা যে জন হরে
যেই জন অস্ত্র ধরি বধে।
আততায়ী করি বধ　　তাতে নাহি পাতক
এই কথা কথিল ভারতে ॥
শুন আমি তোমারে বুঝাই।
শুন বৈশ্যের নন্দন　　যে হরে পরের ধন
ছয় বেদে করে আততাই ॥
অবধ্য জনেরে বধ　　করিলে পাতক যত
বধ্যের রক্ষণে সেই ফল।
তুমি তারে কর দয়া　　না বুঝি তোমার মায়া
মন মোর করয়ে চঞ্চল ॥
ইষ্টবান্ধব পুত্র　　কলত্র যতেক মিত্র
ধন লৈয়া খেদিল আমারে।
তারে অনুরাগ বাঢ়ে　　যেন বহ্নি ঘর পোড়ে
তেন মত না দেখি বিচারে ॥
শুন নৃপ মহাশয়　　তুমি যে কথিলে হয়
সেইরূপ আমার হৃদয়।
দুরাচার মোর মন　　নাঞি জানি কি কারণ
নিষ্ঠুরতা তবু নাহি হয় ॥

ধন প্রাণ যেই লয়　　কভু সে বান্ধব নয়
জানি আমি গুরুর প্রসাদে।
কি বলিব শুন ভাই　　চল যাই মুনির ঠাঞি
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥০॥

॥ কৌরাগ ॥

নৃপ চলিল মুনির সন্নিধানে।
বৈশ্যের সঙ্গতি　　সমাধি সংহতি
করিয়া প্রবেশিলা বনে ॥
[১৬ক] শশ মৃগ কুঞ্জর　　ভল্লুক বানর
শার্দ্দূল সিংহ বিশালে।
।নবসে শ্বাপদ যত　　কারে কেহ নহে ভীত
কেবল মুনির তপবলে ॥
সকল পাতক হরে　　আপদ তেজয় দূরে
যতদূর যায় বেদধ্বনি।
জানিল মুনির ঘর　　কাননের ভিতর
হরষিত বৈশ্য নৃপমণি ॥
মুনিপদে উপনীত　　দুই জনে অবনত
বসিল মুনির আদেশে।
নৃপ বৈশ্য নিঃশঙ্ক　　কোন কথা প্রসঙ্গ
করিয়া রহিলা পরিতোষে ॥
দুঃখে পীড়িত মন　　চিরদিন দুই জন
সমাধি সুরথ নরপতি।
চণ্ডীপদসরসিজে　　শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

কলত্র বান্ধব পুত্র　　পুরিজন ইষ্ট মিত্র
কুটুম্ব সকল দুঃখদাতা।
কি কহিব বিশেষ　　ছাড়িল আপন দেশ
তথি কেন আমার মমতা ॥
জ্ঞান থাকিতে জানি　　আপুনি পণ্ডিত মানি
মূর্খের সদৃশ হৃদয়।
এই বৈশ্যনন্দন　　ইহার যতেক ধন
হরিলেক প্রমদাতনয় ॥

শুন মুনি মহাশয় নিবেদি তোমার পায়
কেন বশ নহে মন মেরা।
বসিয়া মুনির পাশে নৃপতি মধুর ভাষে
হিমকর নিকটে চকোরা॥
খেদিয়া হরিল ধন আস্নেহ পরিজন
অসুখে করিল বনবাস।
জান তুমি চারি বেদ এইরূপ মোর খেদ
তব পদে করিল প্রকাশ॥
দেখিল বিশেষ দোষ হৃদয়ে নাহিক তোষ
নয়নের জল খসে মোহে।
হুহেঁ নহি অজ্ঞান শুন মুনি তপোধন
এত দুঃখ কেনি প্রাণে সহে॥
ময়গল যত রথ তুরগ পত্তিক যত
গোধন ছিল নাহি লেখা।
সে সব হরিল পরে বিধি বিড়ম্বিল মোরে
বড় পুণ্যে বৈশ্যের সনে দেখা॥
দুই প্রাণী এই জ্ঞানী নয়ান থাকিতে নাহি
মূর্খতা দেখিতে সকল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে সরস [১৬] মঙ্গল॥০॥

॥ পয়ার ॥

নৃপতির বচনে বলে মুনির প্রধান।
বিষয় গোচরে যত জন্তুর জ্ঞায়ান॥
পৃথক বিষয় যত প্রাণীর নিবন্ধ।
কেহ রাত্রে দেখে কেহ দিবসেতে অন্ধ॥
রাত্রি দিবা নাহি দেখে ক্ষিতিতলে বৈসে।
একরূপ দেখে কেহ রজনী দিবসে॥
কেবল মনুষ্য জ্ঞানী হেন বোল নহে।
পশু পক্ষ মৃগ আদি জীবন যে বহে॥
তুরগ বারিজ মৃগ পক্ষজ সকল।
নরতুল্য নহে জ্ঞানী যত জীবধর॥
দেখ রে নৃপতিসুত পক্ষ থাকে বনে।
তৃণে ঘর বান্ধিয়া আপন পর জানে॥
প্রসবিয়া ডিম নিরবধি দেই তা।
অনেক যতনে তবে দুহেঁ করে ছা॥
যদি জ্ঞান নাহি তবে পাখে কেন ঢাকে।
কেহ জানি খায়ে পুত্রে শীত পাছে লাগে॥
ক্ষুধানলে আপনার তনু প্রাণ দহে।
শিশুমুখে কণা দেই পক্ষগণ মোহে॥
শুনহ সুরথ অহে বৈশ্যের পো।
যত দেখ ছাওয়াল সভার মায়া মো॥
নিজ পর জ্ঞান হয় মহামোহকূপে।
সুখ দুঃখ যত তত্ত্ব পড়িল স্বরূপে॥
কেহ সুখ ভুঞ্জে কেহ করে অনুতাপ।
যত সব দেখ মহামায়ার প্রভাব॥
যোগনিদ্রাশেষে বিষ্ণু মানসে বিস্ময়।
যাহার মায়ায় সৃষ্টি কথিল নিশ্চয়॥
কারে ভাল মন্দ করে করে কারে দয়া।
জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়া॥
মহামায়া রূপে বিরাজিল চরাচর।
যাহার কৃপায় মুক্তি পায় দেব নর॥
জগতপালন হেতু নির্ব্বাণ কারণ।
সকল পরমবিদ্যা সেই ত্রিভুবন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য বলে নরপতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা ভারতী॥০॥

॥ ইতি দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত ॥

॥ রাগ গৌরী ॥

ভগবন কথিলে সে কে মহামায়া।
হাম নাহি জানো জনম তাহার
কো হেতু উৎপন্ন কায়া॥
বামন তপস্বী যো তুহুঁ কহসি
সোই সব সত্য হোই।
চতুরবেদ তব মুখ কুকরই
তুহুঁ বিধি আন নাহি কোই॥
কিরূপ হস্ত চরণ মুখমণ্ডল
[১৭ক] লোচন তারক ভ্রূহি।

কে তার জনক　　জননী কো হয়
　　কোন কর্ম্ম করে সোই ॥
দেবীর তত্ত্ব　　শুনি হামু সকল
　　তো ঠাই পীযূষ ভাসি।
শ্রীযুত মুকুন্দ　　ভনই বামন
　　ভবপত্নীপদ অভিলাষী ॥ ০ ॥

আত্মা প্রকাশে দেবী দেবতার কাজে।
উৎপন্না বলিয়া তাঁরে জগজনে পূজে ॥
যোগনিদ্রা শেষে বিষ্ণু প্রলয়ের জলে।
জন্মিল কৈটভ মধু তাঁর কর্ণমূলে ॥
সৃজিল পৃথিবী যেই শস্তবতী সতী।
আমা হৈতে শুন নৃপ তাঁহার উৎপত্তি ॥
জন্মিল কৈটভ মধু দেখিল দুর্ম্মতি।
হরিনাভিপদ্মে ত্রাসে লুকাইল বিধি ॥
ধাইল অসুর দুই আপনার বলে।
না দেখি পুরুষবর লুকাইল জলে ॥
দেখিয়া অসুর উগ্র হরির শয়ন।
যোগনিদ্রায় স্তুতি করে সরসিজাসন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥
　　॥ পাহিড়া রাগ ॥
হরির নয়ন তেজ ডর লাগে বুকে।
তোমার মহিমা কি বলিব চারি মুখে ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা সকল বষট।
চারিদশলোকে তুমি করিলে কপট ॥
খড়্গা ত্রিশূল গদা শঙ্খ চক্রিণী।
বিশাললোচনী জয়া নৃমুণ্ডমালিনী ॥
অর্দ্ধমাত্রা ত্রিমাত্রা ত্রিগুণ বিভাবিনী।
সৃজন পালন ক্ষয় তৃতীয় রূপিণী ॥
তুমি ক্ষিতি সৃজ পাল তুমি কর অন্ত।
বধিলে অমরে যত অসুর দুরন্ত ॥
অলক্ষ্মী কমলা তুমি ত্রিজগদীশ্বরী।
মহামোহ মহামায়া জননী শঙ্করী ॥
কোদণ্ডধারিণী ক্ষেমা সতী তপস্বিনী।
তুমি তুষ্টি তুমি পুষ্টি মো[১৭]হিনী শঙ্খিনী
কাল তপস্বিনী মহাজননী খেচরী।
তুমি মন্ত্রময়ী লজ্জা পরম সুন্দরী ॥
স্বাহা মেধা মহাবিদ্যা শান্তি স্বরূপিণী।
অচিন্ত্যরূপিণী জয়া হরের গৃহিণী ॥
সৃজে পালে সংহার করয়ে চক্রপাণি।
তাঁরে নিদ্রাবশ তুমি করিলে আপনি ॥
তোমার প্রসাদে আমি বিধি হরি হর।
তুমি দেবী নরসুরাসুরে অগোচর ॥
আপনা আপনি কাল ত্রিলোক্য মণ্ডলে।
কোটী মুখে তব স্তুতি কে করিতে পারে ॥
মরুক কৈটভ মধু মহা মোহজালে।
হরিরে প্রবোধ যেন জিনে রণস্থলে ॥
সমুখে কৈটভ দেখ মহাসুর মধু।
বিষ্ণুর শরীর তেজ দেবতার রিপু ॥
বধিলে কৈটভ মধু ভয় হয় দূর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥ ০ ॥

প্রলয়ের জলে হরি ভুজগ খট্টায়।
অনেক দিবস প্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
নয়নে ছাড়িল নিন্দ উঠে ভগবান।
দেখিল অসুর দুই অচল সমান ॥
ধাইল রে দুই মধু কৈটভ যুঝে।
জগদীশ সহিত কেবল ভুজে ভুজে ॥
ব্রহ্মা পলায় ডরে নাহি ঘরে বাস।
হংস উড়িল পাখে ঠেকিল আকাশ ॥
আয়াস লাগিল দেহে গলে ঘর্ম্মজল।
নিরন্তর যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥
ঘন উঠে পড়ে কেহ নহে হীনবল।
ক্রোধে নয়ন করে অরুণ মণ্ডল ॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোঁফে দেই পাক।
মুঠাকিতে ভাঙ্গে বুক ছাড়ে বীরডাক ॥

অসুর মোহিল দেবী কোপে মহাবল।
দাণ্ডাইয়া রহে যেন দুই মহীধর ॥
শুন রে পুরুষ মাগ মোর ঠাঞি বর।
রণে তোরে পরিতোষ পাইল [১৮ক] নির্ভর ॥
অসুরের বচনে সন্তোষ ভগবান।
বর মাগি তুমি যদি নাঞি কর আন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ৩ ॥

কি কহিব মহাসুর তোর বড় বুক।
যুঝিয়া অনেক দিন পাইলাঙ সুখ ॥
তোমরা আমায় যদি তুষ্ট দুই ভাই।
বর মাগি দুই জনে বধিব এথাই ॥
এ বোল শুনিয়াসুর চারি দিগে চায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥
মহামায়া বঞ্চিল অসুর দুই বল।
কাটিয় আমার মাথা যথা নাহি জল ॥
এই বচন সত্য অন্যথা না করি।
মিলিলা দুই ভাই যথা দেব শ্রীহরি ॥
সুদর্শন কমল ধরিয়া শঙ্খ গদা।
জঘনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা ॥
ত্রিপুরা সহায় জিনে মধু কৈটভ রিপু।
দেবীর প্রভাব এই স্থূল সূক্ষ্ম বপু ॥
অপর দেবীর কথা শুন দুই জন।
যাহার প্রসাদে হরি দেব ত্রিনয়ন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥
॥ তৃতীয় পালা সমাপ্ত ॥

॥ কামোদ ॥

জম্ভ দনুজভূত আছিল নিরাপদ
রাজত্ব করিল চিরদিন।
মহত্ত্ব ধন বল সকল বিফল
জীবন সন্ততিহীন ॥
শয়ন জাগরণে বসিয়া ভাবে মনে
তুরঙ্গ গজ দোলারূঢ়।
সকল জন কহে তনয় অন্ত নহে
সেবিলে বিনি শশিচুড় ॥
চলে তপোবনে শিব আরাধনে
সেবক দিয়া নিজ পুরে।
বিমল বহে নীর মকর কুম্ভীর
জহ্নু তনয়ার তীরে ॥
দ্বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
পু[১৮]জিল বিধিমত ঈশে।
সন্তোষ হইয়া হর ত্যজিয়া সুনগর
উড়িলা জম্ভ যথা বৈসে ॥
ডমরু সিঙ্গানাদ বলদে ভূতনাথ
দেখিয়া পুটহাথে ভাষে।
আমার বীর্য্যে পুত্র জিনিব শতমখ
নিদেশ কর পরিতোষে ॥
তোমার অভিমত করিব আমি সিদ্ধ
বলিয়া শিব গেলা ঘরে।
নারদ মহামুনি শুনিঞা যত বাণী
কথিল গিয়া পুরন্দরে ॥
বিষ্ণুর তুমি জেঠ উপায় চিন্ত ঝাট
ত্রিদেব যেন নষ্ঠ নহে।
ত্রিপুরাপদদ্বন্দ্ব কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

শুন ইন্দ্র বাক্য মোর দেবতার রাজা।
জম্ভ করিল তপ বলে মহারাজা ॥
সেই তপে বশ হৈল দেব পশুপতি।
বর দিল তার তরে হইব সন্ততি ॥
তোর পুত্র হব রাজা ত্রিভুবনেশ্বর।
জিনিব সকল দেব ইন্দ্রের নগর ॥
বর দিয়া পশুপতি গেলা নিজ ঘর।
দেশেরে চলিলা জম্ভ পাইয়া পুত্রবর ॥
দেখিল শুনিল কথা কহিল তোমারে।
হিতাহিত বিচারিয়া চিন্ত প্রতিকারে ॥

নারদবচনে ভয় পাইল ইন্দ্র মনে।
জিজ্ঞাসিল কি করিব কহ তপোধনে॥
বলিলেন উপায় নারদ মহাঋষি।
দ্বাদশ বৎসর জম্ভ আছে উপবাসী॥
ঐরাবত চড়ি চল বজ্র লইয়া হাথে।
সংগ্রাম করিয়া মার অসুরের নাথে॥
নারদবচনে চাপে ঐরাবত হাথী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ পয়ার ॥

নারদের বচনে হৃদয়ে লাগে ডর।
মাতুলি আনিঞা পান দিলেক সত্বর॥
ঝাটো রথ সাজি আন নাহি কর হেলা।
প্রসাদ চন্দন দিল পারিজাত মালা॥
ইন্দ্রপদে মাতুলি সন্তোষে করে সেবা।
সাজিয়া আনিল ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা॥
সঘোত পা[১৯ক]থর পিঠে কনকের জিন
ছত্রিশ আতর বহে নহে গুণহীন॥
বজ্র হাথে করি ইন্দ্র ঐরাবতে চাপে।
ধনুকে টঙ্কার দেই ত্রিভুবন কাঁপে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গজ ছাড়িল সত্বর।
আগলে জম্ভের পথ বায়ু করি ভর॥
ইন্দ্র কহে শুন জম্ভ কোথা রে গমন।
ইৎসা বড় বাড়ে তোমা সঙ্গে করি রণ॥
ইন্দ্রের বচনে জম্ভ মনে মনে হাসি।
দ্বাদশ বৎসর আমি আছি উপবাসী॥
ঐরাবতারূঢ় শচীনাথ পুরন্দর।
আমারে সংগ্রাম চাহে দেখিয়া নির্ব্বল॥
সংগ্রাম চাহিলে যদি নাহি হয় সত্ব।
মরণে মুকতি নাহি বিখ্যাত বীরত্ব॥
জীবন যৌবন ধন সকল বিফল।
এতেক ভাবিয়া জম্ভ দিলেক উত্তর॥
স্নান করিয়া আমি করি জলপান।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুন মরুত্বান॥

ধীরে ধীরে যায় জম্ভ জহ্নু নদীতটে।
রূপসী মহিষী দেখে কানন নিকটে॥
দিবা অবসানে জম্ভ যায় তার পাশে।
ঋতুবতী মহিষী দেখিয়া পরিতোষে॥
স্মরশর জর জর বিধির ঘটনে।
পরিতোষে আলিঙ্গন হইল দুই জনে॥
মহিষা সহিত জম্ভ বঞ্চিল সুরতি।
কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশভারতী॥
মহিষীর গর্ব্ভে রহে জম্ভের তনয়।
মহেশের বরেতে জন্মিলা মহাশয়॥
স্নান করিবারে জম্ভ মজিলেক জলে।
জলপান করি উঠে জহ্নু নদীকুলে॥
জম্ভ বাসবে যুদ্ধ হয় রাত্রি দিনে।
মহিষী মহিষা নামে প্রসবিলা বনে॥
পরিজন দিয়া জম্ভ পুত্র নিল ঘরে।
অবিরত যুঝে অন্ন নাহিক জঠরে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ পঠমঞ্জরি ॥

ক্ষেণে ক্ষেণে চমকিত　অদিতিনন্দন যত
　মহিষাসুর অবতীর্ণে।
সকল জলদধর　শিরে শশিমণ্ডল
　মকর কুণ্ডল দুই কর্ণে॥
মুরজ পটহ বেণী　সুরণিত শঙ্খধ্বনি
　কার কথা কেহ নাহি শুনে।
[১৯] অনেক দৈত্যের মালা কুঙ্কুম চন্দন খেলা
　কর্পূর তাম্বূল সুবদনে॥
জয় জয় কোলাহল　হরষিত দৈত্য বল
　সুর নর ভুবি রসাতলে।
পূর্ব্বে ধূপ দীপ ছিল　অনল উজ্জ্বল হইল
　প্রতিপক্ষ হৃদয়ে বিশালে॥
কম্পিত বসুমতী　দিনেশ বিষম গতি
　প্রতিকূল বহে সমীরণ।

মেঘ ডাকে উৎপাত ঘন হয় বজ্রাঘাত
অসমীহ জলে হুতাশন ॥
অমর নগর প্রভু বাচিল বিষম রিপু
দেবগণে করে অনুমান।
অলক্ষিত রূপ বল বিপরীত কলেবর
দুর্জ্জয় দনুজপ্রধান ॥
ভৃগু মুনির সুত অসুরের পুরোহিত
সরস মঙ্গল বেদগানে ॥
করিলেক আশীর্ব্বাদ তুমি ত্রিভুবন নাথ
কামরূপ মন্ত্র দিল কানে ॥
চামর চিকুর বীর প্রভৃতি যতেক সুর
গতায়াতে মহিষচরণে।
ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

মহিষ জন্তের পুত্র করে অনুমান।
ত্রিভুবনে নাহি ধর্ম্ম কর্ম্মের সমান ॥
দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস মানুষ।
পিশাচ কিন্নর নর জরা মধ্যামুজ ॥
পুণ্যের প্রতাপে ইন্দ্র ত্রিদশের নাথ।
ধর্ম্মহীন জন করে সতত বিষাদ ॥
অবশ্য জনমে মৃত্যু মরণে জনম।
সুকৃতি দুষ্কৃতি সুখদুঃখের কারণ।
পূর্ব্বকর্ম্ম ভুজে মূঢ় বিস্মরে আপনা ॥
জলে পদ্ম বিকশে বিনাশে হিমকণা ॥
ধর্ম্মের কারণে বীর সুরনদীতটে।
প্রবেশিলা নিরাহারে তপস্বী নিকটে ॥
আঁখি মুখ নাসা শ্রুতি নিবারণ করি।
ব্রহ্মজ্ঞান মুখে রহে ব্রহ্মে দিয়া তালি ॥
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে।
মন দিয়া রহে ক্ষুধা তৃষা নাহি জানে ॥
মহিষতপের বলে টলটল ক্ষিতি।
জানিঞা সাক্ষাতে হইল অনাদি যুগপতি ॥

চারি বেদ পড়ে ব্রহ্মা প্রণবে নাহি টুটে।
সমাধি ভাঙ্গিল বীর চাহে কোপদিঠে ॥
বর মাগ মহাসুর খণ্ডাইব দুঃখ।
[২০ক] ভঙ্গি করিয়া নাচে হংসে চারি মুখ
প্রণতি করিয়া বীর বলে সবিনয়।
ত্রিভুবনের নরপতি করিবে অক্ষয় ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

মহিষ বচনে বলে বিধি বেদানন।
আমি যুগপতি জন্ম মরণ কারণ ॥
কোন কালে নহে মিথ্যা আমার বচন।
জন্মিলে মরণ শুন জন্তের নন্দন ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি নিশ্চয় নিষ্ঠুর।
চরণ কমল যুগে ধরে মহাসুর ॥
ভক্তিভাবে ব্রহ্মার মানসে উঠে দয়া।
জানিঞা দৈত্যের মুখে বৈসে মহামায়া ॥
মিথ্যা আমি সেবিল তোমার পাদপদ্ম।
বর দিতে আমারে পাতিলে নানা ছদ্ম ॥
পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম জানিল ধেয়ানে।
বিষ্ণুমায়া দয়াবতী দৈত্যের বদনে ॥
খল খল হাসে ব্রহ্মা দেবের প্রধান।
পুনর্ব্বার মাগে বর করি পূর্ণকাম ॥
ক্ষেম অপরাধ গোসাঞি যে কথিল রোষে।
সর্ব্বদা সেবকে পরিপূর্ণ গুণদোষে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে যাহার জনম।
তার হাথে কভু মোর নহিব মরণ ॥
সত্য সত্য বলে ব্রহ্মা হংসের ঠাকুর।
মরাল মঙ্গল ধ্বনি চরণে নূপুর ॥
আজি তোরে দিল আমি চারি মুখে বর।
সানন্দে নিবস গিয়া ত্রিভুবনেশ্বর ॥
বর দিয়া বিধি অন্তর্দ্ধান সেইখানে।
জন্তের মরণ শুন কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ঝাঁপা ॥

মুঠকী চাপড় চড় অস্ত্র নাহি হাথে।
এক ঘায়ে মূর্চ্ছিত করয়ে সুরনাথে ॥
উদরে নাহিক অন্ন না ভাবে অসুখ।
পরশিল নহে যেন তপে হুতভুক ॥
ইন্দ্রের সাহত যুঝে মহাসুর জম্ভ।
সমরপণ্ডিত শুর নাহি [২০] ছাড়ে দম্ভ ॥
ঘোরতর করে যুদ্ধ অসুর দারুণ।
রথাঙ্গ ফিরায় যেন ক্রোধিত অরুণ ॥
দেখিয়া দেবতাগণ করয়ে করুণ।
বিপরীত ধবল পাষাণে বিন্ধে ঘুণ ॥
রথহীন অসুর বাসব গজকন্ধে।
ওলানি উঠানি রণ নানা পরিবন্ধে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

অনেক দিবস অন্ন নাহি খায় জল।
হাথাহাথি দুই জনে বুঝে বলাবল ॥
হাথ ছাড়াইয়া বজ্র পেলে হরি হয়।
জম্ভ বধিল রণে দিল জয় জয় ॥
জম্ভ বধিয়া ইন্দ্র গেল নিজ ঘর।
নারদে আসিয়া কহে হরিষ অন্তর ॥
জম্ভ বধিল আমি আর নাহি ভয়।
আশীর্ব্বাদ করহ নারদ মহাশয় ॥
বাসবের কথা শুনি হাসে মহামুনি।
কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশের বাণী
জন্মিয়া জম্ভের পুত্র গিয়াছে তপোবনে।
মহিষ হইব ইন্দ্র শুন মঘবানে ॥
নারদের বচনে বাসব কাঁপে ডরে।
সুরপুরি রাখিতে উপায় বল মোরে ॥
করিব মহিষ বধ বিশাললোচনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী ॥০॥

॥ বারাচে ॥

না জানি মহিষাসুর আছে কোন কাজে।
দ্বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
তপ করে তপস্বীর মাঝে ॥
সন্তোষ জননী যতেক ভগিনী
বনিতা সনে সরসতা।
বিকশিত পুরীজন সহোদর বন্ধুগণ
অন্ন দিল নাহি আর কথা ॥
সন্তোষ মানসে রজনী দিবসে
দেবতা অসুরে নাহি ভেদ।
মহিষাসুর সনে দরশ কত দিনে
খণ্ডিব মনের খেদ ॥
বিজিতা[২১ক]খণ্ডল কিরীটী কুণ্ডল
দণ্ড কমণ্ডলুধারি।
ব্রেতাসুর সর্জ্জন জয় বীর গর্জ্জন
সভে উপনীত নিজপুরি ॥
মহিষ বিপুল বল গুরু করে মঙ্গল
হরষিত হইল যত প্রজা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
অসুরে মেলিয়া কৈল রাজা ॥০॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

আনন্দে বিভোল লোক নাচে উর্দ্ধভুজে।
নগর নাগরী আইল ধাওয়াধাই
বসন না দেই কুচে ॥
কৃতজয় নির্ম্মল পৌরপুরিজন
নিছিয়া কেহ পেলে পান।
প্রণবপূর্ব্বক বেদ পড়য়ে মঙ্গল
মুনিজন করয়ে কল্যাণ ॥
ধান্য পুরি জল পূর্ণিত কলসে
বদনে নব চুতডাল।
তৎকণ্ঠে লম্বিত গন্ধামোদিত
সুরতরুপুষ্পের মাল ॥
প্রতি জন নাচে অখণ্ড রোপিত
কদলি ক্ষিতিরুহতলে।

দূর্ব্বাক্ষত যব কাঞ্চন পাত্রে
ঘৃতের মশাল জ্বলে ॥
অসুর মহোৎসব শুনিঞা দেবতা
ত্রাসে নিষ্প্রতিভা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
না জানি রজনী দিবা ॥ ॥

॥ গুঞ্জরি রাগ ॥

জয়শঙ্খ বাজে ভেরী মৃদঙ্গ মাদল।
যুবতী সহিত লোক আনন্দে বিভোল ॥
বিজয় মঙ্গল গজ তুরঙ্গম লেখা।
রথ পদাতিক জয় ধবল পতাকা ॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর।
ঢাক ঢোল বাজে জয় জয় কোলাহল ॥
হরষিত হইল ইষ্টকুটুম্ব সকল।
রবির কিরণে যেন বিকশে কমল ॥
প্রতিপক্ষ টুটে যেন দিবসে দিবসে।
শিরীষ কুসুম যেন হুতাশন পাশে ॥
দান পুণ্য করে রাজা না করে বিচার।
অদিতিনন্দনগণে লাগে চমৎকার ॥
আনন্দে নিবসে লোক আপন ভবনে।
[২১] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে ॥•॥

॥ পয়ার ॥

অদিতি দিতির পুত্র দুহেঁ দণ্ডধারী।
কার কেহ নহে বশ বৈসে সুরপুরি ॥
আলাআলি গালাগালি করে সুরাসুর।
রড়ারড়ি দুই জনে নহে অতি দূর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ পদাতিক দুই দলে।
ঠেলাঠেলি করে দুহেঁ আপনার বলে ॥
নানা বাদ্য বাজে উল্লসিত হইল ঠাট।
কোপে কাট কাট বলে সুরাসুররাট ॥
অতি কোপে কাণ্ডাকাণ্ডি সমর প্রচণ্ড।
হানাহানি করি কেহ হয় খণ্ড খণ্ড ॥
দোয়াড় বিন্ধিল কারে সাজিতলে যায়।
ডাঙসের ঘায়ে কেহ ধরণী লোটায় ॥
মাহুত পেলাইয়া হস্তী লোটাইল ক্ষিতি
রথে মহারথী যুঝে পড়িল সারথি ॥
দাবাসিনি পড়ে ঘন বজ্র সমান।
ঘোড়ার রাউত কেহ হয় দুইখান ॥
পড়িল দেবতাসুর বহে রক্তনদী।
ভাসে গণ্ডি মুণ্ডি পত্তি রথ ঘোড়া হাথি
জয় জয় কোলাহল নাহি অবসাদ।
দেবতা দানবগণে হইল বিবাদ ॥
ঘন শিঙ্গা দগড়ে তেঘাই ভেরিচয়।
ক্ষেণে ক্ষেণে রণভূমি জয় পরাজয় ॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় নিরন্তর।
সম রণ দেখে লোক শতেক বৎসর ॥
শূল শক্তি শেল কেহ মারে চক্র বাণ।
ঐরাবতারূঢ় বজ্র পেলে মরুত্বান ॥
কোপে মহাসুর হয় মহিষশরীর।
বিশাল কাঁপয়ে দেবগণ নহে স্থির ॥
যুঝে ইন্দ্র মহিষ দেবতা দৈত্যপ্রভু।
দেবসৈন্য জিনিলেক দেবতার রিপু ॥
জিনিল দেবতাগণ দিতির তনয়।
মহিষ হইল ইন্দ্র দেবতানিলয় ॥
[২২ক]দিতিসুতপরাজিত দেবতা সকল।
পালাইয়া যায় সভে না পরে অম্বর ॥
অবল দেবতা দৈত্য মহাবলধর।
গৃহস্থ দেখিয়া যেন চোরে লাগে ডর ॥
জয় বৃষধ্বজ প্রভু দেব নারায়ণ।
দেবতার প্রাণ পরিত্রাণ কারণ ॥
তাঁর সন্নিধানে গিয়া রাখ নিজ প্রাণ।
মন্ত্রণা করিল বিধি মঙ্গলনিদান ॥
শুনিঞা মন্ত্রণা হরষিত দেবগণ।
কাকুবাদ করি ধরে ব্রহ্মার চরণ ॥
অনন্তাদি মধ্য চতুর্ম্মুখ যুগপতি।
অশেষ মন্ত্রণা প্রভু দেবতার গতি ॥
যতনে সৃজিলে দৈব দেবতানগর।
আপুনি করিলে দেবরাজ পুরন্দর।

দানবে লইল রাজ্য স্বর্গভূমিতল।
দেবতা সকলে কিছু নাহি বুদ্ধিবল॥
তুমি দেবপিতামহ পুরাণপুরুষ।
সৃজন পালন নাশ হেতু নিষ্কলুষ॥
তুমি যদি চল যথা হর নারায়ণ।
সভে গিয়া করি নিজ দুঃখ নিবেদন॥
দেবতার বচনে হৃদয়ে লাগে ব্যথা।
ভাল ভাল করি উঠে তিনলোকপিতা
আগে ব্রহ্মা পাছে যত দেবতাতনয়।
যাত্রা করিল সভে দিয়া জয় জয়॥
মনের অধিক গতি দেবতা সকল।
উপনীত হইল যথা দেব দামোদর॥
একে একে মহাশয় অদিতিনন্দন।
প্রণাম করিয়া করে দুঃখ নিবেদন॥
জলদসুন্দর দেহ গরুড়বাহন।
জলধিশয়ন প্রভু জলজনয়ন॥
বসুমতী ধবল কমঠ রূপধর।
ধবল ভুজগপতি তাহার উপর॥
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে সৃজিলে মানুষ।
অষ্ট লোকপাল দেব একেলা পুরুষ॥
সৃজিলে দেবতালয় হেম হিমগিরি।
দেবতার নাথ ইন্দ্র করিলে শ্রীহরি॥
দোষগুণবিরহিত [২২] সদয় হৃদয়।
জিনিল বিবুধরিপু কমলানিলয়॥
স্থলশূন্য পুরুষ নিরূপ দামোদর।
স্থাবর জঙ্গম নদ নদীর ঈশ্বর॥
পালন প্রলয় ভব তনু সনাতন।
জনম যৌবন জরা মরণ কারণ॥
চারি ভুজে গদা পদ্ম শঙ্খ সুদর্শন।
অবল সকল দেব বিপক্ষ গর্জ্জন॥
নরামৃত শশিশিরোমণি ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডমরু করে বলদ বাহন॥
ভুবনবিখ্যাত প্রভু হাড়মালা গলে।
ভস্মপূর্ণ শরীর বাসুকি বক্ষঃস্থলে॥

অনেক যতনে প্রভু মথিলে সাগর।
সিতাসিত শরীর অভেদ হরিহর॥
তুমি দেব সৃজিলে ভুবন চারি দশ।
অসুরে লইল রাজ্য হইল অপযশ॥
ত্রিদিবে মহিষাসুর হইল শচীনাথ।
চন্দ্র সূর্য্য শমন বরুণ বহ্নি বাত॥
আর যত দেবতার করে অধিকার।
সহিতে না পারি কেহ যুদ্ধ তাহার॥
ত্যেজিয়া ত্রিদিব দেব মহিষের ডরে।
মনুষ্য সমান ভ্রমি বসুমতীতলে॥
অনাথের নাথ তুমি অবলের বল।
অসুরে জিনিল দেব জীবন বিফল॥
তোমার চরণে হইল প্রণত দেবতা।
অসুরের বধ চিন্ত না করিহ দ্বিধা॥
শুনিঞা দেবের সরস করুণ বাণী।
ক্রোধে পূর্ণ দেহ দেব শূল চক্রপাণি॥
উন্মত্ত বেশ হইল হর দামোদর।
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে স্ফুরে কোপানল॥
কুমুদবান্ধব সূর্য্য বসু বিলোচন।
মনুষ্যবাহন বসুমতী হুতাশন॥
বরুণ পবন যম বিধি পুরন্দর।
সভাকার বদনে নির্গত কোপানল॥
দেবতাগণের তেজ ক্ষীরোদের কূলে।
অস্তরে অস্তরে ক্রমে ধক ধক জ্বলে॥
নিদাঘে সকল দেব নামে সিন্ধুজলে।
একত্র হইল তেজ পবনের ঠেলে॥
[২৩ক] সুমেরু পর্ব্বত যেন দেবকোপানল।
উজ্জ্বল করিল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল॥
শক্তিরূপিণী জয়া অনন্ত রূপিণী।
দেবকোপানলে দেবী বিশাললোচনী॥
অযোনিসম্ভবা দেবী শূন্যে অবতারে।
মহিষমর্দ্দিনী জয়া নিজ রূপ ধরে॥
প্রথমে জন্মিল মুখ মহেশের বরে।
শরীর রহিত শশী ষোল কলা ধরে॥

শমনের তেজে তাঁর হৈল কেশপাশ।
কাদম্বিনী জিনি যেন করিল প্রকাশ ॥
ভুজগণ হৈল তাঁর মাধবের বরে।
প্রবল তরঙ্গ যেন জলনিধি জলে ॥
চন্দ্রিমার তেজে দুই কুচ অবিরল।
সুগঠিত দশবান কনক শ্রীফল ॥
বাসবের তেজে তাঁর হইল মধ্যখান।
চক্র শিরোমণি হর ডমরু বাজান ॥
বরুণের তেজে সুবলিত জঙ্ঘা উরু।
ক্ষিতিতেজে তাঁহার নিতম্ব হইল গুরু ॥
পিতামহ তেজে তাঁর হইল দুই পদ।
অলিহীন বিকসিত নব কোকনদ ॥
অরুণের তেজে চরণের দশাঙ্গুলি।
অতি সুশোভিত যেন চাঁপার পাখড়ি ॥
বায়ুতেজে করাঙ্গুলি হইল সমতুল।
কুবেরের তেজে হইল নাসা তিলফুল ॥
প্রজাপতিতেজে হইল দশন তাঁহার।
সিন্দুরে নির্ম্মিত যেন মুকুতার হার ॥
অনলের তেজে তাঁর হইল ত্রিনয়ন।
কনক দর্পণে যেন বসিল খঞ্জন ॥
উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগ সুন্দর।
মধুপান করে যেন চপল ভ্রমর ॥
পবনের তেজে হইল শ্রবণ সুছাঁদ।
বিহগকণ্টক যেন আক্ষটির ফাঁদ ॥
দেখিল দেবতাশক্তিধৃতকলেবরা।
ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরা ॥
জয় জয় শব্দ করে গগনবাসিনী।
দেবতেজোময়ী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
দেখিয়া হরিষ হইল যত দেব[২৩]গণ।
দুর্জ্জয় মহিষাসুর ভয়াকুল মন ॥
অনুমান করে যুক্তি রণের কারণ।
দেবতা মেলিয়া দেই অস্ত্র অভরণ ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥
॥ চতুর্থ পালা সমাপ্ত ॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

নিজশূল ভবশূল স্মরহর দামোদর
চক্রে সৃজিয়া চক্রবাণ।
বরুণ বাজন শঙ্খ শক্তি দিল হুতাশন
ধনু তূণ শর পরমাণ ॥
ঐরাবত গজঘণ্টা কনকনির্ম্মিত কণ্ঠা
কুলিশজ বজ্র সুরেশ।
কালদণ্ড দিল যম সৃজিয়া আপন সম
নাগপাশ জলধি বিশেষ ॥
দেখি সুরতরুতলে ত্রিপুরা ক্ষীরোদকূলে
বিবসনা শক্তিরূপিণী।
ভূষি অস্ত্র অভরণে মেলিয়া দেবতাগণে
হরষিত দৈত্যদলনী ॥
দেবীর লোমকূপ মাঝে প্রবল আপন তেজে
ধরিলেক সহস্রকিরণ।
কমণ্ডলু অক্ষমালা প্রজাপতি খাণ্ডাফলা
অনন্ত ফণা দিল সুশোভন ॥
ক্ষীরোদ আপন সার সৃজিয়া রত্নের হার
অরুণ যুগল বস্ত্রখানি।
কেয়ুর নূপুর শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক
বলয়া কুণ্ডল চূড়ামণি ॥
অঙ্গুরি পাশুলী টাড়ি বিশ্বকর্ম্মা দিল রঙ্গি
নানারূপ অস্ত্র সকল।
জলধি পঙ্কজমাল শিরে দিল অবিশাল
শিরে দিল আপার কমল ॥
সিংহ দিল হিমবান্ তথি চণ্ডী অধিষ্ঠান
নানা রত্নে ভূষে ভববধূ।
কুবের ধনের পতি যার সখা বৃষপতি
কনকরচিত পাত্র মধু ॥
অনন্ত নাগের পতি পিঠে যার বসুমতী
নাগহার দিল গুনি সঙ্গে।
আর যত দেবগণ দিলেক বিবিধ বাণ
রত্নে ভূষিত অতি রঙ্গে ॥

বিধি পড়ে স্তুতি বেদ খণ্ডিতে দেবের খেদ
ভগবতী হাসে খল খল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
[২৪ ক] বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ মালসী ॥

চণ্ডীর অট্ট অট্ট হাস্য পূরিল অন্তরীক্ষ।
প্রতি শব্দে চমকে ত্রৈলোক্য দশ দিগ ॥
উথলিল সিন্ধু টলটল বসুমতী।
সকল পর্ব্বত নড়ে কাঁপে ফণিপতি ॥
সিংহবাহিনী দেবী তুমি ভগবতী।
কহে দেবগণ জয় জয় পার্ব্বতী ॥
ছুটিল সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হইল রথ।
শচীপতি এড়িয়া পালাইল ঐরাবত ॥
বৃষভ ছুটিল পেলাইয়া শশিচূড়।
পেলিয়া কমলাপতি উড়িল গরুড় ॥
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবর্ত্তে ফিরে।
ত্রাসে না দেখে নীর সমুদ্রের তীরে ॥
সিদ্ধার ধেয়ান ভাঙ্গে কর্ণে লাগে তালি।
সম্বরিতে নারে হাস্য রঙ্কিনী বাশুলী ॥
স্তুতি করে দেবগণ মুখে যার বেদ।
স্মিত পরিহরি দেবী দেবতার খেদ ॥
ক্ষুব্ধ সকল লোক দেখে দৈত্যপতি।
ভনই মুকুন্দ আঃ কিমিতি কিমিতি ॥০॥

॥ ঝাপা ॥

বীর সাজিল রে মহিষাসুর পতি
দেবতার শুনিঞা নিশান।
ক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ চাপে গগনে মুকুট লাগে
কলেবরে ছুটে কাল ঘাম ॥
কামান কৃপাণ ফরি তব করে নথ ছুরি
করতলে ডাবুস দোয়াড়।
লোহার মুদ্গর টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাঙ্গি
হলঙ্গা কাছিল জম দড় ॥
চিনিলা বিষম সুর নেজাপঞ্জি বট সর
মথিয়া চেয়াড় চক্র বাণ।
গদাক্ষ কি জাঠে পাশ জয়ঘণ্টা রিপুনাশ
দাবাসিনী বজ্র সমান ॥
নানা অস্ত্র বহে রথি ঘোটকের পবন গতি
রজত কাঞ্চনে শোভে রথ।
ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
সারথি সমরে বিশারদ ॥
শিঙ্গা দড় মসা কাড়া ঢাক ঢোল বাজে পড়া
ঘন ভেরি বরঙ্গ তে [২৪] ঘাই।
মহিষ পয়ানকালে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
সুরেরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
হানিয়া লোহার গণ্ডা পেলাইয়া লোফে খাণ্ডা
লাফ দিয়া মারে মালসাট।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ ধায় বিবরঙ্গক যায়
সমরে যুড়িতে মহাকাট ॥
কোটী কোটী ঘোড়া হাথি টল টল করে ক্ষিতি
অসুরে বেঢ়িল চারি দিগ।
আছিল অমরপুরে সুখে নিজ ঘরে ডরে
দেবতা পলায় অন্তরীক্ষে ॥
আকাশে পাতালে তনু হেন বীর মহাহনু
বিষম উন্নত আসলোমা।
দেবতার করে চুর সমর পণ্ডিত সুর
দিতির নন্দন যারে ক্ষেমা ॥
নৃপ চাহে কোপদিঠে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে
স্ফটিক ধবল পক্ষরাজে।
অঙ্গে দিয়া আঙ্গরেখি রবি শশী করে সাক্ষী
চামর চিকুর বায় পাজে ॥
উগ্রাস্য উগ্র বীর্য্য করাল দৈত্যের পূজ্য
উদগ্রজ ধায় অবিচারে।
কোটী নিযুত রথ হস্তী ঘোড়া অগণিত
ব্রহ্মা পলায় যার ডরে ॥
প্রাতে উদিত রবি নয়ন কমল ছবি
তাম্র বাস্কল মহাবল।
বড়াল বিষম বীর হরি হর নহে স্থির
যারে ডরায় শচীর ঈশ্বর ॥

ডরে মুনি ছাড়ে ধর্ম ত্রাসিত হইল কুর্ম
দেখিয়া যুদ্ধের পরিপাটী।
উদয়াস্ত গিরিমূলে চতুরঙ্গ দলে চলে
অসুর নিযুত কোটী কোটী॥
কুবের বরুণ হিম- কিরণ তরুণ যম
মরুৎ দগ্ধি কাঁপে থর থর।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

॥ মালসী॥

সাজিল মহিষ চণ্ডী ভাবে মনে মন।
কেমতে রাখিব আজি অদিতিনন্দন॥
সহস্রেক ভুজে পূর্ব্ব আগলে পশ্চিম।
ধনুকে টঙ্কার দেই কুলিশ প্রবীণ॥
চরণকমলভরে অলভ্র ধরণী।
[২৫ক] মাথার মুকুট আৎসাদিল মুনি॥
বেদমুখ হৃষীকেশ ত্রিলোচন যম।
হংস গরুড় বৃষ মহিষবাহন॥
ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝিবার আশে।
রজনী দিবস ঝড় বহিল আকাশে॥
বসু সন্ধ্যা বসুমতী হৃদয় চঞ্চল।
ফণিপতি জানিল একত্র বলাবল॥
কুবেরাগ্নি বরুণ পবন শচীনাথ।
রহিল সকল দেব দেবীর পশ্চাত॥
চতুরঙ্গ দলে দৈত্য উদ্যত কৃপাণ।
পাশাপাশি ঘোড়া হাথি করিয়া সন্ধান॥
সেনাপতি চলে আগে চিক্ষুর চামর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

॥ ঝাপা॥

ঝক ঝক খড়্গ ঝিকৈছে।
বীর মাদল দগড় বাজে॥
কোপে মহিষাসুর সাজে।
ত্রাসে কম্পহুঁ সর্পরাজে॥
ঘোটখুর পুটজাত ধূলি।
ছন্ন দিনকর কিরণমালি॥
রত্নমির্ম্মিত হারশালী।
মত্ত কুঞ্জর বিষম গাজে॥
লেঙ্গা খরতর ডাঙশ কাছে।
চমক পড়িল অসুর মাঝে॥
সর্ব্ব দানব চৌদিগে ধায়।
চণ্ডী কাঁপিল কমল পায়॥
শ্রীযুত মুকুন্দ বামন গায়॥০॥

॥ ছন্দ॥

হাথি ঘোড়া কোটী কোটী অগণিত রথ।
নানা বাদ্য বাজে বিরোধিল কর্ণপথ॥
দগড় কাঁসর ভেরি মৃদঙ্গ মাদল।
দণ্ডি মোহরি ডম্ফ বাজে অবিরল॥
দামা দড়মসা কাড়া বাজে ঠাঞি ঠাঞি।
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা বিরল তেঘাই॥
জয় বীরঢাক কাড়া বাজে অবিশাল।
বিজয় দুন্দুভি বাজে ফুকরে কাহাল॥
বীরঘণ্টা ভেরি বাজে বরঙ্গো বিশাল।
তোলপাড় করে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল॥
কোটী কোটী সহস্র কুঞ্জর অশ্ব রথ।
মহিষ দৈত্যের নাথ তথি মহাসত্ত॥
আগে পাছে ধায় দৈত্য যথা মহাশব্দ।
[২৫] দেখিয়া অসুরগণ দেবগণ স্তব্ধ॥
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে দেখে দৈত্যপতি।
তেজে ত্রিভুবন ব্যাপে একেলা যুবতী॥
আনম্র ধরণী করে পদসরসিজে।
আগলিল দুই দিগ দশ শত ভুজে॥
মাথার মুকুট লাগে গগন মণ্ডলে।
ধনুকটঙ্কারে সর্প কাঁপে রসাতলে॥
শুন লো সুমুখী কন্যা পড়িলি বিপাকে।
হান হান কাট কাট দৈত্যগণ ডাকে॥
মথিয়া তবকসিনি দাবা সিংহনাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত॥
তোমর পেলাইয়া কেহ মারে ভিন্দিপাল
কেহ শক্তি মারে কেহ তবক বিশাল॥

ত্রিপুরা সহিত যুঝে লইয়া শেল সাঙ্গি।
কেহ হানে কৃপাণে পেলিয়া মারে টাঙ্গি॥
কেহ খোঁচ বিন্ধে কেহ লোহার চেয়াড়।
কেহ লেঙ্গা মারে কেহ বিষম দোয়াড়॥
সহজে ত্রিপুরাদেবী বল বুদ্ধিমতী।
টানিল দৈত্যের বাণ দেবতার প্রতি॥
অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপে দেবী কোপে কাঁপে তনু।
পড়িল অনেক দৈত্য হত রথ ধনু॥
দেবীর খড়্গপ্রহারে রুষিল দৈত্যগণ।
চণ্ডীরে হানিতে যায় করিয়া বিক্রম॥
নানা অস্ত্র বরিষণ করে দৈত্যগণ।
সেই ভগবতী দেবী হাসে মনে মন॥
অস্ত্র বরিষণে দেখে আপন দিভব।
নিরস্ত্র করিল চণ্ডী যতেক দানব॥
সমরে রুষিলা স্মরহরসহচরী।
স্তুতি করে দেব ঋষি দেখিয়া ঈশ্বরী॥
নিজ শস্ত্র ক্ষেপে ভগবতী নাহি সহে।
ফুটিল অনেক বাণ অসুরের দেহে॥
কেশরী কাঁপায় সটা কোপে বাড়ে বল।
লাফ দিয়া পড়ে দৈত্য সহিন্ন ভিতর॥
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার বিদরে জঠর।
কাননের মাঝে যেন জ্বলিল অনল॥
[২৬ক] যুঝে ভগবতী ক্রোধে ছাড়িয়া নিশ্বাস
শতেক সহস্র দেবীগণের প্রকাশ॥
রণে নামে দেবীগণ দেখে দৈত্যপতি।
ভিন্দিপাল টাঙ্গি শক্তি পট্টিশ সংহতি॥
নানারূপে যুঝে লাগে অসুরের চমক।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ পুরে শঙ্খ॥
পট্টহ বাজায় কেহ কাড়ার লেখা।
সিংহনাদ পুরে কেহ চোলে দৈখা॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর।
রাউতে মাহুতে যুঝে রথী হইল জড়॥
গদাবাড়ি মারে কারো বুকে শক্তিশূল।
ত্রিপুরা হানিল খড়্গে শত শত সুর॥

দিতির নন্দনে দেবী বান্ধে নাগপাশে।
ঘণ্টার শবদে কেহ পড়িল তরাসে॥
কারো গাণ্ডে মুণ্ডে হানে কারো হানে কন্ধ।
ঝন ঝন রণভূমি বাঢ়িল আনন্দ॥
দেবীগণ কোপে কারো বুকে মারে শেল।
সহিতে না পারে দৈত্য দেবতার ঠেল॥
ঘোড়া ছাড়ে রাউত মাহুত ছাড়ে হাথি।
খান খান ঘোড়া হাথি সারথি বিরতি॥
কার বাম হাথে হানে কারো বাম পদ।
খান খান হইয়া পড়ে নাহি ছাড়ে সত্ব॥
বাহু বক্ষ চরণ নয়নে নিন্দ যায়।
অর্দ্ধখান দেহ কার ধরণী লোটায়॥
রণের ভিতর উঠে ধরি যমর্দ্ধ।
নানা যুদ্ধ করে কেহ বড়ই প্রমর্দ্ধ॥
কেহ করতালি দেই কার কন্ধ নাচে।
কার কন্ধ রড় দেই কার কন্ধ যুঝে॥
হাথে খড়্গা কবন্ধ চণ্ডীরে দেই গালি।
না পালা না পালা রহ রঙ্গিণী বাশুলী॥
নানা অস্ত্র হাথে করি উঠিল কবন্ধ।
চণ্ডীর সহিত যুঝে করিয়া প্রবন্ধ॥
পড়িল তুরগ সেনা রথ[২৬] দণ্ডাবল।
দেবতাদানবগম্য নহে রণস্থল॥
শোণিতের নদী বহে ভাসে গাণ্ডিমুণ্ডি।
দেখিয়া বাশুলী হাসে মঙ্গলচণ্ডী॥
কাষ্ঠনিচয় যেন জ্বলে হুতাশনে।
দেবীগণ বিনাশিল দিতির নন্দনে॥
দেবীর বাহন সিংহ করে মহারব।
জীবন তেজিয়া কত পড়িল দানব॥
স্তুতি করে দেবগণ দেবীর বিজয়।
অসংখ্য দানব পড়ে মহিষ নির্ভয়॥
পুষ্প বরিষণ করে দেবীর উপর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষম সমর সুর ধায় বীর চিক্ষুর
চামর ধাইল তার পাছে।
হান হান কাট কাট নিনাদে পাগল ঠাট
একেলা রহিয়া চণ্ডী যুঝে॥

নেঞ্জা খাণ্ডা করতল ব্যাপিল রণস্থল
অস্ত্রের কিরণ দশদিগ।
দেবতা পালায় ডরে বলে দৈত্য উচ্চস্বরে
অবলার সাহস অধিক ॥
আগল সকল দিগে শেল শক্তি মার বুকে
ঘুচে যেন যুবতীজনম।
বলে দেবী মধু ভাষা জীবনের তেজ আশা
অকারণে দৈত্যের বিক্রম ॥
ষাটী সহস্র রথি উদগ্রজ সংহতি
অবিরত করে শরবৃষ্টি।
ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
অধিক প্রসরে নাঞি দৃষ্টি ॥
অসিলোমা দিতিসুত পঞ্চাশ নিযুত রথ
মহাহস্থ লৈয়া শত কোটী।
বাস্কল মহিষ পক্ষ কোটীধিক ষাটী লক্ষ
রথ হয় গজ পরিপাটী ॥
বিড়াল দিতির সুত কোটী নিযুত রথ
গজ বাজি পদাতি বিস্তর।
আর যত মহাসুর তার সৈন্য প্রচুর
দেবতা মনুষ্যে অগোচর ॥
হস্তী ঘোড়া চরণালি গগনে উড়িল ধূলি
কঙ্করে গগনমণ্ডল।
চণ্ডীপদসর[২৭ক]সিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ● ॥

॥ ধানশী ॥

দেখিয়া চণ্ডীর বল পড়ে চতুরঙ্গ দল
হৃদয়ে বিশাল বাড়ে কোপ।
বলে দৈত্য চিক্ষুর নাশিব অমরপুর
দেবতা করিব আজি লোপ ॥
রণে নামে মহাসুর ঘন বাজে রণতুর
চণ্ডীর উপর মহারথ।
অশেষ বিশেষ শর বেগে সমীরণ জল
যেন মেরুশিখরে জলদ ॥
যাহার যতেক বাণ কৈল চণ্ডী খান খান
নিজ বাণে তাহার তুরঙ্গ।
কাটিল ধনুক ধ্বজ সারথি বিষম গজ
বাণে বিন্ধে অসুর বিসন্ধ ॥
ছিন্নধন্বা মহাসত্ব হতাশ্ব অগণিত রথ
অবিসাথে অবিচারে ধায়।
খড়্গ চর্ম ধরি হাথে লাফ দেই শূন্য পথে
ত্রিপুরা নিকটে দৈত্য যায় ॥

খরধার খড়্গ খানে সিংহের মস্তকে হানে
চণ্ডীর হানিল বাম ভুজে।
পাইয়া দেবীর হাথ খড়্গ হইল খান সাত
ত্রিশূল ধরিয়া বীর যুঝে ॥
শূল পেলি লোকে ভুজে পৃথিবী ব্যাপিল তেজে
শূন্যে যেন সহস্র কিরণ।
চণ্ডীর উদ্দেশে পেলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
অতি কোপে অরুণলোচন ॥
দেখিয়া দৈত্যের বাণ চঞ্চল দেবীর প্রাণ
নিজ শূল ক্ষেপিল তরাসে।
সেই শূলে দৈত্যেশ্বর অস্ত গেল চিক্ষুর
মুকুন্দ রচিল চণ্ডী হাসে ॥ ● ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

চিক্ষুর পড়িল রণে হরষিত হইল মনে
দেবতা সকলে দিল জয়।
আপনা আপুনি নিন্দে চামর গজের কন্ধে
দেবতা কণ্টক মহাশয় ॥
নানা অস্ত্র ধরি ভুজে উরিলা সমর মাঝে
চণ্ডীর উদ্দেশে শক্তি এড়ে।
[২৭]চণ্ডিকা হুঙ্কার ছাড়ে যাবদ পৃথিবীতলে
নিস্তেজ হইয়া শক্তি পড়ে ॥
ব্যর্থ হইল শক্তিখান কোপে বীর কম্পমান
শূল মারে ত্রিপুরার গায়।
বাড়বানলের তুল দেখি দেবী সেই শূল
নিজ বাণে কাটিয়া পেলায় ॥
ধনুকে টঙ্কার দেই বলে বীর মোর ঠাঞি
রণভূমি আজি যাবে কোথা।
করে বাণ বরিষণ বিমুখ দেবীগণ
দেখিয়া কাটিল তার মাথা ॥
কোপে দেবীখড়্গালোফে সিংহ লাফে অতিকোপে
উঠিল গজের কুম্ভস্থলে।
টানাটানি ভুজে ভুজে চামর কেশরি যুঝে
দুজনে পড়িল মহীতলে ॥
ঘটকী চাপড় চড়ে কারে কেহ নাহি ছাড়ে
স্রোত বহে শোণিত কিঙ্কিণী।
চামর উখাস পায় হানিল সিংহের গায়
কোপে দেবী ঈশ্বরঘরণী ॥
দন্তে শুণ্ড নাহি টুটে গগনমণ্ডলে উঠে
চামর উপরে পড়ে লাফে।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে হাথে কাতি মুণ্ড হানে
চামর পড়িল দৈত্য কাঁপে ॥ ● ॥

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীগণপতি সরকার
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার
শ্রীমনোমোহন ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ২। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ ফাদার এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৩। শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, ১৪। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৬। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, ২১। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ২২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সূচি

*

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬০

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ

অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ

গঙ্গাপ্রবাহ বঙ্গদেশের প্রাণকেন্দ্র। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশের ভৌগোলিক ভাগ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই ভৌগোলিক ভাগ্যই তাহার ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়াছে। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও ছোটনাগপুরে মালভূমি ও গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া শৈলশ্রেণীবিধৃত বঙ্গপ্রান্ত সমুদ্রগর্ভে ছিল। তখন না ছিল স্নেহ-মমতাভরা শ্যামল প্রান্তর, শস্যাকীর্ণ ভূমি, না ছিল গভীর অরণ্য, না ছিল বঙ্গপ্রান্তে জীবনের কোন স্পন্দন। তখন শুধু সমুদ্রতরঙ্গ প্রতিহত হইত শৈলশ্রেণীর সানুদেশের প্রস্তরবেলায়। আর খরস্রোতা পার্ব্বত্য ঝর্ণাপ্রবাহ পর্ব্বতের ঢালু গাত্র বাহিয়া বিপুল আবেগে সমুদ্রে পড়িত। সমুদ্রের অতল গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হইল ধরণী, স্বপ্নের মায়ার মত। পার্ব্বত্য নদী-প্রবাহবাহিত পলি জমিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া সমুদ্রগহ্বরে ভূমির স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। নিত্য নব নব ভূমি সৃষ্টির ফলে সমুদ্র পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। নদীর মোহনাঞ্চলে দ্বীপের পর দ্বীপ সৃষ্টি হইয়া দ্বীপবলয় গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বীপবলয় ক্রমশঃ সাগরজলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বীপগুলির পারস্পরিক সংলগ্নতা ও দ্বীপসমূহের পরিধির বিস্তৃতি ও স্ফীতি তাহাদের মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে। সানুদেশসংলগ্ন নব-ভূমি সাগরকে দক্ষিণে সরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। সাগরের সহিত মিলন না হইলে নদীর জীবনে সার্থকতা থাকে না। অপসৃয়মান সাগরকে অনুসরণ করে নদী। সাগরের পরিত্যক্ত সঙ্কুচিত খাত দিয়া পার্ব্বত্য নদী দীর্ঘায়িত হইয়াছে সাগরকে স্পর্শ করিবার আকুল আবেগে। নব-সৃষ্ট ভূমির উপর দিয়াই এই মিলন-অভিসারের পথ রচিত হয়। এই চলার পথে ও পথের শেষে নদীপ্রবাহের গতিতে আসিয়াছে বৈচিত্র্য। প্রাণলীলায় চঞ্চল, মিলনের আনন্দের কল্পনায় বিভোরা নদী প্রাণোচ্ছল প্রবাহে নবসৃষ্ট কোমল ও নমনীয় ভূমিকে অভিসিঞ্চিত করিয়া ছুটিয়াছে। আবার হইয়াছে মিলন। কিন্তু মোহনায় দ্বীপবলয়সৃষ্টিতে মিলনের তার ছিন্ন হইলে, সাগর হয় অপসৃত, আবার সুরু হয় নদীর চলা। অনন্ত কাল ধরিয়াই যেন সাগর ও নদীর মিলন ও বিরহের অপূর্ব্ব লীলা চলিয়াছে। বঙ্গদেশের ভূমিসৃষ্টির মূল কথা এই কাব্য। জলপ্রবাহের গতি ও প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। এক যুগে সে কূলপারহীন সাগরপ্রতিম উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদী; পরবর্ত্তী যুগে তাহার প্রমত্ততা আর নাই। শান্ত শীর্ণা গাঙ্গিনিকায় সে পরিণত হইয়াছে। ক্ষীণ রজতরেখার ন্যায় যে গাঙ্গিনিকা আঁকাবাঁকা পথে বহি'তেছিল, অকস্মাৎ তাহার বুকে নামিয়া আসিল প্রমত্ত বন্যার বেগ। দুই কূল প্লাবিত করিয়া নব নব খাতে সহস্র ধারায় সে প্রবাহিত

হইতে থাকে। নদীপ্রবাহ সহজতম ও হ্রস্বতম পথটি বাছিয়া লয়। কোমল, অকঠিন ও নমনীয় ভূমির উপর দিয়া খাত রচনা সহজ। নদী নব-সৃষ্ট ভূমির উপর দিয়াই খাত রচনা করে; পুরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত নদীর যাত্রাপথে খাত পরিবর্ত্তন সহজে ও সহসা ঘটে না। একদা ত্রিস্রোতা (তি-স্তাং), করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, মহানন্দা প্রভৃতি নদ-নদী ছিল পার্ব্বত্য ঝর্ণাপ্রবাহ। পর্ব্বতের ঢালু গাত্র বাহিয়া তাহারা সরাসরি সাগরে পড়িত। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই (কপিশা বা কংসাবতী) ও সুবর্ণরেখাও ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্ব্বপ্রান্তশায়ী সাগরে মিলিত। গঙ্গাও সেই সময়ে রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সাগরে পড়িত। রাজমহল পর্ব্বতমালা ও মালদহের পার্ব্বত্য পুরাভূমির মধ্যবর্ত্তী বালুমিশ্রিত দো-আঁসলা নরম মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা একাধিক ধারায় সাগরে পড়িত। পশ্চিমবঙ্গের পুরাভূমি ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য ভূমিরই ক্রমবিস্তৃতি এবং ইহা রাজমহল হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। বর্দ্ধমান-মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগের উচ্চতর গৈরিকভূমি ইহার অন্তর্গত। এই পুরাভূমিরই পূর্ব্ব, পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থ নদীর মোহনায় নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরবঙ্গে মালদহ-রাজসাহী-দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া পুরাভূমি রেখার মত প্রসারিত। ইহা গৈরিক, প্রস্তর ও বালুকাময়। এই রেখা ও হিমালয়সানুদেশের মধ্যবর্ত্তী অংশ নিম্নভূমি, নবভূমি। হিমালয়নিঃসৃত নদ-নদী-বাহিত পলিমাটিতে এই জলাময় নব-ভূমির সৃষ্টি। পূর্ব্ববঙ্গের পুরাভূমির রূপ বিচিত্রতর। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে ও পশ্চিমে সংলগ্ন মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের গজারিবনময় গৈরিক পার্ব্বত্য ভূখণ্ড পুরাভূমি, এবং ঢাকা নগরী ইহারই দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গঙ্গা-করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ এই পুরাভূমির পশ্চিমশায়ী সাগরে নবভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণীগাত্রলগ্ন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল ও কাছার জেলার উত্তরাংশ ও শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্বাংশ পূর্ব্ববঙ্গের পুরাভূমির অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবাহিত পলিমাটির কল্যাণ-স্পর্শে এই পুরাভূমির গা ঘেঁষিয়া নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। নব-ভূমিসৃষ্টি প্রাক্-ঐতিহাস কাল হইতে টলেমীযুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ধরা যাইতে পারে। এই নব-ভূমি মোটামুটি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্বাংশ, রাজসাহী জেলার দক্ষিণাংশ, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা; এই নব-ভূমির গঠন ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে মৌর্য্য অধিকার বিস্তৃতির সাক্ষ্যস্বরূপ রহিয়াছে মহাস্থানগড়ের মৌর্য্যলিপি। প্রাচীন বঙ্গ বলিতে যে নবভূমিকে বুঝাইত, তাহা বোধ হয় তখনও মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত হয় নাই। বিভিন্ন নদীর মোহনা-মুখে এই নব-ভূমি সম্ভবতঃ দ্বীপাকারে বর্ত্তমান ছিল। দ্বীপবলয় ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী খাড়ি বা সাগর-বাহুর সঙ্কোচনে এবং দ্বীপগুলির নিত্য পলিমাটির সংযোগে কলেবর বৃদ্ধিতে দ্বীপবলয় ও মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব হ্রাস পাইতে থাকিল। নদীর মোহনাগুলি ক্রমশঃ ভরিয়া যাওয়ায় নদ-নদীগুলি সঙ্কুচিত খাড়িপথে প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া, আবার নূতন করিয়া সাগরযাত্রা

আরম্ভ করিল। টলেমীর বহু পূর্ব্বে নির্ম্মীয়মাণ বঙ্গদেশের সম্ভাব্য মানচিত্র দেওয়া হইল।

প্রাক্-টলেমীযুগের নির্ম্মীয়মাণ বঙ্গদেশ
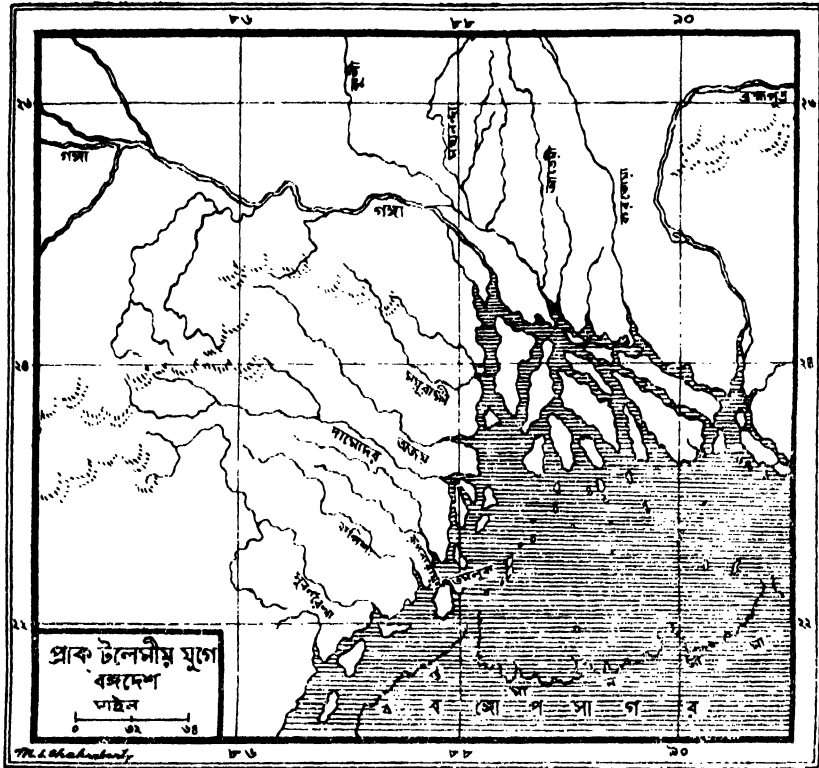
প্রাক্‌টলেমী যুগ দ্বারা প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল হইতে মৌর্য্য আমল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। মৌর্য্যযুগে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ও লাতিন ইতিহাসকার ও ভৌগোলিকগণ বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা অল্পবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণে বর্ণিত ও টলেমীর মানচিত্রে অঙ্কিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিতে হইলে, মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে বা সমকালে বঙ্গদেশ কিরূপ ছিল, তাহাই বক্ষ্যমাণ মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। মানচিত্রে গঙ্গা, কৌশিকী, আত্রেয়ী ও করতোয়ার মোহনা, আধুনিক কালের পদ্মাপ্রবাহ তখনকার সাগরবাহু বা খাড়িতে। মোহনাসমূহের দক্ষিণে দ্বীপশৃঙ্খল তখনকার নির্ম্মীয়মাণ বঙ্গ। উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ও গঙ্গা নূতন প্রবাহপথ রচনা করিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস পাইতেছিল। মানচিত্রে চিহ্নিত খাড়িগুলিই নদীর প্রবাহপথে পরিণত হইল। ১নং খাড়িপথে মহানন্দা, আত্রেয়ী, করতোয়ার বারিরাশি লইয়া কৌশিকী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিল। ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং খাড়িপথে গঙ্গা সাগরে পড়িল। ৭নং খাড়ি

বেশী দিন গঙ্গার প্রবাহধারা বহন করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ ইহার খাত শুষ্ক হইয়া গাঙ্গিনিকায় পরিণতি লাভ করিল।

ভূমির সৃষ্টি ও গঠন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। নিয়ম ও রীতির বাহিরে ইহার সম্ভাব্যতা কল্পনা করা যায় না। গঙ্গার নূতন প্রবাহপথে সাগরসঙ্গম নূতন ভৌগোলিক অবস্থা সৃষ্টি করিল। আবার এই সময়ে কৌশিকীর উর্দ্ধ প্রবাহে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ফলে, নিম্নপ্রবাহ বার বার খাত ত্যাগ করিয়া অবশেষে পশ্চিমতম প্রবাহে রাজমহলের পশ্চিমে গঙ্গায় আসিয়া মিশিল। কৌশিকীর নিম্ন প্রবাহে করতোয়া সাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মধ্যপ্রবাহপথে আত্রেয়ী আপনাকে মিলিত করিল করতোয়ায়। গঙ্গা কালিন্দীখাতে কৌশিকীর বাকী প্রবাহপথ কুক্ষিগত করিল। বঙ্গদেশে কৌশিকী ও গঙ্গার আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে কৌশিকী পরাজিত ও পলায়নপর হইলে, গঙ্গাপ্রবাহ বঙ্গদেশের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া লইল। ইহাও মৌর্য্যযুগ আরম্ভ হইবার অনেক আগের কথা। বঙ্গের ভূমিগঠনে গঙ্গার অবদানই বেশী। অন্যান্য নদ-নদী এই সৃজনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। বঙ্গের কোন্ অংশ কোন্ সময় গঠিত হইয়াছে, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। প্রাচীন বঙ্গের কোন ধারাবাহিক প্রামাণিক ভৌগোলিক ইতিবৃত্তও নাই। প্রাচীন অথর্ব্ববেদে, জৈন গ্রন্থে, বৌদ্ধ গ্রন্থে, রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের জনপদ ও নদ-নদীর বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের নির্ভরযোগ্য ভূগোল রচনার পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বিবরণে বর্ণিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক নির্দ্দেশ, টলেমীর মানচিত্র, পেরিপ্লাসপ্রমুখ নাবিকগণের বিবরণ প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা নির্ণয়ের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব তথ্যও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রপট্টগুলিতে নগরী, গ্রাম, জনপদ, নদ-নদীর উল্লেখ আছে। ইহাদের ভৌগোলিক তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। সমসাময়িক কালের ও পরবর্ত্তী কালের কাব্য-সাহিত্যে জনপদ, নগরী ও নদ-নদীর কাহিনী পাওয়া যায়। অলঙ্কার, অর্থগৌরব ও বল্গাহীন কল্পনার অন্তরাল হইতে তাহাদের প্রকৃত ভৌগোলিক তাৎপর্য্য উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। তবু, আহরিত সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচার করিয়া যুক্তিগ্রাহ্য একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের প্রাক্-টলেমীয় ভৌগোলিক অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতির আভাস টলেমীর মানচিত্রে আছে। টলেমী ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে রহিয়াছে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা এখন নাই। যেখানে অহরহ ভূমির ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, সেখানে ভৌগোলিক অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। অতএব দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে টলেমীবর্ণিত গঙ্গার মোহনা যেখানে ছিল, আজ নিশ্চয়ই সেখানে নাই; থাকিতে পারে না। এই দীর্ঘকাল গঙ্গা ও তাহার বিভিন্ন শাখা নদ-নদীগুলি নীরব নিথর হইয়া থাকে নাই। দুই হাজার বৎসর ধরিয়াই গঙ্গাপ্রবাহ অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। নূতন ভূমি সৃষ্টির ফলে, টলেমীর আমলের মোহনা নবভূমির

অন্তরালে বিলুপ্ত; আর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে গঙ্গাপ্রবাহ নূতন মোহনা সৃষ্টি করিয়া সাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং ক্যাম্বিসন, মেগা, কাম্বেরীখন, সুয়েডোষ্টমন ও এ্যান্টিবোল প্রমুখ টলেমীবর্ণিত পঞ্চ শাখা ও মোহনা গঙ্গার বর্ত্তমান মোহনাসমূহের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। টলেমীর যুগে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশপরগনা, খুলনা ও বরিশাল জেলার বেশীর ভাগই ছিল না। নদীয়ার দক্ষিণ ভাগে, যশোহরের উত্তর ভাগে, এবং ফরিদপুর জেলার দক্ষিণভাগে সমুদ্রবেলাভূমি বিস্তৃত ছিল। সুতরাং টলেমীর গঙ্গার পঞ্চ মোহনার সন্ধান এখানেই মিলিবে। অনেকে এ ভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহারা সুবর্ণরেখামুখ বা কপিশামুখ বা হুগলীমুখ, রায়মঙ্গলমুখ, হরিণঘাটামুখ, মেঘনামুখ, বুড়ীগঙ্গামুখকেই টলেমীর পঞ্চ মোহনা মনে করিয়া থাকেন। ইহা নিছক কল্পনা মাত্র। ভূতত্ত্বের দিক্ হইতে এই প্রস্তাব একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং একান্ত অচল। তাহা ছাড়া কিছু দিন পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের উপকূলভাগ এইরূপ ছিল না। মুসলমান যুগের বহু পুঁথিতে—ঐতিহাসিক বিবরণ, বিদেশী পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী ও ইউরোপীয় বণিক্ ও নাবিকের বিবরণ ও মানচিত্রের বঙ্গদেশের সহিত বর্ত্তমান কালের বঙ্গদেশের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর উপকূলরেখা হইতে এখনকার উপকূল অনেক দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এবং টলেমীর ক্যাম্বিসন, ইহাই প্রচলিত ধারণা। অনেক ঐতিহাসিক এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। প্রমাণ-পঞ্জীকেও এই ধারণাকে ঐতিহাসিক রূপ দিবার জন্য বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ভাগীরথী তথা গঙ্গার প্রধান প্রবাহ অধুনালুপ্ত সরস্বতীখাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, রূপনারায়ণ ও কপিশার জলধারা লইয়া সুবর্ণরেখার মুখে গিয়া পড়িত। মতান্তরে কপিশামুখে ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম হইত। এই প্রবাহ ও মোহনাই টলেমীর ক্যাম্বিসন। এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ সরস্বতীখাত টলেমীর যুগে ছিল না। ঐ সময়ে ইহা ছিল সাগর। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে সাগর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাব বিজ্ঞানসম্মত নহে। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরস্বতী-খাত ছিল, তাহা হইলে ভাগীরথীর সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে। সুবর্ণরেখা-প্রবাহ পুরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত; সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চল নব-ভূমি, নিম্নভূমি। নদীপ্রবাহ নিম্নভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাক্-টলেমী যুগে সাগর অনেক অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। টলেমীর যুগে সাগর সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সরিয়া আসিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্বাঞ্চল দিয়া গঙ্গা হইতে উৎসারিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দেখা যায়। তাহারই পশ্চিমতম প্রবাহটি সোজা দক্ষিণে আসিয়া মিলিত হয় জলঙ্গীর সঙ্গে। এই মিলিত প্রবাহই ক্যাম্বিসন। এখনকার নবদ্বীপের নিকট তাহা সাগরে মিশিত। মাথাভাঙ্গা-ইছামতীপ্রবাহ ও মোহনাকে টলেমী "মেগা" অভিধায় অভিহিত করিয়াছেন। কপিলমুনি পাইকগাছা,—যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ—বোধ হয়, "মেগা-সঙ্গমে"র ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। কুমার বা কৌমারক

প্রবাহ ও মোহনা টলেমীর মানচিত্রে "কাম্বেরীখন" পরিচিতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক খুলনা নগরীর উপরে কৌমারক মোহনা ছিল। পদ্মা হইতে উৎসারিত আড়িয়লখাঁ নদীর প্রবাহ ও মোহনাই "সুয়েডোষ্টন"। পদ্মাপ্রবাহ ও মোহনাকে টলেমী এ্যান্টিবোল বলিয়াছেন। পদ্মার প্রবাহ টলেমীর যুগে এইরূপ ছিল না; এমন কি, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহার নিম্নপ্রবাহ অন্যরূপ ছিল। বর্ত্তমান খাত হইতে আরও পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহেদীগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় সাগরে পড়িত। ব্রহ্মপুত্রের দুর্ব্বার প্রবাহ পদ্মার প্রবাহকে ঠেলিয়া উজান বহাইত বলিয়াই বোধ হয়, টলেমী গঙ্গার এই মোহনাকে এ্যান্টিবোল (thrown back) বলিয়াছেন। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্বকালের ভৌগোলিক অবস্থার ক্রমপরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া টলেমীযুগের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অঙ্কিত করা গেল।

টলেমীর যুগের বঙ্গদেশ

গঙ্গারিডি গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বর্ণিত গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের জন ও জনপদের নাম। গঙ্গারিডি বোধ হয় "গঙ্গা-হৃদয়ী"র গ্রীক রূপ। গঙ্গাহৃদয়-বিধৃত বা গঙ্গা-প্রবাহ যে দেশের হৃদয়-স্বরূপ, এমন অঞ্চলকেই গঙ্গাহৃদয়ী বলা যায়। গঙ্গার শাখা-প্রশাখা এই জনপদের প্রাণপ্রবাহ। এই জনপদের উভয় প্রান্তে ও মধ্যভাগে গঙ্গার বিভিন্ন শাখা প্রবাহিত ছিল। মেগাস্থিনিস গঙ্গাকে গঙ্গারিডির পূর্ব্বপ্রান্তবাহী বলিতেছেন। ডিওডোরসের

উক্তি : "This river (Ganges) which is 30 stades in width flows from north to south and empties into the ocean forming the boundry towards the east of the tribe of the Gangaridae…"ও কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেয় না। সুতরাং অনেকেই ভাগীরথী প্রবাহকেই গঙ্গা মনে করেন। তাঁহাদের মতে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই গঙ্গারিডি। ডিওডোরসের পরবর্ত্তী উক্তি কিন্তু অস্পষ্টতা রাখে নাই।"…This region is separated from Further India by the greatest river in those parts, for it has a breadh of 30 stades but it adjoins the rest of India which Alexander had conquered"—ডিওডোরসের এই উক্তি গঙ্গা প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। এই প্রবাহ এক দিকে Further India,—অর্থাৎ পেরিপ্লাসের Chryse ও গঙ্গারিডিকে বিযুক্ত করিতেছে; অপর দিকে আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক বিজিত উত্তরভারতের সহিত গঙ্গারিডির যোগাযোগ অব্যাহত করিতেছে। গঙ্গা-পদ্মা প্রবাহই গঙ্গারিডির পূর্ব্বসীমা। টলেমীর ভূগোলে ক্যাম্বিসন গঙ্গারিডির পশ্চিমপ্রান্তশায়ী। মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমা, নবদ্বীপ জেলার উত্তর অংশ, যশোহর জেলার উত্তর ভাগ, ফরিদপুর জেলা ও ঢাকা জেলার পশ্চিম ভাগ, রাজসাহী ও মালদহ জেলা লইয়া গঠিত বিস্তৃত অঞ্চলই প্রাচীন কালের গ্রীক ও লাতিন ইতিহাসকারগণ-বর্ণিত গঙ্গারিডি। মেগাস্থিনিসের বিবরণে ইঙ্গিত আছে যে, গঙ্গা গঙ্গারিডির মধ্য দিয়াই সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। টলেমীর মানচিত্রেও তাহার সমর্থন রহিয়াছে।

গঙ্গাহৃদয়বাসী জন বঙ্গজন। গ্রীক ও লাতিন ভৌগোলিকগণ কৌম বা জনের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা নদীর নামেই জনপদ ও জনের পরিচিতি দিয়াছেন। বেশীর ভাগ লেখকেরই এই জন ও জনপদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থে বঙ্গদেশের উপকূলরেখা, গঙ্গার মোহনা ও গঙ্গানদীপ্রবাহের উপর অবস্থিত গঙ্গাবন্দরের উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাসের বিবরণে গঙ্গার প্রধান মোহনার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল :

"After these, the course turns towards the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, the Ganges comes into view, and near it the very last land toward the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges, and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market-town which has the same name as the river, Ganges. Through this place are brought malabathrum and Gangetic spikenard and pearls, and muslins of finest sorts, which are called Gangetic."

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ধরিয়া পেরিপ্লাস অগ্রসর হইতেছিলেন। বঙ্গদেশের দীর্ঘ উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা আজ যাহা আছে, টলেমী ও পেরিপ্লাসের আমলেও তেমন ছিল

অনুমান করিলে,—পেরিপ্লাস পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূল ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, মানিয়া লইতে হইবে। আর হুগলী মোহনায়ই তাঁহার গঙ্গাদর্শন লাভ হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। পেরিপ্লাসের গঙ্গাপ্রবাহ ও বন্দরের পথনির্দ্দেশ সুস্পষ্টভাবে এই অনুমানকে অসম্ভব করিয়াছে। হুগলী মোহনায় গঙ্গার দর্শন সম্ভব হইলে, গঙ্গানদীতে পড়িতে হইলে জাহাজকে উত্তরাভিমুখী হইতে হইত। তাহা সম্ভব নয়। উপকূল ধরিয়া জাহাজ উত্তরাভিমুখী চলিলেই তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বদিকে গতি ফিরানো সম্ভব। তাহা হইলেই পূর্ব্বাভিমুখী জাহাজের বাম দিকে থাকে বিলীয়মান তটরেখা, আর দক্ষিণে থাকে জলধি-বিস্তার। এই ভাবে চলিবার পরই গঙ্গামোহনার সাক্ষাৎ লাভ হয়। পেরিপ্লাসের গঙ্গা, গঙ্গার দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখী প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। এই শাখার তীরেই গঙ্গাবন্দর। টলেমীর মানচিত্রে গঙ্গাবন্দর Kambhenikon শাখার উপরে দেখান হইয়াছে। পেরিপ্লাসের বিবরণে ইহারই সমর্থন রহিয়াছে।

পেরিপ্লাস গঙ্গার এই শাখার পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত অঞ্চলকে Chryse বলিতেছেন। টলেমিও গঙ্গার পঞ্চমোহনাবিধৃত গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদির পূর্ব্বশাখী অঞ্চলকেও Chryse নামে অভিহিত করিতেছেন। Chryse অর্থ সুবর্ণভূমি। এই অঞ্চলে প্রচুর সুবর্ণ আমদানী হইত বা পাওয়া যাইত, কিম্বা ব্যবসায়ী গ্রীক বণিক্ ও নাবিকেরা আশাতীত লাভ অর্জ্জন করিতে পারিত বলিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চল গ্রীকগণের নিকট ছিল স্বর্ণপ্রসূ দেশ। এখনও ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহের উভয় তীরের বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চলকে সোনারগাঁ পরগণা বলে। সেন-আধিপত্যের অবসানের অব্যবহিত পরে সোনারগাঁ একটা স্বাধীন রাজ্য ছিল। সুলতানী আমলেও সোনারগাঁ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যরূপে অনেক দিন বর্ত্তমান ছিল। সোনাকান্দা-বন্দর সোনারগাঁর পশ্চিম প্রান্তসংলগ্ন। বিক্রমপুরে ও ফরিদপুরে স্বর্ণগ্রাম, সুবর্ণবীথির প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে নদী-বাহিত পলিতে প্রচুর স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম যাহাই থাকুক না কেন, ইহাকে গ্রীক ও পরবর্ত্তী কালের নাবিক ও বণিকেরা স্বর্ণভূমিই বলিত; বিদেশীদের প্রদত্ত নাম দেশীয়গণের নিকট অগ্রাহ্য মনে হয় নাই। পেরিপ্লাসের বিবরণ অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সাগরশাখী অংশই Chryse বা সুবর্ণভূমি।

তিরুমলয়-লিপি আর একটি প্রশ্ন তুলিয়াছে। দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ় জয়ের মাঝখানে চোলরাজের বঙ্গালদের সহিত লড়াই হয়। এই লড়াই কোথায় হয়? দক্ষিণ ও উত্তর-রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী কোন অঞ্চল কি বঙ্গালরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল? না, দক্ষিণরাঢ় জয় করিবার পর চোলরাজ সাগর অতিক্রম করিয়া বঙ্গাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন? দক্ষিণ-রাঢ়ের পরাজিত শত্রু ও সুযোগ-সন্ধানরত উত্তররাঢ়ের পাল-সম্রাট্‌কে পার্শ্বে রাখিয়া চোলরাজ নিশ্চয়ই সাগর অতিক্রম করিবার প্রয়াস করেন নাই। তমলুক হুগলী হাওড়া তখন দ্বীপরূপে সবে মাত্র উত্থিত হইয়াছে। রূপনারায়ণ ও দামোদর-মোহনার বিরাট্

দ্বীপাঞ্চল বঙ্গালদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। এই অনুমানের সমর্থন রহিয়াছে লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলিতে। তাম্রপট্টোলিতে উল্লিখিত বেতড্ডচতুরক আধুনিক বেতড়। বেতড় হাওড়া জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। লক্ষ্মণসেনের আমলে হাওড়া ও হুগলীকে পশ্চিমখাটিকা বলা হইতেছে। মোহনাযুগে পলিমাটিগঠিত দ্বীপসমূহ আকারে বাড়িয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইতেছিল। দ্বীপমধ্যবর্ত্তী সাগরবাহু সঙ্কুচিত হইয়া খাড়িতে পরিণত হইবার ফলে, তাহাদের সহিত মূল ভূখণ্ডের দূরত্বও কমিতেছিল। বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চলের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা সেন-আমলে বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইল। আর পূর্ব্বার্দ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেন-আমলের শেষ দিকে এই ভাবে বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চল মূল ভূখণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করিবার ফলে, সাগরবাহু সঙ্কুচিত হইয়া গেল; আর সাগরের সঙ্কুচিত খাতপথে গঙ্গার kambyson শাখা, যাহা সেন-আমলে ভাগীরথী গঙ্গা—দীর্ঘায়িত হইয়া ত্রিবেণীর নিকট দ্বিধা বিভক্ত হইয়া হুগলী ও যমুনাখাতে প্রবাহিত হইল। কিছু দিন পর, সম্ভবত দিল্লীতে সুলতানি সুরু হইবার পর, হুগলীপ্রবাহ পশ্চিমখাটিকা ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত খাড়িপথে সাগরযাত্রা করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও হুগলীপ্রবাহ অব্যাহত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ রাঢ় ও সুহ্মের পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্রের অবস্থিতি ছিল দেখান হইয়াছে। টলেমীর বহু পরে রাঢ়ের পূর্ব্বপ্রান্তীয় সাগরের পরোক্ষ উল্লেখ কাব্য-সাহিত্যে ও তাম্রপট্টোলিতে আছে। মহাভারতে সুহ্ম ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতিগুলিকে সমুদ্রতীরবাসী বলা হইয়াছে। রঘুবংশেও সুহ্মগণের সমুদ্রতীরে বাসের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট। হারহা-তাম্রশাসনে গৌড়গণের সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইবার কথা আছে। গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গৌড়েরা গঙ্গার বদ্বীপে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। বোধ হয়, মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষই তাহাদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের খালিমপুর-শাসনে স্থালীকট্টবিষয়ের সহিত যুক্ত ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের উল্লেখ আছে। কালনা মহকুমার পূর্ব্বস্থলীর স্থালীকট্টের স্মৃতি বহন করা অসম্ভব নহে। স্থালী বা স্থলী পাল-আমলে একটা বড় শাসনবিভাগ ছিল; পরবর্ত্তী কালে ইহার রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা থাকে নাই। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অভিধার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। যথা, পূর্ব্বস্থলী ব্রহ্মস্থলী ইত্যাদি। এই স্থালী অঞ্চলের সাগরশায়ী অংশের নামই বোধ হয় খালিমপুর-শাসনের ব্যাঘ্রতটী। তিরুমলয়লিপি রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের বিবরণ দিয়াছে। দণ্ডভুক্তি ও দক্ষিণরাঢ় জয় করিয়া রাজেন্দ্র চোল বঙ্গরাজের সহিত লড়াই করেন। পরে তিনি উত্তররাঢ়ে উপস্থিত হইলেন। উত্তররাঢ়কে তিরুমলয়-লিপিতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ উত্তররাঢ়কে সমুদ্রতীরশায়ী দেখাইবার জন্য উত্তররাঢ়কে দক্ষিণে প্রসারিত করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ের কথা তখন তাঁহাদের মনেও ছিল না! কিন্তু তাহা ত নয়। তিরুমলয়লিপি দক্ষিণরাঢ়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছে। দামোদর-প্রবাহোত্তর রাঢ়ই উত্তররাঢ়; কালনা মহকুমাও তাহার অন্তর্গত।

কালনার পূর্ব্বপ্রান্তেই সাগর ছিল। ইহাই তিরুমলয়লিপির ভৌগোলিক নির্দ্দেশ। দেখা যাইতেছে, একাদশ শতাব্দীর সূচনাতেও সাগর কালনা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সুতরাং টলেমীর যুগে গঙ্গা-ভাগীরথীপ্রবাহের সরস্বতীখাতে প্রবাহিত হইয়া সুবর্ণরেখা-মুখে সাগর-যাত্রা একটা উদ্ভট কল্পনামাত্র।

সেন-আমল আরম্ভ হইবার সময়ও গঙ্গাভাগীরথী প্রবাহ হুগলীখাতে প্রবাহিত হয় নাই। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর-পট্টোলিতে ইহারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। এই পট্টোলিতে উল্লিখিত "ঘাসিসম্ভোগভট্টবাড়" গ্রামকে অনেকেই "ভাটপাড়া" মনে করেন। ভাটপাড়া নৈহাটির নিকট গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু বিজয়সেনের আমলে ভাটপাড়া (যদি ঘাসিসম্ভোগভট্টবাড় ও ভাটপাড়া অভিন্ন মনে করা হয়) 'বিখণ্ড' নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং হুগলী-প্রবাহের এই অংশে যদি ভাগীরথী-প্রবাহ প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সে কথা উল্লেখ করা হইত। গোবিন্দপুর-পট্টোলিতে বেতড়ের পূর্ব্বপ্রান্তবাহী প্রবাহকে জাহ্নবী বলা হইয়াছে। ইহা একটি খাড়িবিশেষ। যদি ইহা গঙ্গার প্রবাহ বহন করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব অন্ততঃ বিজয়সেনের আমলে হুগলীখাতে গঙ্গার কোন শাখা যে প্রবাহিত হইত না, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল, ইহা প্রমাণ করিবার অতিরিক্ত আগ্রহ অনেকেই দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সেন-আমলের অবসান ও মুসলমান আমলের সুরুতে গঙ্গার মোহনা দক্ষিণে সরিয়া যায়। ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম ঘটিত, ইহাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গা-প্রবাহের আগমন ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এই সময়েই ভাগীরথী প্রশস্ততর নদীরূপে ও গঙ্গার শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীয়ার নিকট গঙ্গার অন্যতম প্রধান শাখা ক্যাম্বিসন, আধুনিক জলঙ্গীর সহিত মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ ভাগীরথী-গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে ভাগীরথী ক্ষীণকায়া গঙ্গার ক্ষুদ্রতম একটি শাখামাত্র ছিল। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট-তাম্রশাসনে, ধর্ম্মপালের তাম্রপট্টোলি ও লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে উল্লিখিত গাঙ্গিনিকা এই বর্ত্তমান কালের ভাগীরথীর প্রাচীন রূপ। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলের জলের অভাব দূর করিবার প্রয়োজনে গঙ্গার জলধারা অধিক পরিমাণে গাঙ্গিনিকা খাতে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অঞ্চল দিয়া গাঙ্গিনিকা প্রবাহিত ছিল, তাহার নাম শক্তিপুর-পট্টোলিতে বাগরী-খণ্ড। বাগরী কৌম অধ্যুষিত জনপদের মধ্য দিয়া গাঙ্গিনিকা বহিত বলিয়া, ইহার দেশজ নাম হয়ত ছিল বাগরী-তি। তি অনার্য্য শব্দ,—অর্থ নদী। বাগরী-তির সংস্কৃত রূপই ভাগীরথী। গঙ্গার প্রবাহ নবখনিত গাঙ্গিনিকাখাতে বহিতে লাগিল। ইহাই গঙ্গার প্রধান শাখারূপে পরিচিত হইল। এই সময়ে জলঙ্গীখাত ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। বাগরী-তি বা ভাগীরথীই প্রবলতর হইয়া জলঙ্গীপ্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া সাগরযাত্রা আরম্ভ করিল। বাগরী জনপদ হইতে খনিত গাঙ্গিনিকার যেমন ভাগীরথী নামকরণ

হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমন রাজা বা রাজকর্ম্মচারী বা পূর্ত্তকবিশারদ শিল্পী (engineer), যাঁহার নায়কত্বে বিরাট্ খননকর্ম্ম সমাধা হইয়াছে, তাঁহার নামেও ভাগীরথীর পরিচিতি হওয়া অসম্ভব নহে। মোট কথা, ভাগীরথীপ্রবাহ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রতিভা।

প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও জনপদসমূহের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা একটি দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক প্রমাণপঞ্জীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কল্পনার আশ্রয়ও মাঝে মাঝে লইতে হয়। কিন্তু অযৌক্তিক কল্পনার অবশ্য কোন মূল্য নাই। গঙ্গাপ্রবাহের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার প্রবাহ-খাত ও গতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কোন বিশেষ মতকে রূপ দিবার চেষ্টা অবাঞ্ছিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত ছিল, এবং এই প্রবাহই যে ভাগীরথী, ইহা ধরিয়া লইয়া অনেকে প্রমাণপঞ্জী নিজ নিজ মতের সমর্থনে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। ভাগীরথীকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদিকে ঠেলিয়া রাঢ়ে লইয়া যাওয়া সহজ। ভাগীরথীই ত টলেমীর ক্যাম্বিসন, ইহাই তাঁহাদের মত। রাজমহল-শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পার্ব্বত্য ভূমির তলদেশ দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত ঝিল বিল নালা কাহারও মতে প্রাচীন ভাগীরথীর প্রবাহখাত। বিল-ঝিল-নালা দেখিলেই তাহাকে কোন নদীর পরিত্যক্ত খাত, শুধু নব-ভূমির ক্ষেত্রেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাগীরথীর পক্ষে নিম্নভূমি হইতে উচ্চতর মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়া ভূবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া একেবারেই অসম্ভব। গঙ্গার খাত হইতে ভাগীরথীর উৎসমুখ অনেক উচ্চ। একমাত্র বর্ষাকালে যখন গঙ্গার প্রবাহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দেয়, শুধু তখনই ভাগীরথীখাতে সামান্য জল প্রবেশ করে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি পুরাভূমি,—গৈরিক পার্ব্বত্য ভূমি। আর গঙ্গা প্রবাহিত কোমল দোআঁশলা নবভূমির উপর দিয়া। নদীপ্রবাহ প্রাকৃতিক নিয়মে নিম্নভূমির উপর দিয়া খাত রচনা করে। বর্ষায় প্লাবিত গঙ্গার জলরাশির কিছু অংশ সূতি-জঙ্গীপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ষার অবসানে ইহার শুষ্ক খাত হইত গাঙ্গিনিকা। ইহাই ত স্বাভাবিক।

ভাগীরথী, গঙ্গার প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। এই জন্য গঙ্গার মাহাত্ম্যের অধিকারিণী, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনেকে মনে করেন। পদ্মা বা পদ্মাবতী গঙ্গার অর্ব্বাচীন শাখা,—এই কারণে তাহার কোন মাহাত্ম্য নাই, ঐতিহ্যও নাই, এই ধারণারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। টলেমী যুগের ও প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও জনপদসমূহের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা একটি দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীন ও আধুনিক কালের তথ্যের অস্পষ্টতার দরুন কল্পনার আশ্রয় লওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কল্পনা যুক্তিকে অনুসরণ করিবে। বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কল্পনাকে নিয়োগ করা অবাঞ্ছিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং এই প্রবাহই যে ভাগীরথী, ইহা ধরিয়া লইয়া প্রমাণপঞ্জী বিন্যাস করিয়া অনেকেই নিজ নিজ মত

প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গঙ্গারিডি এই প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ইহাই তাঁহাদের মত। কেহ কেহ রাজমহল-শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পার্বত্য ভূমির তলদেশ দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত ঝিল-বিল-নালাকে ভাগীরথীর প্রাচীনতম খাত বলিয়াছেন। এই প্রস্তাব অবাস্তব ও ভূবিজ্ঞানবিরোধী। গঙ্গার খাত হইতে ভাগীরথীর উৎসমুখ অনেক উচ্চ। বর্ষাসমাগমে গঙ্গার জল ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিলেই ভাগীরথীখাতে জল প্রবেশ করে। গঙ্গা নরম ও নমনীয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া গঙ্গার পুরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত হওয়া অসম্ভব। গঙ্গার এই শাখা প্রাচীন কাল হইতে জঙ্গীপুরের উচ্চ গৈরিক পুরাভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মরুনদীর মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথী গঙ্গার ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য দখল করিয়া লইয়াছে। ইহা অনেকটা জবর-দখল। গঙ্গার ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যের উত্তরাধিকার গঙ্গার সকল শাখারই সমান প্রাপ্য। যদি বলা হয়—ভাগীরথা প্রাচীনা, এই কারণে সবটুকু মাহাত্ম্যই তাহার ; তাহা হইলে বলিব, ভাগীরথী প্রাচীনতম খাত নহে, বরঞ্চ অর্ব্বাচীন। ইহা প্রধান প্রবাহও নহে। পদ্মা-কাম্বেরীখনই প্রধান শাখা। কি করিয়া ভাগীরথী অর্ব্বাচীন হইয়াও, অপর সকল শাখাকে বঞ্চিত করিয়া, গঙ্গার সবটুকু মাহাত্ম্য আত্মসাৎ করিল ? টলেমী ও পেরিপ্লাসের মতে পদ্মা-কাম্বেরীখন গঙ্গার প্রধান প্রবাহ, তীর্থমহিমা প্রাপ্য ইহারই। প্রবাদ আছে : মানুষের মুখেই জয়, মানুষের মুখেই ক্ষয়। পাল-আমল ছিল বঙ্গদেশে বৌদ্ধ যুগের আমল। বৌদ্ধ যুগে হিন্দু ছিল ; কিন্তু তাহারা ছিল মুষ্টিমেয় ও নির্জীব। বৌদ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার মাহাত্ম্য লইয়া বৌদ্ধরা মোটেই মাথা ঘামাইত না। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। দক্ষিণ হইতে বিভিন্ন আক্রমণকারীর সহিত অনেক হিন্দু আসিয়া রাঢ়ে রহিয়া গেল। সেন-রাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাঁহাদের পূর্ব্বের শূর-রাজারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন চাহিয়াছিলেন। শূর ও সেন-রাজারা পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লবের সূচনা করিলেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী, বল্লালী কৌলীন্যের গল্পকথা, আর লক্ষ্মণসেনের বৈষ্ণবধর্ম্মসম্পর্কিত আগ্রহ এই বিপ্লবের ইঙ্গিতই জানায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সকলকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নূতন করিয়া ধর্ম্মকাহিনী রচিত হইতে লাগিল। নবখনিত ভাগীরথীখাতে গঙ্গাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া গঙ্গার সমস্ত মাহাত্ম্য ভাগীরথার উপর আরোপ করা হইল। গঙ্গা-স্নান সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গীভূত হইল। গঙ্গা-স্নানের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার কারণ, অর্ব্বাচীন-খাতকে পবিত্রতম বলিয়া গ্রহণ করাইবার প্রচেষ্টা। ব্যারাকপুর ও গোবিন্দপুর-পট্টোলি হইতে জানা গিয়াছে, দ্বাদশ শতাব্দীর ভাটপাড়া হইতে বেতড় পর্য্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথী ছিল না। ভাটপাড়ায় "ত্রিখণ্ড," আর বেতড়ে জাহ্নবী। জাহ্নবীকে মোটেই পবিত্র বলা হয় নাই। এই প্রবাহের উপর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নাই। ভাগীরথী গঙ্গার প্রশস্তি ধোয়ীর কাব্যেই প্রথম পাওয়া গেল। এই সময়ে গাঙ্গিনিকা ভাগীরথী হইয়াছে। বৌদ্ধসংস্পর্শে পদ্মা তখন অপাংক্তেয়। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ফলে, রাঢ় অঞ্চলে নব-হিন্দুত্বের প্লাবন আসায় অর্ব্বাচীন ভাগীরথীর মাহাত্ম্য লোকমুখে গীত হইতে লাগিল। সেন-আমলে সংস্কৃতির কেন্দ্র বঙ্গ হইতে রাঢ়ে স্থানান্তরিত হইল।

এই প্রবন্ধে শুধু ভাগীরথীপ্রবাহের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল। অন্যান্য প্রবাহপথের আলোচনা সময়ান্তরে করার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা ভাষায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪। **বিদ্যাসুন্দরের দর্শন ও সমাগম সম্বন্ধে পরামর্শ**

ক। বিদ্যা কর্তৃক মালিনীকে বিনয়।

আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে লিখিত আছে, মালিনী সুন্দর কর্তৃক রচিত মালা বিদ্যাকে উপহার দিলে, বিদ্যা যখন মালা লইয়া হরগৌরীর পাদপদ্মে উপহার দিলেন, তখনই যেন দৈব বলে মালার রচক সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইল—

"দণ্ডবৎ করি কন্যা রহিল ঐমনে।
লজ্জায় উঠিয়া বৈসে চাহে সখি পানে॥
কহ গো কহ গো (তুমি) শুন মালিয়ানী।
এ ফুল গাঁথিলা কে বা কহ দেখি শুনি॥"

মালিনী কহিল যে, সুন্দর নামে তাহার এক বুহিনীনন্দন তাহার গৃহে আসিয়াছে; সেই এই মালা গাঁথিয়াছে। বিদ্যা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তখন সে স্বীকার করিল—

"মাল্যানী বলেন কন্যা মোর কিবা ওর।
সার্থক পূজিলা তুমি ভবানীশঙ্কর॥
কত কাল ছিল কন্যা তোমার আরাধনা।
যে কারণে পাইলা বর মনের বাসনা॥
যেন রূপ তেন গুণ বিদ্যার নাহি অন্ত।
ধর্মেতে ধার্মিক বড় অতি গুণবন্ত॥
মরেছিল মালঞ্চ মোর এ বারো বৎসর।
কুমারের অনুভাবে ফুটিল সত্বর॥
শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জরিল দেখি চিত্রময়।
মানুষের শকতি কন্যা যেমত কভু নয়॥
মরিলে জীয়াতে পারে হারালে পারে দিতে।
কুমারের গুণ ধর্ম না পারি বলিতে॥"

এই সব কথা শুনিয়া যখন বিদ্যার অঙ্গ অবশ হইল, তখন তাঁহার সখী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে তাহার সহিত কথাবার্তা ও দেখাশুনা

হইতে পারে। মালিনী তাহার কোন সদ্‌যুক্তি দিতে না পারায় চিত্ররেখা তাহাকে এই পরামর্শ দিল—

"ফুলের দোলা দেহ গিয়া মহাপ্রভুর তরে।
সঙ্গীত বেড়াও তুমি নগরে নগরে॥
এই চিহ্ন থাকে যেন কুমার সুন্দর।
শঙ্খ ঘণ্টা হাতে দিব্য…চামর॥"

কৃষ্ণরাম ও তাঁহার অনুকরণে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, মালা দেখিয়া ও লিখন পড়িয়া বিদ্যা উৎকণ্ঠিতা হইলে সখীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বিদ্যার এই উৎকণ্ঠাবস্থা কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ "মালাদৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা" শীর্ষক একটি প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়াছেন। বিমলা তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে সে দিন আর কিছু বলা হইল না। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

"মালাটি লইয়া হাতে সুন্দর লিখন তাতে
যত্ন করি পড়িল সকল।
বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখীগণে শুনি কুতূহল॥
বাসনা নাই যে খাই বসিতে না পারে রাই
শুইলে দ্বিগুণ বাড়ে জ্বালা।
বিফল হইল অতি প্রভাত হইলে রাতি
প্রাণ পাই দেখিলে বিমলা॥"

রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—

"স্নান করি বিধুমুখী হৃদয়ে পরমসুখী
পূজে ইষ্ট দেবতা সারদা।
চিকন গাঁথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা তার
ধ্যান জ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই পুরুষ রতন সেই
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউ যায়
সখী প্রতি কহে চুপে চুপে॥
'হেদে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই
ফিরা আমি পায় ধরি তার।

যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ
শুনি গো সকল সমাচার ॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই বুঝি বা তেমন নাই
বিদ্যাধর ধরণী মণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্না হইলা শ্যামা
বিধু মিলাইলা করতলে ॥'
সখী কয় 'ধৈর্য্য হও আজিকার দিন রও
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥'
বিদ্যা বলে 'বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি সে বাঁচিলে হইবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ ঝাট কর পরিত্রাণ
সব শেষে যত দেও গালি ॥'
বুঝি হারা পুন তারা কহে 'সারা হও পারা
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥'
ভয় দর্শাইয়া নানা জনে জনে করে মানা
কষ্টে শ্রেষ্টে সান্ত্বাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে ॥"

রামপ্রসাদের বিদ্যা মালা দেখিয়া ও সুন্দরের লিখন পড়িয়া তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্তা হইয়া পড়িলেন। অবিবাহিতা রাজকন্যার অজ্ঞাত, অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব যুবকের সামান্য একটু লিখনে এরূপ অধৈর্য্য হওয়া মোটেই স্বাভাবিক হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী লিখন দিয়াই তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যা লিখন পড়ার পর সে দিন তাহার সহিত আলাপ করিতে পারেন নাই। পরদিন মালিনী ফুল দিতে আসিলে বিদ্যা তাহার নিকট পূর্বদিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিলেন এবং সুন্দরের সমাচার জানিতে চাহিলেন। এই বর্ণনায় কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ, উভয়েই বিশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা হীরার সমক্ষেই কৌটা খুলিয়া ফুল হইতে নিক্ষিপ্ত ফুলশরবিদ্ধা হইয়া ও শ্লোক পড়িয়া ব্যাকুল হইলেন ও হীরাকে বিনয় করিয়া কহিলেন,—

"'কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না ছলে॥'
হীরা কহে 'শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল॥
এরূপ তোমার যৌবনের ভার
যদ্যপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্নজল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল॥"

ইহার পর হীরা সুন্দরের পরিচয় দিল এবং তাহার পর বলিল—

"তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥"

হীরা এই বলিয়া চলিয়া যাইবার ছল করিলে বিদ্যা তাহাকে মাথার কিরা দিয়া ফিরাইলেন। বিদ্যাকে কাতরা দেখিয়া হীরা তাহার কাণে কাণে সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিল।

খ। সুন্দরের রূপবর্ণনা

গোবিন্দদাস সুন্দরের রূপবর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম মালিনী কর্তৃক সুন্দরের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই ভাবে তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন,—

"সুন্দর তাহার সুত সুন্দর মুরতি।
রূপে গুণে অনুপম কবি বৃহস্পতি ॥
যশ নিরমল অতি প্রতাপে তপন।
অঙ্গ ভঙ্গ দেখে অঙ্গ তেজিল মদন ॥
অমিয়া জড়িত কথা অতিশয় ভাল।
কিরণেতে নিবিড় আঁধার করে আল ॥
দেখিয়া তাহার রূপ হেন লয় মন।
জিয়াইয়া দিল হর মকরকেতন ॥
ধরণী মণ্ডলে বুঝি নাহি তার তুল।
দরশনে কামিনী কেমনে রাখে কুল ॥"

রামপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে সুন্দরের রূপবর্ণনা করেন নাই। বলরাম লিখিয়াছেন, বিদ্যা সুন্দরের পত্র পড়িয়া মালিনীকে তাহার ভগিনীপুত্রের রূপবর্ণনা করিতে বলিলে মালিনী—

"যোড় করি পাণি　　কহেন মালিনী
শুন নৃপতির সুতা।
ভাগিনা আমার　　বরণ তাহার
যেন কনকের লতা ॥
তাহার বরণ　　তপত কাঞ্চন
মুখ শরদের চাঁদ।
তার মধ্যস্থান　　কেশরিগঞ্জন
রূপ যুবতীর ফাঁদ ॥
গিধিনী গঞ্জন　　যুগল শ্রবণ
কদলী বিশেষ উরু।
বিসবর জিনি　　বাহুর বলনি
কামের কামান ভুরু ॥
চরণ যুগল　　রকত কমল
তাহে পড়ি কাঁদে বিধু।
তাহার লোচন　　খঞ্জন গঞ্জন
বচনে বরিষে মধু ॥

মাথার চিকুর ঠেকয়ে নূপুর
আম্বাইয়া থাকে যবে।১
অলিরথ নাথ একোদর জাত
নাসিকা তুলন খগে॥
কবিবিশারদ মনোহর পদ
কালিদাস নহে তুল।
সর্ব্বগুণধর আমার সুন্দর
সেই গ্যাথ্যা দিল ফুল॥
বিশংতিবৎসর বয়েস তাহার
দেখিতে যেমন ভূপ।
মার কাট কিবা মনে লয় যেবা
কহিল আমি স্বরূপ॥"

বিদ্যা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিজেই বলিলেন যে, সরোবরে স্নান করিবার সময় তাহাকে দেখিবেন।

দ্বিজ রাধাকান্তের সুন্দর মালিনীর অপেক্ষা না রাখিয়া দেবীদত্ত কজ্জল পরিয়া স্বয়ং উপবনে গিয়া বিদ্যাকে দেখিয়াছেন এবং বিদ্যা কামের পূজা করিলে কজ্জল মুছিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কবি তাহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন—

"মনোভবরূপ জিনি অদভূত রূপ।
ভুবন মোহন অপরূপ রসকূপ॥
আজানু লম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
নাসিকা উপরে অতি জিনি মত্তকীর॥
মঞ্জুল লোচন কঞ্জ খঞ্জন গঞ্জিয়া।
অনবদ্য মধ্য মত্ত কেশরী জিনিয়া॥
করিবরকর জিনি উরুর বলন।
কনক কপাট বক্ষতট সুশোভন॥
বালেন্দু নিন্দিত মুখ ভুরু সুগঠন।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু জিনি সুগঠন॥"

মধুসূদন বিদ্যাসুন্দরের দর্শনের পর বিদ্যার মুখ দিয়া সুন্দরের রূপবর্ণনা করিয়াছেন—

"কি রূপ দেখিনু সখি প্রবল মোহন।
তিলেক দেখিবামাত্র দ্রবিলেক মন॥

১। পুরুষের আপাদবিলম্বিত কেশ ও তাহার পদে নূপুর, এ বর্ণনা নিতান্ত দুর্বল। বোধ হয়, কবিতা মিলাইবার জন্যই ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

জিনিয়া কুসুমধনু তনু মনোহর।
ঈষৎ হাসনি কিবা বদন সুন্দর॥
গিধিনী তাপিত দেখি শ্রবণ যুগল।
অপরূপ তথি দোলে মকর কুণ্ডল॥
বিহগনায়ক জিনি নাসিকা উজ্জ্বল।
কিবা সে দেখিনু সখি নয়ন চঞ্চল॥
পুরুষ রতনবর রূপে গুণে মানি।
কমল কানন বন বাহুর বলনি॥
যদি বা মিলায় বিধি পুরুষ রতনে।
তবে সে মানিব হার বাহুর বন্ধনে॥
পুনরপি কহে ধনী হইয়া বিকল।
কেবা সে দেখিনুঁ সখি চাঁচর কুন্তল॥
অপরূপ যুগল কামধনু খানি।
যুড়িয়া মারিল বাণ বঙ্কিম চাহনি॥"

উক্ত দুইটি বর্ণনায় কাব্য নিতান্ত দুর্বল এবং ভাবও অতি সাধারণ। কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন,—

"দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কাণের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে॥
বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥
গৃধিনী গঞ্জিত মুকুতা রঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ চড়াইয়া[২]
থুল ভুরু ধনু হুলে॥
অধর বিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে "গুণ গুঁড়াইয়া" বলিয়া যে পাঠ আছে, তাহা ঠিক নহে। ইহাতে কোন অর্থ হয় না। 'চড়াইয়া' পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। টীকায় অবশ্য গুঁড়াইয়া শব্দের অর্থ 'টানিয়া' করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কষ্টকল্পনা।

মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখি ॥
আজানু লম্বিত বাহু সুবলিত
কামের কনক আশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণি পরকাশা ॥
যুবতীর মন সফরী জীবন
নাভি সরোবর তার।
ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
ভারত রসের চূড়া ॥”

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা অন্যান্য কবির বিদ্যার ন্যায় নির্লজ্জার মত স্বয়ং তাহার রূপ বর্ণনা করিতে মালিনীকে অনুরোধ করেন নাই। মালিনী তাহার কানে কানে যে সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিয়াছে, তাহাতে রস জমিয়া উঠিয়াছে।

গ। বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস নগরসংকীর্তনচ্ছলে বিদ্যাসুন্দরের দর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন,—

“শঙ্খ ঘণ্টা চামর লইয়া ও সুন্দর
রহিয়াছে মহাপ্রভু ধরে।
লইয়া ফুলের দোলা নানা রঙ্গে করে খেলা
উপস্থিত রাজার দুয়ারে ॥
চতুর্ভিতে নৃত্য গীত রাজদ্বারে উপনীত
নানাবিধি বাদ্যের বাজন।
হেন কালে চিত্ররেখা সুন্দরে করায় দেখা
করাঙ্গুলি দিয়া ততক্ষণ ॥”

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের দর্শনপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদের বিদ্যা মালিনীকে স্নানছলে যুবরাজকে দেখাইতে অনুরোধ করিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গলার হার পুরস্কার দিলেন। হীরা হৃষ্টচিত্তে সুন্দরকে আসিয়া সংবাদ দিল। বিদ্যা বাতায়নতলে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, সুন্দর বকুলতলায় সরোবরতীরে স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন।

এখানে রামপ্রসাদ সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। যে বকুলতলায় ইঁহারা সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইয়া ছিলেন, রাজবাটীর অন্তঃপুর হইতে তাহা যে দেখা যায়, তাহার কোন আভাস রামপ্রসাদ পূর্বে দেন নাই। ইহা যদি রাজবাড়ীর মধ্যে কোন সরোবর হয়, তাহা হইলে প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে সুন্দর প্রবেশ করিলেন কিরূপে, তাহাও লিখেন নাই। রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে বিদ্যা দূরবর্তী সরোবরতীরস্থ সুন্দরকে কিরূপে দেখিলেন, তা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দরের এই দর্শনপ্রসঙ্গ রামপ্রসাদ একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "বিদ্যা সুন্দরের পরস্পর দর্শন," "সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখীর প্রতি উক্তি" ও "বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ" এই তিনটি প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শব্দালঙ্কারের ঘটা করিয়া এই তিনটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ দিলাম—

"বন-ম-ত্ত-হস্তী-মন দুষ্টাচারী বড়।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড়দড় ॥
রসময়ই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত ॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ অলসে।
মনমত্ত-বারণ বারণ হবে কিসে ॥
কান্তুতনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥"

*   *   *

"সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
দড় দড় কি কব কহ কি শুনে আলি ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ কমলজ।
কিরূপ কিরূপ করি কৈল কমলজ ॥"

*   *   *

কি রূপসী	অঙ্গে বসি	অঙ্গ খসি	পড়ে।
প্রাণ দহে	কত সহে	নাহি রহে	ধড়ে ॥
মধ্যে ক্ষীণ	কুচ পীন	শশহীন	শশী।
আম্ভবর	ছাস্তোদর	বিম্বাধর	রাশি ॥
নাসাতুল	তিলফুল	চিন্তাফুল	ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি	সুধাবৃষ্টি	লোলদৃষ্টি	বিষ ॥"

বলরাম বিদ্যা ও সুন্দর উভয়কেই একই সরোবরে স্নান করিতে লইয়া গিয়াছেন এবং সেইখানেই উভয়ের দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। বলরামের বর্ণনা সুন্দর ও সহজ—

"দ্বিরদ গামিনী রঙ্গে কর দিয়া সখী অঙ্গে
রুনুঝুনু চরণে নূপুর।
অলঙ্কার ঝলমলি শ্রবণে কনক বৌলি
ললাটেতে সুরঙ্গ সিন্দুর॥
অতি সুকোমল তনু রৌদ্রে মিলায় অনু
সখীগণ আৎসাদিল শিরে।
সখী অঙ্গ দিয়া হেলে রাজহংসিনী চলে
কুরঙ্গনয়নী ধীরে ধীরে॥
গেল সরোবর জলে সখী সঙ্গে জলে উলে
করিবারে জলেতে বেহারে।
মালিনী নাহিক জানে ভাবিয়া আপন মনে
অন্য ছলে চলিলা কুমারে॥
মাখি নারায়ণ তৈলে কুমার স্নানের ছলে
সরোবরে হৈল উপনীতে।
দুঁহে দুঁহা করে দৃষ্টি যেন চন্দ্রে সুধাবৃষ্টি
চিত্র যেন নির্মিল রীতে॥
দুঁহে নেহালয়ে রূপে পড়িয়া মদন কূপে
দুই ঘাটে থাকি দুই জন।
অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ॥
অন্য ছলে কহে কথা কুমারী কুমার তথা
দুঁহাকার সঙ্কেত বচনে।
কালীপদ সরসিজে ভণে বলরাম দ্বিজে
কাছে থাকি অন্য নাহি জানে॥"

ইহার পর বলরাম বিদ্যাসুন্দরের সঙ্কেতে আলাপ বর্ণনা করিয়াছেন ও গীতগোবিন্দের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বলরামের ন্যায় মধুসূদনও বিদ্যাসুন্দরের সরোবরতীরে দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাই মালিনীর নিকট সরোবরে স্নান করিবার ছলে সুন্দরকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুন্দর সম্মত হইলে উভয়ে সঙ্কেতমত সরোবরতীরে মিলিত হইলেন। মধুসূদন এখানে মালিনীকে দিয়া উভয়ের পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাহা মোটেই শোভন হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা মালিনীর মুখে সুন্দরের রূপবর্ণনা শুনিয়া তাহাকে দিব্য দিয়া বলিলেন "কোন মতে দেখাইতে পার নাকি মোরে?" বিদ্যার মনে হইল, এই ব্যক্তিই তাঁহাকে, বিচারে জয় করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন—

"ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
এতদিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥"

তাহার পর কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা ভাবিয়া বলিলেন—

"মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥"

তাহার পর বিদ্যা—

"কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥"

ফুলের রতিকামের সঙ্গে কামের মূর্তিটি রাখিয়া রতিটি ফিরাইয়া দিলেন। চিত্রকাব্যে পরিচয় দিলেন—

"সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাপ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাত্মা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেপ্যহম্॥"

এই শ্লোকটি অন্য কোন কাব্যে বা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরেও নাই। সম্ভবতঃ ইহা ভারতচন্দ্রের নিজ রচনা।

এইখানে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে মালিনীকে দিয়া বিদ্যার উৎকণ্ঠার কথা সুন্দরকে বলাইয়াছেন এবং বিদ্যাকে দিয়া দেবীর আরাধনা করাইয়াছেন। আকাশবাণীতে দেবী সুন্দরকেই বিদ্যার ভাবি স্বামী বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ইহাতে একটু বিশেষত্ব করিয়াছেন—

"এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবীগলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন॥

ব্যস্ত দেখি তারে কালী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময় ॥"

বিদ্যার এই তন্ময়তা এবং দেবীর বিদ্যাকে আশ্বাস অন্য কোন কাব্যে নাই। কবির এই কল্পনা ভাব ও রসে অপূর্ব।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের দর্শন অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। মালিনী সুন্দরকে লইয়া রথতলায় রাখিয়া বিদ্যাকে সংবাদ দিলে—

"আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনি ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা দুঁহারে দেখায় ॥
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥
শুভক্ষণে দরশন হইল দু'জনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥
দুহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে ॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া ॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল ॥"

এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অপর সকল কবির বর্ণনা হইতে রসঘন।

ঘ। সুন্দরসমাগমের পরামর্শ

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, মালিনী বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলনের কোন ব্যবস্থাই করে নাই। এমন কি, অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় পিতাকে জানাইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিবার কথাও বলে নাই। সে সুন্দরকে বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া, যখন বিদ্যার ভবনে সংকীর্ত্তনের প্রসাদ মাল্যসহ উপস্থিত হইয়া বলিল—

"দ্বারী প্রহরী তারা বড়ই চতুর।
কোন্ মতে আসিবে তোমার অন্তঃপুর ॥"

তখন চিত্ররেখা তাহার উত্তর দিল—

"চিত্ররেখা বলে যদি হয় গুণবান।
তবে সেই আসিবারে জানিবে সন্ধান ॥
চিত্ররেখা বলে তুমি নাহি জান কাজ।
আসিতে সন্ধান সে জানিবে যুবরাজ ॥"

মালিনী তাহার পর গৃহে গিয়া সুন্দরকে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া কার্যসাধন করিতে বলিল। একেবারে দৈবের হস্তে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া দিল। সুন্দর সিদ্ধ মন্ত্র জপিয়া মন্ত্রের প্রতাপে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিলেন।

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, মালিনী বিদ্যার নিকট হইতে নানা উপহার লইয়া আপন গৃহে আসিয়া সুন্দরকে বিদ্যার মনের ভাব ব্যক্ত করিল ও বলিল,—

"কেমতে হইবে দেখা ভাব মহাশয়।
তোমা বিনা তার প্রাণ তিলেক না রয় ॥"

তাহার পর বলিল যে, উভয়েই উভয়কে পাইতে ব্যাকুল হইয়াছ, কিন্তু মিলিবার কোন উপায় নাই। কারণ—

"দিবা বিভাবরী জাগে কোটাল প্রহরী।
এই সে কারণে আমি ভয় বড় করি ॥
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে লয়।
নৃপতিরে বলিয়া করহ পরিণয় ॥"

তাহা শুনিয়া—

"হাসিয়া সুন্দর বলে হৃদয় কৌতুক।
গোপনে করিব বিভা ইথে বড় সুখ ॥
চোররূপে যুবতী লইয়া করি লীলা।
জগতের সার সুখ বিধি যা লিখিলা ॥
পশ্চাৎ শুনিলে রাজা যে হয় সে হবে।
সহায় পরম দেবী কোন দুঃখ নবে ॥"

ইহা শুনিয়া মালিনী আর কিছু বলিল না। বলরাম সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই বিদ্যার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"যে হকু সে হকু আমি লজ্জা পরিহরি।
গোপতে কুমার আমি স্বয়ম্বর করি ॥"

তাহার পর সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর বিদ্যা সখীগণকে বলিলেন—

শুন সখীগণ দেখিল স্বপন
আজ রজনীর শেষে।
একই সুন্দর বহু গুণধর
শুইয়াছিল মোর পাশে।

আপনি স্বপনে হাসি তার সনে
হার দিল তার গলে।
সেই হইতে মোর চিত্ত হইল চোর
না জানি কি ফল ফলে॥
শুন সখীগণ কর আওজন
কালী পূজিবার তরে।
আজ নিশাকালে কালী পূজি ভালে
তবে মন হয় স্থিরে॥"

ইহা শুনিয়া সখীগণ পূজার আয়োজন করিল। বলরাম লিখিতেছেন—

"তেয়াগিয়া লাজ বিদ্যা করে সাজ
কালী পূজিবার ছলে।"

"এথায় সুন্দর গিয়া মালিনীর ঘর।
দিবসে বঞ্চিল ছুঁহে মদনের শর॥
ভাবিল কুমার আমি কি বুদ্ধি করিব।
কোন্ ছলে বিদ্যার মন্দিরে আমি যাব॥
যদি খিড়কীর পথে করিয়ে গমন।
কোটাল পাইলে লাগ বধিব জীবন॥"

এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া, পরে ভাবিলেন—

"যেই দিন ঘরে হৈতে করিল গমন।
একান্ত করিল কালীর চরণ পূজন॥
সেই দিন কেন মোরে দিল আশ্বাসন।
দরশন পাবে যবে করিবে স্মরণ॥
একান্তে করিয় কালীর চরণ পূজন।
তবে মনোরথ তোমার করিব পূরণ॥"

তাহার পর সুন্দর কালীর স্তব করিলেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শনের পর বিদ্যা ভগবতীর স্তব করিলে—

"একান্ত কাতরা বিদ্যা তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই তোমার হৃদেশ সেই
আজি নিশি সফল প্রতুল॥"

বিদ্যা পুলকিতা হইয়া বাসরসজ্জা করিতে লাগিলেন।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, বিদ্যা যখন সুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য মালিনীকে বিনয় করিতে লাগিলেন, মালিনী তখন বলিল—"রাজা রাণী শুনিলে সর্বনাশ হইবে।" বিদ্যা পুনরায় অনুনয় করিলে সে বলিল—

"তবে যদি হয় মনেতে নিশ্চয়
জানহ ভজিব তারে।
কোন মতে আসি সেই পরবাসী
ভেটিব তোমার তরে ॥"

মালিনী নিজে কোন ভার লইল না। বিদ্যা তখন মালিনীকে বলিলেন—সুন্দর যে-কোন প্রকারে যেন তাহার গৃহে উপস্থিত হন। মালিনী সুন্দরকে সেই কথা জানাইলে সুন্দর কলিকার পূজা করিলেন। দেবীর বরে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হইল।

উপরিউক্ত কবিদিগের মধ্যে কেহই কোন যুক্তি দেখান নাই যে, কেন সুন্দর বা বিদ্যা প্রকাশ্যে বিবাহ না করিয়া গোপনে মিলিত হইতে চাহিলেন। ভারতচন্দ্র কিন্তু সেই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের পরস্পরের দর্শনের পর—

"প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানা জাতি
পুরুষের আট গুণ মেয়ে ॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল ॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
ব্যাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥
এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নট তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোনরূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।"

শুনিয়া হীরা শিহরিয়া উঠিল। কোতোয়াল ধূমকেতু জানিতে পারিলে "তিলেকেতে

পাড়িবে জঞ্জাল।" তাহার পর সখীরা কথায় কথায় প্রচার করিয়া ফেলিবে। বিদ্যা সখীদের সম্বন্ধে হীরাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন, তাহারা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য। বিদ্যা সুন্দরকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে বলিলেন, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন।

"বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলে জলের সঞ্চার॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥"

হীরা গিয়া সুন্দরকে বলিল। সুন্দর শুনিয়া—

"রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা"

সুন্দর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

"সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখী এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥"

৫। সন্ধিখনন হইতে বিদ্যাসুন্দরের বিচার

ক। সন্ধিখনন

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সুন্দর সাত বার সিদ্ধ মন্ত্র জপ করিয়া—

"মন্ত্র জপিয়া কুমার হইল দণ্ডবৎ।
মন্ত্রের প্রতাপে হইল সুড়ঙ্গের পথ॥
বিদ্যার মন্দির আর মালিনীর ঘর।
পাতালে জাঙ্গাল হইল পরম সুন্দর॥
কনকরচিত সে অপূর্ব্ব জাঙ্গাল।
দুই ভিতে শোভে তার মুকুতা প্রবাল॥"

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন, বিমলার কথা শুনিয়া, রোমাঞ্চিত দেহে মদনে ব্যাকুল হইয়া, সুন্দর স্নানাদি সারিয়া শিবপূজান্তে কালীর মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিলেন ও প্রার্থনা জানাইলেন—

"গোপনে করিব বিভা তোমার আদেশ।
একাকী আইনু দূর জানিয়া বিশেষ॥
কেমনে যাইব রাজকন্যার আলয়।
কোটাল দুরন্ত বড় দেখি লাগে ভয়॥
হইল আকাশবাণী সদয়া অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিয়া রাজার তনয়া॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর॥
চন্দ্রকান্ত মণি কত জ্বলে ঠাঞি ঠাঞি।
রজনী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই॥"

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের কথা ধ্বনিত করিয়াছেন, তবে সুড়ঙ্গের বর্ণনা করেন নাই—

"স্তব করে কবি　　পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ　　ইহা কোন তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা　　অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গ পথ।
প্রসাদের বাণী　　ভক্তের ভবানী
পূরাইলা মনোরথ॥"

বলরামও সুড়ঙ্গের কোন বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার সুন্দর দেবীকে ককারাদি ক্রমে স্তব করিয়া বিদ্যার ঘরে যাইবার জন্য বর চাহিলে—

"কুমারের শুনি বাণী　　কৃপাময়ী নারায়ণী
ভদ্রকালী কঙ্কালমালিনী।
চলহ বিদ্যার ঘরে　　অভয় দিলাও তোরে
হইবেক সুলঙ্গ সরণী॥
পুরিবেক মনোরথে　　চলহ সুলঙ্গ পথে
যথা বিদ্যা নৃপতিকুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে　　সুলঙ্গ হইব বরে
অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বরী॥"

মধুসূদন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, কালিকার পূজা করিয়া সুন্দর বর লাভ করিলেন এবং ফুৎকার দিতেই মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার গৃহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হইল।

দ্বিজ রাধাকান্ত মায়াকজ্জলপ্রভাবে সুন্দরকে অদৃশ্য করিয়া বিদ্যার সহিত মিলাইয়াছেন; কিন্তু সুড়ঙ্গের প্রসঙ্গও বাদ দেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে বহু নূতনত্ব করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রও সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গগুলি আগে পাছে করিয়া ও নূতন প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া ইচ্ছামত কাব্যটিকে নূতনতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাধাকান্ত লিখিতেছেন, মিলনের পর বিদ্যা ও সুন্দর মায়াকাজলের সাহায্যে ছদ্মবেশে রাজসভায় গিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন এবং বীরসিংহের নিকট হইতে সুন্দর ছদ্মবেশিনী বিদ্যাকে বাক্‌দত্তা করাইয়া লইলেন। বিদ্যা ও সুন্দর কিরূপে রাজসভায় যাইলেন ও আসিলেন, সখীগণ তাহা জানিতে চাহিলে, বিদ্যা সব কথা খুলিয়া বলিলেন। সুন্দর নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সখীগণ কাজল চুরি করিল ও সকলে অদৃশ্য হইয়া কৌতুক করিতে লাগিল। সুন্দরকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিল, "রাণী আসিতেছেন, তুমি পালাও।" সুন্দর তাহাদের চাতুরী বুঝিয়া নির্জনে গিয়া কালীর ধ্যান করিতে লাগিলেন—

"তব দাসে পরিহাসে হাসে নারী হৈঞা।
লজ্জানিবারণী তারা রূপা বিনাসিঞা॥
ভকতবৎসলা শ্যামা সেবক শরণে।
মা ভই মা ভই সদা ডাকেন গগনে॥
মায়ানিদ্রা দিয়া দেবী ঈষদ হাসিঞা।
করেন সুড়ঙ্গপথ ফুতকার দিঞা॥"

ভারতচন্দ্র সমস্তই দেবীর উপর ফেলিয়া দেন নাই। সুন্দর দেবীর স্তুতি করিলে—

"স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥"

ইহার পর কামরূপের কামাখ্যার মন্ত্র দিয়া কিরূপে সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—

"অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অন্নদার বরে॥"

সুড়ঙ্গ কাটিলে যে মাটি উঠিবে, তাহা কোথায় যাইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়॥"

তিনি সংক্ষেপে সুড়ঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥"

৯। সুন্দরের অভিসার

সুড়ঙ্গ সৃষ্টির পরই গোবিন্দদাস সরাসরি সুন্দরকে বিদ্যার গৃহে উপস্থিত করিয়াছেন—

"কামদেব জিনি রূপ অতি মনোহর।
সচকিত সখিগণ দেখিয়া সুন্দর॥
আচম্বিতে মন্দিরেতে চন্দ্রের উদয়।
কৌতুকেতে বিদ্যাবতী লুকায় লজ্জায়॥"

এখানে নায়িকার গৃহে নায়কের গোপনে প্রথম উপস্থিতির কোন thrill নাই, যেন সবই ঠিক ছিল, সুন্দর গিয়া উপস্থিত হইয়া একেবারে বিচারে বসিয়া গেলেন।

কৃষ্ণরাম সুন্দরের অভিসারোদ্যোগের বেশ একটি বর্ণনা করিয়াছেন—

"দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদোষ।
দেখিয়া কবির মনে হইল সন্তোষ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান স্বর্ণঅলঙ্কার।
বহুমূল্য গলে শোভে মুকুতার হার॥
সুন্দর সুন্দর তনু রাঞ্জিত চন্দন।
করিল বরের বেশ রাজার নন্দন॥
ভাবিয়া পরমদেবী মন্ত্র জপ করি।
কবিবর বিবরে প্রবেশে বিভাবরী॥
যাইতে যাইতে পথে থমকিয়া রহে।
রতির রমণ শরে বলে প্রাণ দহে॥
গুরু গুরু কাঁপে উরু যুগল হরিষে।
কৃষ্ণরাম বলে গীত অমিয়া বরিষে॥"

বলরাম এক কথায় বর্ণনা সারিয়াছেন—

"সম্পূর্ণ হইল আশে ধরি নটবর বেশে
হরষিতে চলিলা সুন্দর।"

রামপ্রসাদ তাঁহার স্বাভাবিক অলংকারঝংকারে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়া নায়কের অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন—

"বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।
হ্রীরূপিণী হ্রীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥" ইত্যাদি

মধুসূদন চক্রবর্তীও বলরামের ন্যায় এক কথায় সারিয়াছেন, অভিসার বর্ণনা করেন নাই। ভারতচন্দ্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে॥"

ভারতচন্দ্র তাঁহার রসমঞ্জরীতে যে অভিসারিক নায়কের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বর্ণনার সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে—

"দ্বিতীয় প্রহর রেতে মোরে কহিয়াছে যেতে
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥
অন্ধকারে দেখে আলো গৌর লোক দেখে কালো
শত্রুজনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে সুপথজ্ঞান তাহে মন মোহিল॥"

(ক্রমশঃ)

আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

বীরভূম কবি-ভূমি। ভদ্রপুর, থানা নলহাটীনিবাসী শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা সন ১৩৩০ সালে প্রণীত "পদামৃতলহরী" নামে এক বৈষ্ণব পদাবলীপুস্তকের পাণ্ডুলিপি রতন-লাইব্রেরিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে মাত্র ৮০টি পদ ও কয়েকটি প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যায় না। কবি স্বীয় হস্তে পুস্তকের মলাট-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"উপহার, মহাত্মা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, সিউড়ী"। (সম্ভবতঃ "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক" পুস্তকে তাঁহার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে মদীয় পিতামহের নিকট উক্ত পুস্তক উপহার হিসাবে আসিয়াছিল)।

এই পুস্তকের পদগুলিতে গ্রাম্য কবির বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। যাহাই হউক, সুধীবৃন্দ ইহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবেন। কবি মৃত। পদগুলি কোথাও কোন দিন প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। তাই উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে কতকগুলি পদ সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

(১)

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

যথা তালেন গীয়তে।

উছলিত মনরথ, উনমত চিত তাহে ভকত ভাব করি ভাণ।
ব্রজজন রঞ্জন যশোমতী নন্দন, ব্রজমোহন বর কান॥
সো অব শচীসুত প্রেম বিলায়ত, হরিনাম করু পরচার।
উজ্জ্বল রস মন্দাকিনী, ধারা আনি ডুবাওল, ভাগী অভাগী অপার॥
সঙ্গে রোহিণীসুত, আর নিজ জন যত, নদীয়া নগরে উদিয়ায়।
শান্তিপুর দিনকর, সদাশিব অব, ঝটতি মিলল তথি ধাই॥
উত্তল তরঙ্গ, মৃদঙ্গ কত বাজত, নাচত গায়ত ভঙ্গি বিথার।
ছোরতে জোরে আনি পাপি ডুবাওল বিদ্যাপতি মদ ভার॥
কাল জাল ভীত করমী মকর দল মিলত সোই পাথার।
ভকত মীন কত, ডুবত ভাষত খেলত প্রেম সাঁতার॥
ধীরে ধীরে চলি, তীরে তথি ধারল নবীন ধরম অগেয়ান।
শীতল বাত, জুরাওল তনু মন, অধিক হো অব সমাধান॥

(৫)

রূপানুরাগ। গোষ্ঠ

রসের আবেশে শ্রীগৌরসুন্দর থমকি থমকি যায়।
রুণুর ঝুণুর বোলয়ে মধুর সোনার নূপুর পায়॥
মৃদু মৃদু হাস অমিয়া উগারি ধারায় ভরল ধরা।
পাঁচনি সাজনি নিছনি পরাণ নাগরী মানস ধরা॥
হা রে রে রে রে রে আর কত বোলে ডাকে ঘন ঘন গোরা।
ধরা চূড়া বান্ধি দাস গৌরি আদি মিলল আসিয়া ত্বরা॥
সবে মত্ত চিত বাছুরী লইয়া চলল জাহ্নবী কূলে।
ভুলল নবীন আপনা সঁপিয়া বিকাওল বিনি মূলে॥

(৬)

রূপানুরাগ

নটবর গৌর বরণ জিনি সুবরণ, আভরণ কুন্দক মাল।
নয়ন কমল যুগ ঢল ঢল ছল ছল কুন্তল কুঞ্চিত ভাল॥
ভুরুয়া ভরম কোটি কাম কামান কিয়ে, কাম করম করু নাশ।
আশ হি আশ নাসা তিল ফুল জিনি, অধর বাঁধুলি পরকাশ॥
দশন দাড়িম বীজ দরপ দূর করি, ছ্যতল চাঁদনী হাস।
বাস নিরাশ উদাস মানস মতি, নাশক ধরমক ফাঁস॥
উরু সুবিশাল সুন্দর মণিমালে শোভন ক্ষীণ কটি ভুবনমোহন।
শ্রীকর চরণ কর ভকত ভয় ভঞ্জন অনুদিন নবীন শরণ॥

(১০)

পূর্ব্বরাগ

সুবরণ বরণ বরণ নহে সমতুল, বরণে বরণ হোই।
কাঞ্চন কমল বিমল অতি কোমল শীতল পদতল প্রাণ নিছই॥
পরিসর বক্ষ কক্ষ অতি সুন্দর, কটিতট কেশরী গঞ্জন।
মালতীক মাল দোলত উরপর, দোলায়ত জগজন মন॥
নয়ন কমল ছল টল টল ঢল ঢল চাহনী মধুর মধুর।
মৃদু মৃদু হাস অমিয়া কত উগারই দীন নবীন রসপূর॥

(১৮)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপ

তাল একতাল

শচীনন্দন,	জগমোহন,	কাঁচা কাঞ্চন	কাঁতি দেহা।
প্রেমি আগর,	রস সাগর,	ভাব সাগর	চিত লেহা॥
কুল নাগরী,	রূপ বাগুড়ি	জরিতা পরি	মন লীনা।
গেহ অন্তর,	সম প্রান্তর,	ব্যাকুলান্তর	অনুদিনা॥
স্মরি কীর্তন,	গোরা নর্তন,	প্রেম বর্তন	কুলক্ষীণা।
বিধি বঞ্চিত,	কৃপা কিঞ্চিত,	সদা বাঞ্ছিত	এ নবীনা॥

(১৯)

শ্রীশ্রীগৌরহরির রূপ

দশকুশি

ভুবন রঞ্জন গৌরহরি।

নিরমল কাঞ্চন বঞ্চন সুবরণ

কি বরণী রূপের মাধুরী॥

কিবা সে চুড়ার ছাঁদ রমণী মোহন ফাঁদ

ভরুয়া শতেক স্মরধনু।

অরুণিম দুটি আঁখি কটাক্ষে কি রাখে বাকি

দুরন্ত কুসুমশর জনু॥

প্রায় সে ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অধর অতি সুরঙ্গ

তাহে মধুর মৃদু হাস।

কিয়ে পুরুষ কামিনী, ধ্যানে জাগে যামিনী

কুল শীল ধরমে উদাস॥

চরণ নখর ভাতি কত কত চাঁদ কাঁতি

দিবা রাতি সমান উজোর।

সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন রাইকান্তি আবরণ

এ দাস নবীন মন ভোর॥

(২১)

কন্দর্প দশকুশি

থির দামিনী ভাতি জিনিয়া অঙ্গের কাঁতি

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রসপুর।

কত না চাঁদনী ছানি তাহাতে মাখান গো
মদন দরপ করে চুর ॥
কলঙ্ক মাজিয়া চাঁদে খানি খানি করি কিয়ে
নখছাঁদে রাখিল বসায়া।
দেখ রে ধরিছে সুধা ঘুচাতে অখিল ক্ষুধা
পিয়ে ভৃঙ্গ চকোরে বঞ্চিয়া ॥
লোভ সম্বরিতে নারি কত সে নবীনা নারী
আপনা পাসরি ধায় পাশে।
নাচাইয়া মন নটে না চাহিয়া বিধিপটে
ঘাটে বাটে নবীন উদাসে ॥

(২৪)

শ্রীমতী রাধিকার পূর্ব্বরাগ

সজনি ! কালিয়া কি যোগ মন্ত্র জানে।
অবলা ধরম হরে মুরলীর তানে ॥
কুল শীল লাজ গুরু গৌরব, সব হরি করল বিভোর।
নয়ন উপেখি শ্রবণ পথ বাহিয়ে ধৈরয তোড়ল মোর ॥
সখি ! অব হাম কি কহিব তোই।
রোই রোই দিন যামিনী যাপন, ধরম করম ইহ হোই ॥
কুটিল কীট কোন যমু প্রাণ কোরক কাটয়ী কঠিন না জান।
পঞ্জর জর জর, অন্তর গর গর, অন্তক শরণ বিধান ॥
ধিক ধিক জনমে অধিক ধিক জীবনে ধিক বিহিকৃত বিঘটন।
দারিদ্রক আশ দ্রবিণ হেম মূচক সূচক নবীন নূতন ॥

(২৯)

শ্রীমতীর লালসানুরাগ

কালার পিরীতি ভাবি দিন রাতি পাঁজর ঝাঁঝর কৈনু।
না ভায় গৃহকাজ, গুরুজন সমাজ, কত না গঞ্জনা সৈনু ॥
পাড়া প্রতিবাসী, করি হাসাহাসি, কত না ইঙ্গিত করে।
কানুর পিরীত পিই না বুঝিনু, রিতি রহু বহু দূরে ॥
মনের কথা কহিল না হয়, হাসিতে কাঁদনে রটে।
বসি নিরজনে মনে মনে মেনে, কত কত সাধ উঠে ॥
আপনার মনে মিলি তার সনে, কত না বলিয়ে রোষে।
সে রসের বঁধু, করে কর ধরে, কত না আদরে তোষে ॥

সে সুখ আবেশে, বসি নিজ বাসে, হাসিয়ে মিছই আশে।
পাপিনী ননদী, বরজ বচনে, সে সুখ তখনি নাশে॥
ভাঙ্গে সুখ হাট, পিরীতি কপাট, ছটফট করে প্রাণ।
নবীন পিরীতি না জানে নবীন, কিছু করে অনুমান॥

(৩৩)

আক্ষেপানুরাগ

তাল—দশকুশি

সখি! হাম না জীয়ব আর।
কানু অনুরাগ, কালিয় বিষে জারল, কোন করব পরকার॥ ধ্রু॥
তাপে দগধ তনু, পুনঃ নাহি দগধবি, বান্ধবি মাধবি পাশ।
কবহুঁ পুছি জানব, দেখব মাধব, জীবন ছোড়ল মঝু আশ॥
এত কহি সুন্দরী, দীঘল শ্বাস ছোড়ি, থর থর কম্পিত ভেল।
ধায়ি ধরল সখি, ঝটকি নবীন দূতী, কানু আনিতে চলি গেল॥

(৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

কালিন্দী কূলে কামিনী-কুল-মণি এক পেখনু করিতে সিনান।
নয়নে নয়ন লাগি নিমিষ মিশাইতে তৈখনে হরল গেয়ান॥
সখা রে কি কহব তাকর কাঁতি।
প্রাতর অরুণ সমান চরণতল, করতল কোকনদ ভাতি॥ ধ্রু॥
সুধা সরোবর কিয়ে বদন সুমাধুরী খেল তোঁহি দিঠি মীন জোর।
চিবুক উপর হেরি হেম কমল হেন লাজে নলিনী নীর কোর॥
নাসা অতি রঞ্জন খগপতি গঞ্জন, তাকর দরশ তরাসি।
নাভি বিবর ছোড়ি রোমাবলি ছল ধরি ভাগে ভুজগী হেন বাসি॥
গুপত গামিনী সই সাপিনী পাওল উচ কুচাচল তল স্থান।
না জানিয়ে অলক্ষিতে মোঝে বুঝি দংশল তব ধরি জলত পরাণ॥
সোই সুধাকর মুখি মুখ চুম্বন জীবন ওষধি এক জান।
নবীন কহয়ে বাঁকা দশা তব নয় একা লেখা করি সমান সমান॥

(৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ আপ্তদূতী প্রতি

তাল—লোফা

এ সখি! বোলবি তাহে মঝু বাণী।
আপনি আপন তনু　　মন প্রাণ সমপিনু
রমণী রতন তাহে জানি॥

ইথে কি উদাস এতেক তাক সমুচিত
বৈঠল গুরুজন মাঝ।
কুল ভরম কি রতন করি মানল
হামারি হৃদয়ে হানি বাজ॥
তছু প্রেম বারি বিনহি মো জীবন মীনে
জীবইতে সংশয় ভেল।
নিচয় পুরুষ বধ পাপ তাক লাগব
কোন যুবতি অছু দেল॥
তাকর মূরতি ধিয়ান ধরি দিন রাতি
জাগি খোয়াওলু দেহা।
গোঠ মাঠ ঘাট বাট হাম ঘুরত তহি
কৈছন তাকর লেহা॥
তাক দরশ লাগি ধেনু চরাওঞী
ধারহি কদম্ব কি ওর।
নবীন প্রেম পীযূষ পান আশয়ে
যৈছন চাঁদ চকোর॥

(৬১)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তাল—একতালা

জগরঞ্জন, ঘনগঞ্জন, নয়নাঞ্জন, গতিদাতা।
বিধুলাঞ্ছন ধৃতিবঞ্চন, কৃতি মুঞ্চন মতি মাতা॥
কুলতঞ্চক, গৃহবঞ্চক, রতিরঞ্জক রসধাতা।
শীল কণ্টক লাজ কণ্টক, প্রাণপঞ্চক পরিণেতা॥
জনসঞ্জক প্রেমব্যঞ্জক, সুধাসিঞ্চক বিতরেতা।
ভয়ভঞ্জক মোহমুঞ্চক, নবীনাঙ্কক স্মৃতিরেতা॥

(৫৮)

সংক্ষেপ মিলন

তাল—একতালা

দোঁহে দোঁহা রতি, আরতি পিরিতি বিষম বিগতি দশা।
সকরুণ মতি, দোঁহার নিজ দূতী, দ্রুতগতি ঘনশ্বাসা॥
যাঁহা যাঁহা স্থিতি, কয়ল ঝটিতি, নয়নে গলয়ে লোর।
শুনি দুহুঁ জন, উৎকণ্ঠিত মন, ধৈরজ না মানে থোর॥

আপন আপন, বিজন নিবাসে, ধরণী লোটায়ে রোই।
নিজ নিজ দূতী, আশ্বাসে কত না প্রবোধ নাহিক হোই॥
শত কালকূটে জারল যেমতি তেমতি হওল দে।
থর থর থর কাঁপে কলেবর হৃদয়ে না বান্ধে থে॥
সময় বুঝিয়ে, যতন করিয়ে, দোঁহে দোঁহা অভিসারি।
মিলাওল আনি, শুকাওল প্রাণ পাওল পিরিতি বারি॥
নব তরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, ভাসল সুখ বারিধি।
সখীগণ সনে নবীনা মাতল প্রেমের নাহি অবধি॥

(৬৪)

শ্রীমতী রাধিকার রূপ

তাল—একতালা

রাজনন্দিনী,	ব্রজবন্দিনী,	গজগামিনী	রসধামা।
কুলকামিনী,	জিতদামিনী,	পরিবঙ্কিনী	ঘনশ্যামা॥
প্রীতসাধিনী,	হিতভাষিণী,	মিতহাসিনী,	কত রামা।
অনুসঙ্গিনী,	নবরঙ্গিনী,	মৃগ (অ)পাঙ্গিনী	হৃতকামা॥
নবভাবিনী,	প্রতিরঙ্গিণী,	প্রেমবাহিনী	নিরুপমা।
কানুতোষিণী,	তৃষানাশিনী	নবীনামিনী	ধ্যানগামা॥

প্রার্থনা

বাড়ল প্রেমের ঢেউ।
আমি পিরীতি তরঙ্গে এ তনু ডারব রাখিতে নারিবে কেউ॥
মাতল মানস মীন।
প্রেমধারা ধরি বহিয়া যাওব কুল শীল করি ক্ষীণ॥
জাগল হিয়াত প্রাণ।
আমি গোরা অনুরাগে এ ঘর তেজব বেদবিধি করি আন॥
আয়! কে যাবি আমার সাথে।
যে পথে গৌর কীর্তনে নাচিবে সে পথে যাইব সাথে॥
আর না ফিরিব ঘরে।
আঁচল পাতিয়া কলঙ্ক লইব যে বলু সে বলু পরে॥
এবার গৃহকাজ হল সারা।
গোরা তনুখানি যেথানে তুখানি সে বাসে পরাণ ভোরা॥
সেই সে আমার হিত।
গোরা গুণে যার দুটি আঁখি ঝুরে সেই সে নবীন মিত॥

লিঙ্গ

শ্রীননীগোপাল দাশশর্ম্মা

প্রাচীন ভাষায় বৈয়াকরণগণ বাক্যস্থ পদের রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া প্রাতিপদিকগুলিকে দুই অথবা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাজক সংজ্ঞার নাম লিঙ্গ। সংস্কৃত, পারশী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদিক তিন ভাগে এবং উর্দু, আরবী, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদিক দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং তিন ভাগের নাম পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গসংজ্ঞার সহিত শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, শব্দের সহিতই সম্বন্ধ। শব্দের দ্বারা কোন পুরুষজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহা পুংলিঙ্গ হইবে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। সেই প্রকার স্ত্রীজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ নাও হইতে পারে। যেমন দার, পত্নী ও কলত্র—এই তিনটি শব্দের অর্থই স্ত্রী, তাহা হইলেও দার–পুংলিঙ্গ, পত্নী–স্ত্রীলিঙ্গ এবং কলত্র—ক্লীবলিঙ্গ। পুরাতন ইংরাজীতেও দেখা যায় woman পুংলিঙ্গ, *quean* স্ত্রীলিঙ্গ এবং wife ক্লীবলিঙ্গ। এই তিনটি শব্দের অর্থই woman। "Woman, quean and wife were synonymous in Old English, all three meaning 'woman' but they were masculine, feminine, and neuter respectively." Our Language, by Simean Potter. এই প্রকার এই গ্রন্থে আরও অনেকগুলি শব্দের প্রাচীন ইংলিশের লিঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বর্ত্তমান ইংরেজীতে এই প্রকার লিঙ্গবিভাগ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অতঃপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

বন্ধু-অর্থে মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, সূর্য অর্থে পুংলিঙ্গ। সেই প্রকার আম্র জম্বু প্রভৃতি শব্দ, বৃক্ষ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ, ফল বুঝাইতে ক্লীবলিঙ্গ। দয়া, কৃপা, উন্নতি, বেদনা, পিপাসা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অনুগ্রহ, আনন্দ, বিক্ষোভ, উপদেশ, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ, এবং সুখ, দুঃখ, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক এইরূপ; শব্দগুলির যাহাই অর্থ হউক না কেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ লিঙ্গের অন্তর্গত। লিঙ্গ অনুসারে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপ গ্রহণ করে এবং ইহাদের বিশেষণ ও সর্বনাম সম্পূর্ণভাবে ইহাদেরকে অনুসরণ করিয়া সেই সেই লিঙ্গের নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মূল শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, বিশেষণ ও সর্বনামকেও স্ত্রীপ্রত্যয়ের নিয়ম অনুসারে প্রত্যয়যুক্ত করিয়া রূপান্তরে পরিবর্তিত করিতে হয়। প্রতিপন্ন অর্থ, ইহাই যে বিভক্ত্যন্ত রূপ, বিশেষণ ও সর্বনাম সর্বদা লিঙ্গসংজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট করা হইতেছে। অয়ং বালকঃ বুদ্ধিমান্, ইয়ং বালিকা বুদ্ধিমতী, এষঃ গ্রন্থঃ মনোহরঃ, এষা পুস্তিকা মনোহরা, এতৎ পুস্তকং

মনোহরম্। তস্য দারাঃ বুদ্ধিমন্তঃ সুন্দরাঃ চ তস্য পত্নী বুদ্ধিমতী সুন্দরী চ, তস্য কলত্রং বুদ্ধিমৎ সুন্দরং চ। উদাহরণগুলিতে বালকঃ, গ্রন্থঃ দারাঃ পুংলিঙ্গ, ইহাদের বিশেষণ এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গের রূপে রচিত হইয়াছে। বালিকা, পুস্তিকা ও পত্নী স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুস্তকং কলত্রং ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং ইহাদের বিশেষণ ও সর্ব্বনাম যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে।

উত্তরপদপ্রধান সমাসে অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে এবং তদন্তর্গত কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে উত্তরপদের লিঙ্গ অনুসারে শব্দের রূপ রচিত হয়। সেই হেতু ইয়ং স্ত্রী বুদ্ধিমতী বা বিদুষী হইলেও, অয়ং স্ত্রীলোকঃ বুদ্ধিমান্ বা বিদ্বান্—এই প্রয়োগই প্রশস্ত হইবে। এখানে স্ত্রী শব্দের সহিত লোক শব্দের সমাস হইয়াছে, সমাসবদ্ধ পদের অর্থ নারী বুঝাইলেও, লোক শব্দটি পুংলিঙ্গ, এবং উহার উত্তরই বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্রপদের পুংলিঙ্গত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সর্বনাম ও বিশেষণ পুংলিঙ্গের অন্তর্গত হইল। এইরূপ সুন্দরঃ নারীগণঃ আগচ্ছতি, এখানে 'গণ' শব্দের পুংলিঙ্গত্বহেতু বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইল।

য়ুরোপীয় অন্যান্য ভাষায় বিশেষণে লিঙ্গগত পার্থক্য থাকিলেও, ইংরাজী ভাষায় বিশেষণে লিঙ্গগত কোন পার্থক্য নাই। সর্বনামের মধ্যে He, She ও It এই তিনটি মাত্র সর্বনামের যথাযথ প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য Noun অর্থাৎ naming wordএর লিঙ্গ নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ পুরুষজাতীয় জীববাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীজাতীয় জীববাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তদ্‌ভিন্ন যাবতীয় পদার্থবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গের অন্তর্গত, এইপ্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন কয়েকটি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্গত করা হয়। যেমন—Moon, Ship এবং Country. প্রাচীন ইংরাজীতে পাওয়া যায়—"*Horse Sheep* and *Maiden* were all neuter, *Earth, Mother Earth*, was feminine, but *land* was neuter. *Sun* was feminine, but *moon*, strangely enough, masculine. *Day* was masculine, but *night* feminine. *Wheat* was masculine, *oats* feminine, and *corn* neuter." Our Language, by Simeon Potter. বর্ত্তমান ইংরাজীতে প্রথমোক্ত নির্দেশ থাকিলেও অনেক স্থলেই মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দের জন্য সর্বনামের প্রয়োজন হইলে it এই ক্লীবলিঙ্গাত্মক সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। He, she কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Moonএর জন্য she ব্যবহৃত হইলেও countryর জন্য itএর ব্যবহার হয়। এই সকল প্রয়োগের অনুসন্ধান দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যবাচক শব্দেই he এবং sheএর প্রকৃত সদ্‌ব্যবহার হইয়া থাকে। মনুষ্যের অনুরূপ ধর্ম ইতর জীবে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তাহাদের উপর he sheএর প্রভাব বিস্তৃত হয়, নতুবা itই সর্ব্বত্র কার্য্য সাধন করে। যাহাই হউক না কেন, এই তিনটিমাত্র সর্ব্বনামের ব্যবহারে সাহায্য করা ব্যতীত ইংরাজী ভাষায় লিঙ্গসংজ্ঞার কোনও প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গসংজ্ঞার প্রয়োজন আছে কি না। বাঙ্গালা ভাষায় মনুষ্যবাচক পুরুষ বা নারী, যাহাকেই বুঝাক না কেন, তাহার জন্য সর্ব্বনামের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দের, কিম্বা অপ্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে যে সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাহাও লিঙ্গসংজ্ঞার অনুসরণ করে না। বিশেষণাত্মক সর্ব্বনাম মনুষ্যবাচক শব্দ, মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দ এবং অপ্রাণিবাচক শব্দের সহিত প্রায় এক রূপেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর প্রাণী বা অপ্রাণীতে মনুষ্যধর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনরূপ ধর্ম্মের আরোপ করিলে, মনুষ্যবাচক শব্দের অনুরূপ সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সাধারণ লিঙ্গসংজ্ঞা দ্বারা শব্দ যে ভাবে বিভক্ত, তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধই ইহাতে নাই।

শব্দরূপেও দেখা যায়, মনুষ্যবাচক শব্দ, তাহা পুরুষজাতীয় পদার্থবোধকই হউক, আর স্ত্রীজাতীয় পদার্থবোধকই হউক, সকলেরই রূপ এক নিয়মে গঠিত। তদিতর শব্দ প্রাণি-বাচকই হউক, আর অপ্রাণিবাচকই হউক এক নিয়মে গঠিত। এই দুইটি নিয়মের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, অন্যত্র নয়। তবে বাক্যে বিশেষত্ব থাকিলে অনেক সময়, সকল প্রকার শব্দের রূপই এক নিয়মে গঠিত হয়। সুতরাং অন্যান্য ভাষার ন্যায় ইহাতে শব্দরূপরচনায় লিঙ্গসংজ্ঞার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

লিঙ্গ সংজ্ঞার যে প্রভাবটুকু বাঙ্গালা ভাষার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সামান্য অংশই নির্ভর করিতেছে কয়েকটি বিশেষণের উপর। তবে ইহাও বাঙ্গালার নিজস্ব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছোট, বড়, ভাল, মন্দ, কঠিন, নরম, সাদা, কাল, ধল, নীল, লাল, নূতন, পুরাণ, সোনালী, রূপালী প্রভৃতি বিশেষণের এবং এই প্রকার আরও অনেক বিশেষণের লিঙ্গগত কোনরূপ বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলে না। সংস্কৃত ভাষা হইতে আহৃত অনেক বিশেষণ একরূপেই বিভিন্ন লিঙ্গের শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বিশেষণ, বৈদেশিক ভাষা হইতে আহৃত বিশেষণ প্রভৃতিতেও রূপের কোন পার্থক্য নাই।

বালকটি সুন্দর, বালিকাটি সুন্দর বা সরল, ভাষা কোমল, লতাটি সুন্দর, ফলটি মিষ্ট, কথা মিষ্ট, নদী বিশাল, জ্যোৎস্না মনোহর, রাত্রি গভীর প্রভৃতির ব্যবহার বাঙ্গালায় অনবরত হইয়া আসিতেছে। বালিকাটি সুন্দরী বলিলেও, লতাটি সুন্দরী, তাহার কথা মিষ্টা, এই পুস্তকের ভাষা কোমলা, এই প্রকার ব্যবহার কেহ করেন বলিয়া জানা যায় না।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গুণবান্, বিদ্বান্ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক, দেহধারণোপযোগী খাদ্য, পরোপকারী মন বা মনোবৃত্তি মনোরম সন্ধ্যা দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী প্রভৃতি প্রয়োগের অভাব নাই। এই প্রকার বহু প্রয়োগ আছে, যাহাতে লিঙ্গ সংজ্ঞার কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃতে বিশেষণগুলির পুংলিঙ্গে যেরূপ হয়, ঠিক সেই রূপেই সকল লিঙ্গের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক সময় সংস্কৃতের অনুকরণে এই সকল

প্রয়োগে শব্দানুসারে লিঙ্গগত বৈচিত্র্যের ব্যবহার থাকিলেও, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ অপহৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গগত নিরপেক্ষতা ভাষাকে সরলতার পথেই লইয়া যাইতেছে। পুনরায় উহা যথাস্থানে প্রয়োগের চেষ্টা করিলে, জটিলত্য বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইবে। বাঙ্গালার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইবে। জানি না সুধীবৃন্দ ইহার সমর্থন করেন কি না।

বতুপ্-মতুপ্-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ এবং ক্বসুপ্রত্যয় নিষ্পন্ন বিদ্বস্ বিশেষণ পুংলিঙ্গরূপে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, কিছু শ্রুতিকটু হইয়া থাকে, যেমন মহিলাটি গুণবতী, বুদ্ধিমতী, বিদুষী না বলিয়া, মহিলাটি গুণবান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ বলিলে সুশ্রাব্য হয় না। অবশ্য এইগুলিকে বিধেয়-বিশেষণ রূপে ব্যবহারে লিঙ্গের প্রশ্ন না উঠানও যাইতে পারে। কারণ, শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে পারিভাষিক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ এই রূপের দ্বারা তৎতদ্গুণ-সম্পন্ন নারীকেই বুঝাইয়া থাকে, ইহাদের পর পৃথক্ বিশেষ্যপদের প্রয়োজন হয় না। সুন্দরী শব্দও ঠিক এইপ্রকার, অসাধারণ সৌন্দর্য বিশিষ্ট নারীর সমানার্থক শব্দ। যাহা হউক, এই কয়েকটি সংস্কৃতমূলক বিশেষণ ব্যতীত, অন্যত্র লিঙ্গ সংজ্ঞার প্রয়োজন বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। অতএব ইহাকে "লিঙ্গনিরপেক্ষ ভাষা বলা যাইতে পারে।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

॥ ছন্দ ॥

মনে মনে হাসে চণ্ডী পড়িল চামর।
উদগ্রজ দিতিসুত কাঁপে থরথর ॥
রণে লাম্বে মহাসুর বলে মার মার।
আকর্ণ পূরিয়া দেই ধনুকটঙ্কার ॥
খর তিন বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ব্যাপিল তিন বাণে ॥
ত্রাসে পলায় বিধি দেব হরিহর।
পবন বরুণ ধর্ম্মরাজ পুরন্দর ॥
বসু সন্ধ্যা বসুমতী পুণ্যজননাথ।
রবি শশী বলে আজি পড়িল প্রমাদ ॥
জনমিঞা যুবতী করিল কোন কাজ।
সহিতে নারিল যুদ্ধ হইল বড় লাজ ॥
তেজিয়া বিক্রম সুরগণে তেজে অস্ত্র।
জীবনে কাতর কেহ না সম্বরে বস্ত্র ॥
পলায় দেবতা দেবীগণ নাহি রহে।
[২৮ক]একেলা ত্রিপুরা প্রাণপণে যুদ্ধ সহে ॥
উঝটে উপাড়ে শিলা পর্ব্বত বিশাল।
উপাড়িল গাছ গিরিসম যার ডাল ॥
কোপে দেবী ক্ষেপে বৃক্ষ পর্ব্বত সমগ্র।
ধনুক ভাঙ্গিয়া বীর পড়িল উদগ্র ॥
বিষম হস্তীর দন্ত মুটকীর ঘায়।
তাম্র অন্ধক বাণে ধরণী লোটায় ॥
উগ্রাস্য উগ্রবীর্য্য বীর মহাহনু।
ত্রিপুরা বিন্ধিল শূলে তিনজনার তনু ॥
অসি ভিন্দিপাল বীর পড়িল বিড়াল।
পড়িল পর্ব্বত যেন পরশে পাতাল ॥
যত সৈন্য পড়ে দেখে মহিষ দারুণ।
ভগবতী ত্রিপুরা ধনুকে দিলা গুণ ॥
খর শর যুগল ধনুকে দেই টান।
দৃঢ় বাম মুষ্টিক দক্ষিণ ভুজে বাণ ॥
ক্ষেপিল যুগল শর করিয়া সন্ধান।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ পড়ে তেজিয়া পরাণ ॥
পড়িল সকল সৈন্যে দেখে দৈত্যনাথ।
আনন্দে পূরিল তনু না জানে বিপদ ॥
ধরিয়া মহিষতনু কোপে লাম্বে রণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

॥ বাড়ারি অথ মল্লার ॥

বীর বুঝে রে পাতিয়া অবতার।
কহে দেবগণে আজি নাহিক নিস্তার ॥
ধরণীর ধূলি পেলে চরণকমলে।
গগনমণ্ডল ব্যাপিল আঁধিয়ারে ॥
শৃঙ্গ যুগল দেই পর্ব্বতের মূলে।
ঈষতে টানিয়া পেলে গগনমণ্ডলে ॥
চারি খুর আরোপে কূর্ম্মের লাগে পিঠে।
ক্রোধিত মহিষ অনল জ্বলে দিঠে ॥
ঈষত কাঁপায় শৃঙ্গ যেন মেরুদণ্ড।
বিভেদ পাইয়া মেঘ হইল খণ্ড খণ্ড ॥
খরসান কৃপাণ বিষাণ দুই খান।
হেট মাথা করি রহে যমের সমান ॥
শত শত পর্ব্বত উড়ে নাসিকার ঝড়ে।
লেজের বিক্ষেপে সপ্ত সমুদ্র উথলে ॥
টল টল করে ক্ষিতি রড় দিয়া বুলে।
বীরডাকে দেবতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ॥
মহিষবিক্রমে কো[২৮]পে কাঁপে ভগবতী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥

॥ বারাড়ি ॥

দৈত্যপ্রভু দেবরিপু মহিষ দুর্জ্জয়বপু
জয় অজয় রণমাঝে ।
বাড়ে বীর অবিরত যেন বিন্ধ্যপর্ব্বত
দেখিয়া তরাস দেবরাজে ॥
বিষাণে জলধি বিন্ধে রবি শশী পথ রুন্ধে
ডরে কূর্ম্ম কাঁপে থর থর ।
চণ্ডীর সমুখে চলে চরণকমলভরে
ঘন পড়ে উঠে ফণীশ্বর ॥
বিষম বিক্রম করে কোন জন বধে খুরে
শৃঙ্গে বিদারে কোন জনে ।
লেজের বিক্ষেপে মারে বদনে প্রহারে কারে
কোন জন বধিল ভ্রমণে ॥
ছাড়য়ে বিষম ডাক কুমারের যেন চাক
ফিরে চক্ষু অরুণ কিরণ ।
ধায় বীর অতি বেগে কেহ দেখে নাহি দেখে
মূর্চ্ছিত পড়য়ে দেবগণ ॥
মরুতাগ্নি ধর্ম্মরাজ রাজ রাজ দ্বিজরাজ
আর যত দেবতা কাতর ।
পলায় দেবের জেঠ লাজে মাথা করে হেট
জিষ্ণু বিষ্ণু মৃগাঙ্কশেখর ।
নাসিকাপবনঝড়ে কারে ক্ষিতিতলে পাড়ে
সিংহে বধিতে করে মন ।
পূরে দেবী সিংহনাদ বাহন মৃগের নাথ
মহারবে পূরিল গগন ॥
অম্বিকা হুঙ্কার ছাড়ে অতি কোপে লাফ ছাড়ে
অসিতনয়ন শতদল ।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

খরশৃঙ্গ মহিষ সত্বরে অবতরে ।
নাগপাশে ত্রিপুরা বান্ধিল দৈত্যেশ্বরে ॥
রণে বন্দী মহাসুর পাইল বড় লাজ ।
তেজিয়া মহিষতনু হৈল মৃগরাজ ॥
দেখিয়া কেশরী কোপে হানিল ভবানী ।
তৎকাল পুরুষ চর্ম্ম খর খড়্গপাণি ॥
মহামায়াসুর ক্রোধে ভগবতী দেখে ।
হানিল হুঙ্কার দিয়া চণ্ডী নাহি সহে ॥
উলটি হানিল চণ্ডী [২৯ক] না জানে বিষাদ ।
ছিণ্ডিল পুরুষ গজ হইল অচিরাত ।
দেবীর বাহন সিংহ কর দিয়া টানে ।
রুষিল ত্রিপুরা মায়াগজের গর্জ্জনে ॥
খরসান কৃপাণ হানিলা ভগবতী ।
গজশুণ্ড ছিণ্ডিল রুধিরে বহে ক্ষিতি ॥
করহান করিকর নাহি করে ভয় ।
পুন মহাসুর হয় মহিষ দুর্জ্জয় ॥
উঝটে উপাড়ে শিলা পর্ব্বত পাথর ।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে কাঁপিল চরাচর ॥
অসুরদলনী জয়া জগতের মাতা ।
রুষিল ত্রিপুরাদেবী মধুপানে রতা ॥
আনন্দে মহিষ নাচে রণমত্তমনা ।
খল খল হাসে চণ্ডী অরুণলোচনা ॥
রুষিল মহিষ রণে বাজে জয়ঢাক ।
বিষাণে পর্ব্বত বিন্ধে ছাড়ে বীরডাক ॥
অম্বিকায় পর্ব্বত মারে পেলিয়া বিষাণে ।
অম্বিকা পর্ব্বত চূর্ণ কৈল নিজ বাণে ॥
বিশাললোচনী বলে গদগদ বাণী ।
শুন রে মহিষ তোর বল বুদ্ধি জানি ॥
ক্ষেণেক গরজ মূঢ় রণে মহারম্ভ ।
মধুপান করি আমি তাবদ বিলম্ব ॥
আমার বচন কোন কালে নহে মিথ্যা ।
হানিলে মস্তক তোর গর্জ্জিব দেবতা ॥
এ বোল বলিয়া দেবী লাফ দিয়া উঠে ॥
ত্রিশূল কৃপাণ হাথে মহিষের পিঠে ॥
ছুটিল মহিষাসুর যেন বিন্ধ্যাচল ।
দেখিয়া দৈত্যের বল দেবতা সকল ॥
রুষিল ত্রিপুরা ভগবতী সেইক্ষণে ।
গলায় চরণ দিয়া বিন্ধে শূল বাণে ॥

মাথা পাতি মহাসুর ধীরে ধীরে যায়।
মহিষবদনে রহে অর্দ্ধখান কায় ॥
ত্রিপুরার তেজে অর্দ্ধ শরীর লুকায়।
খরখড়্গপাণি বীর চিন্তিল উপায় ॥
হানিতে উদ্যম কৈল ত্রিপুরার গায়।
মায়া[২৯]বিনী বুঝিল দৈত্যের অভিপ্রায় ॥
হানিল মহিষমুণ্ড ধরণী লোটায়।
পড়িল মহিষদৈত্য বলে হায় হায় ॥
দিতির নন্দন বিনাশিল ভগবতী।
আনন্দ হইল দেব ঋষি করে স্তুতি ॥
নানারূপ বেণুযন্ত্র বাজায় মৃদঙ্গ।
অপ্সরাগণে নাচে নহে তালভঙ্গ ॥
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেবগণপ্রীতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপা।
চণ্ডবিনাশিনী চণ্ডী তুমি কর কৃপা ॥
উজ্জ্বলদশন নবশশীশিরোমণি।
প্রেতবিনাশিনী দেবী কিরীটী কুণ্ডলিনী ॥
কে জানে তোমার মায়া তুমি নগের নন্দিনী
অনন্তরূপিণী জয়া যোগীর জননী ॥
ত্রিমাত্রা ত্রিগুণ ত্রিকা ত্রিশূলধারিণী।
ত্রিপুরা ত্রিদেব ধনী কর্পর খড়্গিনী ॥
বিশাললোচনী নরমস্তকমালিনী।
ত্রিপুরসুন্দরী জয়া বাশুলী রঙ্গিণী ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি মরালগামিনী।
কমলা ভগবতী হরিহৃদয়বাসিনী ॥
ত্র্যম্বরা ঈশ্বরী [তুমি] ত্রিপুরঘাতিনী।
সেবকবৎসলা শিবা হরের গৃহিণী ॥
ত্রিবদ্ধশকতি ত্রয়ী ত্রৈলোক্য তির্ব্বতী।
ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্ম তৃতীয় ভগবতী ॥
নিশব্দ সকল লোক শব্দের জননী।
কল্পের নিয়মে দেবী দেবারিদলনী ॥
চারিদশ লোকে যত নিবসে মূরতি।
কারণে বুঝিতে পারি যেইজন সতী ॥
মহাদি প্রলয়ে মরে ব্রহ্মাদি গীর্ব্বাণ ॥
তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান।
তুমি যারে কর কৃপা সে জন সুকৃতি।
ধন্য সর্ব্বগুণে সেবি ক্রমে শুদ্ধমতি ॥
আপদ সম্পদ [৩০ক] হেতু সুমতি কুমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ ইতি মহিষাসুরবধ সমাপ্ত ॥

নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী কিং জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভুবা
সদাস্তু মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥

॥ পঞ্চম পালা সমাপ্ত ॥

নিবাতকবচ পূর্ব্বে ছিলা মহাবল ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ তার তনয় যুগল ॥
প্রবেশিলা তপোবনে দুহেঁ শুদ্ধমতি।
অন্যোহন্য মানসে দুহেঁ সেবে পশুপতি ॥
বাহিরে ভিতরে মন ভ্রূমধ্যভাগে।
নিরবধি দুই ভাই শিব শিব জপে ॥
নাসিকায় না লয়ে গন্ধ অনিমিষ আঁখি।
মৎস্য অভিলাষী স্রোতজলে যেন পাখি ॥
নয়নে না দেখি কিছু না শুনি শ্রবণে।
চিত্রের পুত্তলি যেন রহিল ধেয়ানে ॥
চারি ছয় দশ বার যোল দুই কুল।
তাহার উপরে পদ্ম সহস্র কমল ॥
যমুনা ভারতী গঙ্গা বহে এক রূপ।
ক্ষুধা তৃষা হরিল নাহিক ভূতভুক ॥
ফুটিল কমলরাজ দশশতদল।
তথি মধু পিয়ে মত্ত চপল ভ্রমর ॥
বাহিরে চঞ্চল বড় ভিতরে নিশ্চল।
স্থলশূন্য তনু তিন লোকে অগোচর ॥
মধুপানে মাতিয়া ভ্রমরা ধূলি খেলে।
শক্তিরূপিণী দেবী প্রকাশিল কোলে ॥

ত্রিপুরার মায়ায় সমাধি পরিহরি।
কবিচন্দ্র কহে দৈত্য পূজে ত্রিপুরারি ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

প্রতিমা সাক্ষাত কৈল মহেশ মুরতি।
তোমার চরণ বিনু আর নাঞি গতি।
করবর্ত্তি প্রহার করিয়া দশাঙ্গুলি।
শোণিত করিয়া ঘৃত রচিল দীপালি ॥
নৈবেদ্য করিল মাংস ভক্তি অনুরূপ।
দশন করি[৩০]য়া চূর্ণ করে গন্ধধূপ ॥
অস্থি খণ্ড খণ্ড পুগ রসনা তাম্বুল।
তপ করে মন তাঁর নহে প্রতিকুল ॥
কাটিয়া আপন মুণ্ড দেই শিবপদে।
অখণ্ড কমল যেন ফুটে পুণ্য হৃদে ॥
সেবকবৎসল প্রভু মহেশের বরে।
পুনঃ পুন হয়ে মুণ্ড যুগল কন্ধরে ॥
শোণিতসম্ভব জবা পুষ্পের বিকাশ।
তিমির নাশিতে যেন রবির প্রকাশ ॥
অনাহারে দুই ভাই দ্বাদশ বৎসর।
অবিরত পূজে নগনন্দিনীঈশ্বর ॥
আইল বসন্ত ঋতু ফুটে নানা ফুল।
বিরহী জনের মন হইল আকুল ॥
কোকিল নিনাদ করে কলরব ভৃঙ্গ।
হেনকালে সাক্ষাত হইলা ভোলালিঙ্গ ॥
ললাটে নূতন শশী শিরে গঙ্গা বহে।
জটিল পুরুষ ভস্ম ভূষিলেক দেহে ॥
ত্রিশূল ডমরু ভুজ গলে সিংহনাদ।
হৃদয়ের মাঝে শোভে ভুজগের নাথ ॥
শ্রবণে ধুস্তুর ফুল ভুজঙ্গ কুণ্ডল।
স্মিত উচ্চ সিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডর ॥
মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী।
কান্ধে লাম্বে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধ ঝুলি ॥
মকর কুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি।
চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পূর্ণিমার শশী ॥

পঞ্চ বয়ন ত্রিনয়ন ভূতেশ্বর।
পরিয়া বাঘের ছাল বলদ উপর ॥
শুন রে নিশুম্ভ শুম্ভ দুহেঁ মাগ বর।
তোরে বর দিয়া যাব ত্রিদশনগর ॥
শম্ভুর বচনে শুম্ভ নিশুম্ভ সোদর।
কাকুতি করিয়া ধরে চরণকমল ॥
চারি চারি মুরতি সকল দেবনাথ।
যুদ্ধের সময় মোর হব অষ্ট হাথ ॥
যদি বর দিবে মোরে দেব ত্রিপুরারি।
জিনিব অমরনাথ শচী হব নারী ॥
শুন হিণ্ডি প্রিয়তম বলে শুম্ভানুজ।
[৩১ক] যুদ্ধের সময় হব অযুতেক ভুজ ॥
সত্য সত্য বলে চারিদশলোকনাথ।
বর দিয়া লুকি শিব জন্মিল উতপাত ॥
ঘোর গরজন মেঘে হয় বজ্রপাত।
বিজুরি তিমির ঘোর বহে চণ্ড বাত ॥
বর পাইয়া দুই ভাই পরিতোষ মনে।
কবিচন্দ্র কহে গেল আপন সদনে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

কুটুম্ব বান্ধব প্রজা পাইল পীরিতি।
অসুরে মেলিয়া শুম্ভে কৈল নরপতি ॥
দুই ভাই সহোদর নিবসে নানা সুখে।
জিনিল যতেক দেব ছিল সুরলোকে ॥
শুন নৃপ দেবতা ছাড়িল পুন সুখ।
শতমখ জিনিঞা হইল মখভুক ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ ধূম্রলোচন।
যাহার সমুখে স্থির নহে দেবগণ ॥
কি কহিব বিপরীত কালকেয় শৌর্য্য।
বিধি হরিহর কাঁপে চলে যদি মৌর্য্য ॥
ধৌম্র দৌহ্বদ কোটিবীর্য্য মহাবল।
চলিতে বাসুকী কাঁপে ক্ষিতি টলটল ॥
দিগ্‌গজ কাতর হয় কূর্ম্মে লাগে ভয়।
রাত্রি দিবা নহে রবি শশীর উদয় ॥

যেরূপ মহিষ শুম্ভ করে অধিকার।
আপুনি উদয় চন্দ্র দশ দিগপাল॥
দেবতা ছাড়িল স্বর্গ অসুরের ডরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে॥০॥

॥ শ্যামা রাগ ॥

ব্রহ্মা হরিহর জপে নিরন্তর
ব্রহ্মে দিয়া পুন মন।
ত্রিপুরাধিক বল নাহিক নির্জ্জর
চারিদশ দেখিল ভুবন॥
কান্দে রে দেবগণ ধরণী লোটায়
বিষাদ ভাবিয়া মনে বসিল দেবগণে
বিধাতা চিন্তিল উপায়॥
দানবদলনী পূর্ব্বে আপুনি
দেবতাগণে দিলে বর।
ত্রিপুরা ভবানী হরের ঘরণী
চিন্ত অকারণে কর ডর॥
ব্রহ্মার বাক্যে দেবতার পক্ষে
বিস্মরণ ছিল ভগবতী।
[৩১] মহিষাসুর বধে তারিলে আপদে
তুমি দেবী দেবতার গতি॥
রক্ষ রক্ষ হর- কামিনী উদ্ধার
ত্রিভুবনেঽপরাজিতা।
পূর্ব্বে দিলে বর তারিব আপদ
জগতঈশ্বরী মাতা।
স্তুতিপর দেবগণ সত্বর নিরসন
উপনীত হিমগিরি মাঝে।
মুকুন্দ রচিল বাশুলীমঙ্গল
ত্রিপুরাচরণাম্বুজে॥০॥
আর না যাইব ও না পথে।
পথের কণ্টক যদুনাথে॥০॥

নিশুম্ভসোদর শুম্ভ বলে মহাবল।
দেখিল ত্রিদেব হৈতে দেবতা সকল॥
জিনিঞা মধ্যম লোক ত্রিদেব পাতাল।
আপুনি উদয় চন্দ্র দশদিগপাল॥

অমর নগরে হৈল ত্রিদশের নাথ।
সচী সীমন্তিনী নিত্য পরে পারিজাত॥
আপনা গুপত করি কেহো কেহো বুলে।
মনুষ্য সদৃশ দেব ভ্রমে ক্ষিতিতলে॥
পূর্ব্বে বর দিলে তুমি আপুনি শঙ্করী।
আপুনি নাশিবে যত অসুরের পুরী॥
নমো দেবি ভগবতি জয় বিষ্ণুমায়া।
দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়া॥
তব পদে প্রণতি ত্রিদশ একমনা।
সুমতি কুমতি ভয় প্রকৃতি চেতনা॥
তুমি তুষ্টী তুমি পুষ্টী জগতজননী।
তুমি লজ্জা মতি ভ্রম ক্ষমা তপস্বিনী॥
জন্ম জরা যৌবন মরণ বাল্য হেতু।
গ্রহ বার তিথি যোগ অয়ন মাস ঋতু॥
তুমি জয়া বিজয়া কমলা অকমলা।
দশ শত কিরণ পীযূষনিধি কলা॥
তুমি নিদ্রা জাগরণ স্বাহা স্বধা কান্তি।
তুমি জাতি ক্ষুধা তৃষ্ণা নমো দেবি সন্তি॥
বিধি হরিহর লোক ত্রিদেব রূপিণী।
সৃজন পালন মহাপ্রলয় কারিণী॥
ভুবনজননী তুমি অনাথের নাথ।
কাতর জীবন দেব করে কাকুবাদ॥
রক্ষ রক্ষ ভগবতি বিষম সঙ্কটে।
মহাদুঃখ উপজিল দেবীর ললাটে॥
ব্রহ্মে মন দিয়া দেবী করে অবধান।
জানিল হৃদয়ে [৩২ক] দেবতার অপমান॥
সেবকবৎসলা হিমঘরে অবতরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে॥০॥

॥ মালসী ॥

স্নানের ছলে চারিদশলোকেশ্বরী।
ত্রিদশতটিনীতটে হাথে হেম ঝারি॥
মজিতে তাহার জলে পুছে ভগবতী।
তোমরা সকল দেব কারে কর স্তুতি॥

শুন রে সুরথ চণ্ডী উরিলা আপনি।
শক্তিরূপিণী জয়া দানবঘাতিনী॥
কহে ত্রিনয়নী তনু তনুকৃত সতী।
নিশুম্ভ শুম্ভের ভয় মোরে কর স্তুতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যত ক্রতুভুক।
নির্ভয় চলহ সভে ঘুচাইব দুঃখ॥
তনুকোষে জনমিলা দ্বিতীয় রূপিণী।
কৌষিকী বলিয়া স্তুতি করে দেব মুনি॥
প্রথম শরীর তাঁর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
কালিকারূপিণী হিমালয় কৈল স্থান॥
কৌতুকে নিবসে মধুমতী হিমাচলে।
জয় জগত্রয়ী মোহন রূপ ধরে॥
চণ্ড মুণ্ড দেখিলেক শুম্ভ অনুচর।
রড় দিয়া কহে গিয়া নৃপতি গোচর॥
অবধান কর দেব নিশুম্ভের ভাই।
যে দেখিল নিজ আঁখি নিবেদিতে চাহি॥
নাসিকাবিবরে ঘন খর শ্বাস বহে।
কহ কহ বলে শুম্ভ কবিচন্দ্র কহে॥০॥

শুন শুম্ভ মহাশয়   এক কন্যা হিমালয়
অপরূপ দেখিল সুন্দরী।
গন্ধর্ব্ব সুকুমারী   কিবা সে দেবের নারী
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী॥
দেখি তার মুখরুচি   মলিন হইল শশী
উদয় না করে দিন লাজে।
প্রবাল বান্ধুলি ফুল   রঙ্গ বিম্ব নহে তুল
যদি তাঁর অধরের কাছে॥
দেখি তাঁর সুনয়ন   অভিমানে গেল বন
নগর তেজিয়া কৃষ্ণসার।
দেখিয়া তাঁহার শ্রুতি   গিধিনী চঞ্চলমতি
ফিরি ফিরি বুলয়ে সংসার॥
দেখিয়া [৩২] তাঁহার কচ চামরী পাইল লাজ
অভিমানে গেল বনবাস।
সীমন্তে সিন্দুর সাজে   দেখি সশঙ্কিত লাজে
শক্রধনু জলদে প্রকাশ॥
জিত খগমুনি নাসা   বসন্ত কোকিলী ভাষা
স্মিত বিকশিত কুন্দচয়।
দেখি তাঁর পয়োধর   যুগল দাড়িম্ব ফল
অভিমানে বিদরে হৃদয়॥
জিত কম্বু তার কণ্ঠ   সুবলিত ভুজদণ্ড
কি কহিব দশনের জ্যোতি।
কহি আমি দৃঢ় করি   উপমা করিতে নারি
সিন্দুরে সিন্ধু যে জড় যদি॥
তাঁর গতি শিখিবারে   মরাল মন্থর চলে
গজরাজ সেবে পুরন্দর।
তার মাঝা অভিসাত   জিনিঞা মৃগের নাথ
উরুযুগ জিনি করিকর॥
নাভি গভীর সর   কনক চম্পক দল
রুচি মনোহর নিতম্বিনী।
তাঁর মুখ ফুলগন্ধ   তেজে শ্রম মকরন্দ
অভিনব জিনিঞা পদ্মিনী॥
ইন্দ্রের পারিজাত   গজ তুরগের নাথ
বিধাতার হংসবিমান।
যার সখা বৃষপতি   তার মহাপদ্মনিধি
তোমার অঙ্গনে বিদ্যমান॥
পঙ্কজ গ্রন্থিত মাল   নহে ম্লান অবিশাল
জলনিধি দিল পরিতোষে।
কনক প্রসবে ছত্র   বরুণের সেই মাত্র
প্রতিদিন তব ঘরে বৈসে॥
জলনিধি দিল পাশ   যাহার অমিঞাভাস
যত ছিল আপন রতন।
উৎক্রান্তি দান শক্তি   বিশেষে করিয়া ভক্তি
ভরে দিল সহস্র কিরণ॥
বহ্নিশুদ্ধ অম্বর   দিল তোমায় সত্বর
হুতাশন জীবনের ডরে।
প্রজাপতি পূর্ব্বরথ   তব পদে অনুগত
যত রত্ন তোমার মন্দিরে॥

তুমি দৈত্য অধিকারী অনুচিত নাহি বলি
যে দেখিল তোমার কিঙ্কর।
যদি তোমার মনে লয় কর তারে পরিণয়
তুমি নাথ নিশুম্ভসোদর ॥
চণ্ড মুণ্ড একযোগে কহিল শুম্ভের আগে
অঞ্জলি করিয়া পুটহাথ।
[৩৩ক] ধনি ধনি ঘোষে জন শুনিঞা হরিষ মন
সুগ্রীবে ডাকিল দৈত্যনাথ ॥
দূত হইয়া চল তথা পদ্মিনী নিবসে যথা
তার ঠাঞি কথিয় উচিত।
সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিত ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

শুম্ভ পুন পুছয়ন্তি ॥

কথ অরে চর রজত ভূধর
পঙ্কজিনী কত রূপ।
শুনহ সঙ্গর বিজিত নির্জ্জর
সকললোকভূপ ॥
হরীশবাহিনী নৃমুণ্ডমালিনী
কাতি কর্পর হাথ ॥
অলকনিন্দিত কনক কুণ্ডল
বিজিত চামরীনাথ ॥
দশননিন্দিত কুন্দকোরক
বদননিন্দিত চাঁদ।
নয়ননিন্দিত খঞ্জ বিটক
শ্রবণনিন্দিত ফাঁদ ॥
সহজ নাগজ তিলকনিন্দিত
মিহির মণ্ডল কোটী।
নাসিকা জিত অরুণসোদর
বিহগনায়ক ত্রোটী ॥
ভ্রূহিনিন্দিত কুসুম শায়ক
চাপ উদ্ভট্ট রাগ।
কজ্জলাক্ত নয়ন মাধব
কোকিলানন বাক ॥
ভুজবিনিন্দিত জলরুহাঙ্কুর
কণ্ঠনিন্দিত কম্বু।
অধর দূষিত বিম্বা মর্জ্জর
কুচবিনিন্দিত শম্ভু ॥
মধ্যনিন্দিত ডমরু সুন্দর
নাভিনিন্দিত কূপ।
শ্রোণীভূষিত কনকনির্ম্মিত
কলস অদ্ভুত রূপ ॥
উরুবিনিন্দিত কুম্ভ সুন্দর
খণ্ড মন্থর জানু।
চরণ দূষিত রকতপঙ্কজ
নখর তারক ভানু।
দেব নরবর রত্ন সাগর
শুম্ভ দানবরাজ।
বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুন্দ মুখবর
সাধ তুহু নিজ কাজ ॥০॥

॥ মল্লার ॥

নিশুম্ভ পুনঃ পুছয়ন্তি ॥
দেখিল রূপসী রায় ত্রিপুরকামিনী।
গলে মুণ্ডমালা কাতি কর্পর ধারিণী ॥
[৩৩] চাঁচর চিকুর ঘন কবরীশেখরী।
মালতীর মালা তথি ভৃঙ্গ করে কেলি।
সিন্দুর তিলক চন্দন রেখ ভালে।
দরশ পাইয়া রবি শশী করে কোলে ॥
নয়নে কজ্জল মুখে হাস্য প্রবীণ।
বিকচ কমলে যেন চরে কলাটিন ॥
অধর বান্ধুলি নাসা তিলফুল ভাঁতি।
পাকিল দাড়িম্ববীজ দশনের জ্যোতি ॥
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে।
উইল তাহার রুচি রুচির কপোলে ॥
রজতরচিত হার উরে পয়োধরে।
ভুজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥

দ্বিভুজে সরল শঙ্খ আগে পিছে মণি।
কনকের লতিকায় বেঢ়ল শেষফণী ॥
নাভিবিবরে লোম সাপিনীর বাস।
কুচগিরি নিকটে চরিতে করে আশ ॥
কৃশ মাঝা নিতম্বিনী উরু করিকর।
চরণ যুগল জিনি রকতকমল ॥
রুচির অঙ্গুরি নখ নবতারা পাঁতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

বলে শুম্ভ শুন শুন দূত মহাশয়।
বিলম্ব না কর ঝাঁট চল হিমালয় ॥
কহিয় বিনয়ভাবে বচন পীরিতি।
যতেক আমার হয় দৌত্য নরপতি ॥
এতেক বলিয়া তারে দিল ফুল পান।
ভিড়ন করিয়া দিল দৈত্য বলবান ॥
নৃপতির আদেশে সুগ্রীব দূত চলে।
প্রণাম করিয়া দোলায় দেহ হেলে ॥
হিমালয় গিরি চলে নৃপতির কাজে।
হাথী ঘোড়া পাইক প্রচুর কাছে কাছে ॥
দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাজে শঙ্খ বেণী।
দগড় কাঁসর ভেরী সুললিত শুনি ॥
কর্পূর তাম্বুল খায় হরষিত মনে।
নগর তেজিয়া বীর প্রবেশিল বনে ॥
মথিয়া তবক সিনি ঘন ঘন পেলে।
ধুঙানি বেঢ়িল নিশি যেন আঁধিয়ারে ॥
ঢেকি নিঞা [৩৪ক] ধানুকী ফরকী সর ধরে।
পলায় বনের জন্তু জীবনের ডরে ॥
বাঙ্গালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
সমুখে দেখিল হিমালয় মহীধর ॥
রূপে ত্রিভুবন মোহে বিশাললোচনী।
চৌদিগে বেঢ়িল গিরি পর্ব্বতনন্দিনী ॥
কনক চম্পক ছবি সুরনদীতটে।
দোলা হইতে লাম্বে বীর তাহার নিকটে।

নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥ পাহিড়া ॥

ভগবতী আইস চল আমার বচনে।
শুন ল পদ্মিনী জয়া শুম্ভ তোরে কৈল দয়া
তুহুঁ ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে ॥
কি কহিব তার দম্ভ নিশুম্ভসোদর শুম্ভ
ত্রিজগদীশ্বর দৈত্যনাথ।
আমি অনুচরবর তোর সন্নিধানে পর
লঙ্ঘিতে না পারি অনুবাদ ॥
অখিল দেবতালয় নিল সব মহাশয়
কিঙ্কর তাহার মন্দিরে।
যে কথিল জিতদক্ষ পুরন্দর প্রতিপক্ষ
বিপক্ষ সকল অগোচরে ॥
মোর বশ ত্রিভুবন যতেক দেবতাগণ
আমা বিনু নাহি ক্রতুভুক।
যত রত্ন আছে লোকে আমার মন্দিরে থাকে
কপিলানন্দিনী কামধুক ॥
ঐরাবত সুরগজ জন্মিল তুরগরাজ
যত রত্ন ক্ষীরোদ মন্থনে।
প্রণাম করিয়া ডরে দেবতা সকল মোরে
পরিতোষে কৈল সমর্পণে ॥
গন্ধর্ব্ব যক্ষরাজে দেবালয় মৃগ মাঝে
যত রত্ন আছে ত্রিভুবনে।
তুমি কন্যা দিব্যরত্ন তেঞি সে তোমারে যত্ন
সে সব তোমার নিকেতনে ॥
যে শুম্ভ নৃপবর তার তুল্য সহোদর
নিশুম্ভ প্রবীণ বড় রণে।
অনুনয় মোর স্থানে ভজ যেবা তোর মনে
যত সুখ ভুঞ্জিবে [৩৪] ভুবনে ॥
দিতির নন্দন দম্ভ শুনিয়া নিশুম্ভ শুম্ভ
অনুচর রতন ভারতী।
সুমুখী সংহতি সখী হিমালয়ে শশিমুখী
ঈষত হাসিল ভগবতী ॥

শুন শুম্ভনৃপদূত না কথিলে অনুচিত
অবগতি আমার বচনে।
ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

দূত কথিলে যতেক কথা কিছু তার নহে মিথ্যা
নিশুম্ভ ত্রিদশ অধিকারী।
তার জেষ্ঠ শুম্ভ ভাই তারে ধিক কেহ নাঞি
নিখিল পিযুষ ভক্ষ বৈরী ॥
নানা ফুল ফল দিয়া বনে নিবসন হইয়া
সেবিল সদত হরগৌরী।
বড় সুখ রণভূমি প্রতিজ্ঞা কর্য়াছি আমি
গিরিনাথ যোগীর ঝিয়ারী ॥
অনুচর কহ গিয়া নৃপ সন্নিধানে।
যে জন সংগ্রামে জিনে সেই ভর্ত্তা মোর মনে
বড় দোষ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে ॥ধ্রু॥
শুম্ভ নৃপ মহাবল তার তুল্য সহোদর
যেবা জিনে সমরচত্বরে।
আমি শিশু সুন্দরী হইব তাহার নারী
এ বোল কথিল অবিচারে ॥
আসিয়া আমার ঠাঞি যুদ্ধে জিনি দুই ভাই
বিবাহ করুক মোরে সুখে।
বলে সেই অনুচর শুনিল যে দুরাক্ষর
অসহ্য বচন তোর মুখে ॥
প্রজাপতি হরিহর ইন্দ্র আদি যত সুর
যাহার সমুখে স্থির নহে।
করিয়া যুদ্ধের আশ তুমি যাবে তাঁর পাশ
এ দুঃখ আমার প্রাণে সহে ॥
না কর বিলম্ব সখি মোর বোলে শশিমুখি
নিশুম্ভ শুম্ভের চল কাছে।
আসিয়া তাঁহার ভৃত্য হীনবল কোন দৈত্য
চুলে ধরি লৈয়া যায় পাছে ॥
এতাদৃশ নিশুম্ভ বল শুনি শুম্ভ নৃপবর
না করিব পশ্চাত বিচার।

[৩৫ক] শুন শুম্ভঅনুচর কর গিয়া সুগোচর
যে করিতে উচিত তাহার ॥
দূত অভিরোষে ভাষে নঠ হৈলি নিজ দোষে
পরিতোষ নাঞি পাবে মনে।
ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্যার বাণী মনে পাইয়া দুঃখ।
চলিল শুম্ভের দূত হইয়া অধোমুখ ॥
ধীরে ধীরে চলে দূত চাহে চারি দিক।
স্ত্রীর গর্ব্ব কহিব জীবনে থাকুক ধিক ॥
আপনার বলে যুদ্ধ নহে অধিকারী।
প্রভুর আদেশ নাঞি কি করিতে পারি ॥
সাত পাঁচ মনে করি যায় ধাওয়াধাই।
বার্ত্তা কহিতে শুম্ভ নিশুম্ভের ঠাঞি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে ঘন রবে সিঙ্গা।
চণ্ড মুণ্ড বলে নৃপ আইল প্রায় ডিঙ্গা ॥
দোলা হইতে লাম্বে বীর মলিন বদন।
বন্দিয়া দাণ্ডায় শুম্ভনিশুম্ভচরণ ॥
বলে শুম্ভ কহ কহ দূত মহাশয়।
দেখিলে কি না দেখিলে পদ্মিনী হিমালয় ॥
শুম্ভের বচনে দূত বুকে দিয়া হাথ।
কহিতে না পারি নৃপ বড় পরমাদ ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ পাহিড়া ॥

বনমাঝে হিমালয় পদ্মিনী নিবসে তায়
গেলাঙ তোমার নিদেশনে।
কহিল সকল কথা বল বুদ্ধি বিক্রমতা
অধিকার যত ত্রিভুবনে ॥
অবনীনাথ শুনি কন্যা হাসে উপহাসে।
কুটিল নয়ানে চায় চকোরে অমৃত খায়
যেন চাঁদ চন্দ্রিকা প্রকাশে ॥ধ্রু॥

নানা রত্ন অধিকারী   সুরপুরে সচী নারী
জিনিলেক দেবতা সকলে।
যে জিনে সে মোর স্বামী প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি
হরগৌরীর চরণকমলে ॥
রূপে শুম্ভ যশকেতু   আমি তার হব বধূ
যদি তুল্য আমার সংগ্রামে।
নিশুম্ভসোদর শুম্ভ   অকারণে তার দম্ভ
আসুক আমার সন্নিধানে ॥
[৩৫]অসহ্য দুতের বাক্য শুনিঞা নৃপতি মোক্ষ
ক্রোধে যেন জ্বলে হুতানল।
চণ্ডীপদসরসিজে   শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্যার বাণী ক্রোধে পুরে তনু।
মুখখান হৈল যেন প্রভাতের ভানু ॥
অরুণ যুগল আঁখি চাহে ধীরে ধীরে।
কুমারের চাক যেন পাক দিলে ফিরে ॥
মাথার মুকুট যেন গগনেতে শোভে।
উভ করি পেলে খাণ্ডা লাফ দিয়া লোফে ॥
চরণের ঘায় ক্ষিতি করে টল টল।
রবি শশী হইল তার কর্ণের কুণ্ডল ॥
বীর ডাক ছাড়ি ত্রাসে হয়ে ভুমিকম্প।
অনলে পতঙ্গ যেন দিতে যায় ঝম্প ॥
কেহ নেজা পেলে কেহ বাজায় মাদল।
কেহ খাণ্ডা ঝাঁকে কেহ বহে করতল ॥
বীরঢাক বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল।
কাহাল ফুকরে কোথা বরঙ্গের রোল ॥
অবিরত বাজে শঙ্খ খয়েবের খোল।
ত্রিভুবন কাঁপে শুনি অসুরের রোল ॥
কেহ যুঝে কেহ পাঁচে ফিরি ফিরি বুলে।
কেহ শূল পেলে কেহ বৈসে তরুতলে ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে ধন রবে শিঙ্গা।
অসুরপো পাল ধায় রণে রণচিঙ্গা ॥
সাজ সাজ বলে শুম্ভ ডাক ছাড়ে কোপে।
সারথি চালায় রথ রথী রথে চাপে ॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দিই তোলা।
বিফল জনম চাহে যুঝিতে অবলা ॥
হাথী ঘোড়া জিন করে সুবর্ণ পাথর।
তাহার উপর তোলে ছত্তিশ আতর ॥
ঘোড়ায় রাউত চলে গজে গজসাদী।
সমর চতুরে যায় বধিতে বিরোধী ॥
ঘন কাড়া পড়া বাজে দামা দড়মসা।
অনুমানে দেবতা জীবনে তেজে আশা ॥
[৩৬ক] কুমতি জন্মিল আজি কোন দেবতায়।
না জানে আপন বল অসুরে ঘাঁটায় ॥
লুকায় যতেক দেব অসুরের ঠাটে।
পবন লুকায় হস্তী ঘোড়ার খুরপুটে ॥
খাণ্ডায় লুকায় যম ক্রোধে হুতাশন।
কেহ শিশু যুবা বৃদ্ধ অদিতিনন্দন ॥
নৃপকোপ দেখিয়া সুগ্রীব দুত কহে।
অবলাকে সাজিতে উচিত কভু নহে ॥
সিংহাসনে বসিয়া আপুনি থাক সুখে।
চুলে ধরি তারে গিয়া আনুক সেবকে ॥
সুগ্রীবের বচনে নৃপতি মনে গুণে।
ডাক দিয়া দিল পান ধূম্রলোচনে ॥
আমার বচনে তুমি চল হিমগিরি।
চুলে ধরি আন গিয়া পরমসুন্দরী ॥
যদি বা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেব ব্রহ্মা হরি।
রাখিবারে যত্ন করে পরমসুন্দরী ॥
আপনার বলে তার বধিয় জীবন।
প্রণতি করিয়া চলে ধূম্রলোচন ॥
ডাকাডাকি ধাওয়াধাই দিতির তনয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

॥ ঝাঁপা ॥

তুহিন পর্ব্বতে দেবী নিবসে পদ্মিনী।
দেখিয়া অসুরবল বলে উচ্চ বাণী ॥

দেবতা দানব যক্ষ নহে যার মান।
চল ঝাঁটো সখি শুম্ভনিশুম্ভের স্থান॥
যদি বা না যাবে প্রীতে মোর প্রভুর ঠাঞি।
চুলে ধরি লব আমি মিথ্যা নাহি কহি॥ধ্রু॥
অসুরবচনে চণ্ডী বলে ধীরে ধীরে।
তুমি দৈত্যেশ্বর বলবান মহাসুরে॥
বলে তুমি নিবে মোরে বসি একাকিনী।
কি করিতে পারি আমি সিংহবাহিনী॥
চণ্ডীর বচনে কোপে ধাইল অসুর।
অচলনন্দিনী পাশ ধরিতে চিকুর॥
জপিয়া ত্রিপুরা মন্ত্র হুহুঙ্কার ছাড়ে।
ধূম্রলোচন বীর ভস্ম হইয়া উড়ে॥
[৩৬] ধূম্রলোচন ভস্ম দেখি দৈত্যবল।
পলায় পদ্মিনী বলে আগল আগল॥
যুঝিয়া ত্রিপুরা যত দৈত্য করে নাশ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস॥০॥

॥ ছন্দ ॥

কেহ হানে কেহ বিন্ধে কেহ পেলে শিলি।
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে রুষিলা বাশুলী॥
অঙ্কুশ ডাবুশ নেজা হাতে তরোয়ারি।
ত্রিপুরা দনুজ ঠাটে হৈল মারামারি॥
কেহ শেল বহে কেহ শাণিত কৃপাণ।
অবিরত শুনি ঝনঝনি হান হান॥
কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ দুইখান।
লাফ দিয়া হানে কেহ সিংহে দেই টান॥
রুষিল কেশরী রণে করে জয়গান।
কার হাথী ঘোড়া বধে কার বধে প্রাণ॥
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার চুলে দেই টান।
ঘাড় মুচড়িয়া কার করে রক্তপান॥
কন্ধে লুকাইয়া কেহ দেই ভুলকুড়ি।
নেজা খাণ্ডা পেলি কেহ যায় গুড়ি গুড়ি॥
গিধিনী শুকিনী উড়ে মারে মালসাট।
পড়িল অসুরবল ভঙ্গ দিল ঠাট॥

নিশুম্ভের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা।
শুম্ভের নিকটে গিয়া কহিব বারতা॥
পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায়।
পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়॥
অসুরের বচনে ত্রিপুরা পরিতোষ।
কবিচন্দ্র কহে দেবী ক্ষম তার দোষ॥০॥

॥ ইতি ষষ্ঠ পালা সমাপ্ত ॥

॥ সুহই রাগ ॥

গোসাঞি
গেলাম পদ্মিনী কাছে স্থবলিত শঙ্খ ভুজে
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে।
সুনয়ন মুখচাঁদ শ্রবণ আকাটি ফাঁদ
বসনে মস্তক নাঞি ঢাকে॥
কলকণ্ঠ মধু ভাষে ঈষত ঈষত হাসে
শর চর্ম্ম ধনু অসি হাথে।
দেখিয়া অসুরবল ক্রোধে কাঁপে থর থর
চাপিল বিজয়ী মৃগনাথে॥
শুন শুম্ভ দুই ভাই নিবেদি[৩৭ক]তোমার ঠাঞি
জীবন সঙ্কট হিমাচলে।
অবলা কে বলে তারে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
তারে ধিক কেহ নাঞি বলে॥
বলে ধূম্রলোচন শুন লো পদ্মিনী শুন
ভজ মোর প্রভুর চরণে।
না ভজিলে পাবে লাজ সাধিব প্রভুর কাজ
চুলে ধরি লইব এথানে॥
বলে কন্যা বল বেথ পাঁচনি দৈত্যের নাথ
তুমি বলবান মহাসুর।
যদি বলে লবে তুমি কি করিতে পারি আমি
তোমা বিনে কে আছে ঠাকুর॥
অহঙ্কত কন্যার বোলে ধূম্রলোচন চলে
শিরসিজ ধরিতে তাঁহার।
ধাইল তোমার ভৃত্য নিকটে দেখিয়া দৈত্য
ক্রোধে কন্যা ছাড়ে হুহুঙ্কার॥

ভস্ম হইল মহাবল　　দেখি চাহি জল জল
হৃদয় গণিত পরমাদ।
বিষম সমর মাঝে　　কেশরী চাপিয়া যুঝে
না দেখিল তার অবসাদ ॥
পদ্মযোনি হরিহর　　পুরন্দর কিন্নর নর
তুমি নাথ নিশুম্ভসোদর।
হিমগিরি করি লক্ষ্য　　রহিল বিষম দক্ষ
প্রতিপক্ষ করিল গোচর ॥
ঝাঁটো চিন্ত প্রতিকার　　যদি জিবে শুন আর
নিজ রাজ্য রাখিবে সকল।
চণ্ডীপদসরসিজে　　শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

শুনি সক্রজিত দৈত্য মুখের উত্তর।
নিশুম্ভসোদর শুম্ভ সভার ভিতর ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি কিঙ্কর।
প্রলয় পবনে যেন কাঁপে মহীধর ॥
কাহারে পাঁচিব রাজা করে অনুমান।
অবলা হইয়া করে দৈত্য অপমান ॥
কলেবর পুরিত সকল তনুরসে।
বরিখে জলদ যেন জলকণা খসে ॥
নিকটে দেখিল চণ্ড মুণ্ড বলবান।
ডাক দিয়া নিশুম্ভ তাহারে দিল পান ॥
[৩৭] ঘোড়া ছত্র কাপড় প্রসাদ পান ফুল।
সাজল মাতার হাথী নাহি যার তুল ॥
চল হিমালয় গিরি সুরনদীকূলে।
ধরিয়া আনিহ তুমি পদ্মিনীর চুলে ॥
যে রাখে হানিবে তারে বধিহ কেশরী।
বুড়িরে হানিঞা তুমি আনিবে সুন্দরী ॥
শুম্ভের বচনে দৈত্য বলে উচ্চবাণী।
কবিচন্দ্র বলে দেখ আন্যা দি পদ্মিনী ॥ঃ॥

॥ ঝাঁপা ॥

রাজার আদেশে বন্দে জোড় করি কর।
গন্ধ চনদন পরে শিরের উপর ॥
প্রণাম করিতে নৃপে হেট কৈল কাঁধ।
গলায় রত্নের মাল পূর্ণমিক চাঁদ ॥
বীর সাজিল রে প্রতাপ শিরোমণি।
চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই ধরিতে পদ্মিনী ॥ধ্রু॥
তবক বেনক শিলি ছুরি কাছে টাঙ্গি।
ধনুকে টঙ্কার দেই রণে বল রঙ্গি ॥
মাথায় মুকুট পরে গায় আঙ্গরুখি।
মোর দোষ নাঞি আজি রবি শশী সাক্ষী ॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দেই পাক।
দুই চক্ষু ফিরে যেন কুমারের চাক ॥
লাফ দিয়া উঠে বীর চারিদিগে চায়।
কুপিল অসুর ডরে দেবতা পালায় ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন ঘন ঘন গাজে।
ধবল স্ফটিক ঘোড়া চাপে পক্ষরাজে ॥
কূর্ম্ম বাসুকী কাঁপে ক্ষিতি টল টল।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

ঘন ঘন বাজে ঢাক কোথা বাজে ঢাকী।ধ্রু।
সাজ সাজ বলে দৈত্য করে ডাকাডাকি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে বিরল তেঘাই।
চারিদিগে অসুরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
সারথি চাপিল রথে আগে যায় রথী।
মাহুত চাপিল পিঠে পাখরিয়া হাথী ॥
ঘোড়ায় পাখর করে পিঠে দিয়া জিন।
মাথায় টোপর পরে রাউত প্রবীণ ॥
কেহ জিনি পরে গায় দেই আঙ্গরুখি।
উড়িল পদের ধূলি রবি হই লুকি ॥
কেহ লাফ দেই গায় কেহ মাখে ধূলি।
[৩৮ক]কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে কেলি॥
কেহ হান হান বলে কেহ মার মার।
ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার ॥
ত্রিভুবন পূরিলেক শিঞ্জিনীর নাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রপাত ॥

ধাইল অসুর বালা বিপক্ষ বিভাড় ।
পাষাণ বিদরে বহে লোহার চেওয়াড় ॥
কেহ নেজা বহে খাণ্ডা কেহ বহে ছুরি ।
কেহ শক্তি শূল বহে দেবতার অরি ॥
কেহ গদা বহে শেল বলে মহাবলী ।
কাহাল ফুকরে কোথা দোসরি মোহারি ॥
দামা দড়মসা কাড়া বাজে শঙ্খ বেণী ।
ঘাঘরের রোল কোথা নূপুরের ধ্বনি ॥
ঘণ্টার শবদ কোথা বাজে উরমাল ।
অনেক মধুর যন্ত্র বাজে করতাল ॥
দণ্ডি মুহরি বাজে মৃদঙ্গ মাদল ।
সাহুন গাহুন চলে চতুরঙ্গ দল ॥
নিঃশঙ্ক সমরে ধায় অসুরছাওয়াল ।
সমুখে যোগিনীগণ পাছু হইল কাল ॥
রড় দেই স্ত্রীগণ মুক্ত কেশভার ।
ব্রাহ্মণ সকল বামে ডাহিনে শৃগাল ॥
গগনে গিধিনী ফিরে মারে পাকসাট ।
অগোচরে বলে ধর ধর কাট কাট ॥
ঘন শিঙ্গা ফুকরে বরঙ্গে জয়ভেরী ।
চলিল অসুরবল বধিতে সুন্দরী ॥
ছত্তিশ আতর বহে উভ করি হাথ ।
বেঢ়িল তুষারগিরি অসুরের নাথ ॥
ত্রিদশতটিনীতটে দেখে দৈত্যবল ।
কনক শিখরে কন্যা সিংহের উপর ॥
দেখিয়া কন্যার মুখ উপজে হুতাশ ।
শরতে চাঁদ যেন গগনে প্রকাশ ।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

বলে চণ্ড মুণ্ড কন্যা কর অবধান ।
চলহ রাজার [৩৮] ঠাঞি রাখিয়া সম্মান ॥
অবলা হইয়া কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
কে আছে অধম বীর তোরে দেই রণ ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি বিদিত সংসারে ।
হাসিব সকল লোক ত্রিদেবনগরে ॥
উন্মত্ত যৌবনবতী রূপে গুণে ধন্যা ।
বুঝিলু এথন তুহুঁ হিমালয়কন্যা ॥
মারি লেহ আমার প্রধান সেনাপতি ।
বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীঘ্রগতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল এ তিন ভুবন ।
শুম্ভ বিনে অন্যজন নাহিক ভাজন ॥
কহিল তোমারে আমি আপনার কাজ ।
তিলার্দ্ধ কাটিব তোর দুই মহারাজ ॥
এ বোল শুনিয়া দৈত্য বলে মার মার ।
ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার ॥
পাথরে বেষ্টিত বীর করে হিমাচল ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥ ঝাঁপা ॥

শৈলেশ্বরবর কাঞ্চন শিখরে
তাহি গজমাচল পিঠে ।
রূপে ভুবন তিন মোহই ত্রিপুরা
অসুর নিকট ভেল দিঠে ॥ধ্রু॥
চাপ চক্র করি খরতর অসি ধরি
চৌদিগে বেঢ়িলেক বালা ।
অসুরের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিঞা
ক্রোধে রুধির মুখ ভেলা ॥
রুদ্রাণীমুখ সস্মিত দেখিয়া
দানব কম্পই কোপে ।
খরতর খড়্গ ধরি উভু হাথ করি
রণমুখ ঝম্পই বেগে ॥
ভ্রূকুটি কুটিলতর ভালে সমুজ্জ্বর
তৈছন জনমিলা কালী ।
পাশিনী খড়্গিনী মস্তকমালিনী
শূলিনী ঝটিত করালী ॥
বাঘছাল পরি কালী ভয়ঙ্করী
অতিশয় শুষ্ক শরীরা ।

মিল্লিত বহু মুখ　জিহ্বা ডগমগ
বিবসনা দেহ কটোরা ॥
কুম্ভচাক ফিরি　রুধির নেত্র করি
সম্বই ছোড়ই ডাক।
অসুর মাঝ পড়ি　দেব বৈরী লুড়ি
বন ভুব উই চাক ॥
মুষ্টিক ভঙ্গুর　হয়মুখ কুঞ্জর
দন্ত উপাড়ই হাথে।
গজ হয় সর্ব্বই　কড়মড় চর্ব্বই
রথ রথী সারথি পাতে ॥
কাহার কেশ ধরি　মুণ্ড হেট করি
গুণ্ডিম্ করি পদঘায়।
মুষ্টিক ঘাতনে　[৩৯ক] কেহ কেহ লুট্টই
গুড়ি গুড়ি পড়ি কেহ যায় ॥
নেঞ্জা ডাবুস　খরতর বাধিক
কড্ডিয় চর্ব্বই দন্তে।
কতি অসুরাভয়　লুকই রণভু
শ্রীযুত ভনই মুকুন্দে ॥০॥

॥ শ্যামা রাগ ॥

রণভু কালী　বিষম করালী
ঝম্পই না করই শঙ্কা।
সীতার কারণ　দশরথনন্দন-
কিঙ্কর দহে যেন লঙ্কা ॥
টুটিল অনেক সৈন্য চণ্ড মুণ্ড বীর রোষে।
ক্ষেপিল নিশিত শর　বাড়বানল তুল
যেন ঘন জলদ বরিষে ॥ধ্রু॥
সঙ্গরবিজয়ী　চণ্ড মুণ্ড দুই
ধাইল সুর পরিপন্থী।
আগলিল চৌদিগ　বেড়িলেক পত্তিক
হয়বর ময়গল দন্তী ॥
খড্ড উভ করি　সমরে ফিরি ফিরি
নেঞ্জা হাথে অসোয়ার।
সর্ব্বই মাহুত　রণভু পণ্ডিত
ডাক ছাড়ই মার মার ॥
চক্র ক্ষেপিল যত　দারুণ দশ শত
আৎসাদিল কালিকার তনু।
কোপে রুধিরমুখী　হাসই কম্পই
জলদ ভিতরে যৈছে ভানু ॥
উজ্জ্বল দশনা　চঞ্চল নয়না
দরশন ভয়দাননা।
ঘোরতর হুঙ্কার　ছাড়িয়া মার মার
মৃগ নৃপ পিঠে পয়ানা ॥
যুঝ ঝই ত্রিপুরা　রণে অনিবারা
চণ্ডের মুণ্ড ধরি হিক্কে।
গড়াগড়ি জড়াজড়ি　রণভু লুট্টই
মুণ্ড কাটিল তার খড়্গে ॥
চণ্ডাসুর পড়ে　মুণ্ড ধাইল রড়ে
অতি কোপে বরিখয়ে বাণ।
রুষিয়া কালী　হানিল করালী
উভে বীর হইল দুইখান ॥
দেখিয়া দেবীর বল　কেহ চাহে জল জল
সাহসে কোন বীর টুটে।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে　ত্রিপুরাচরণে
দনুজ বিমুখ হইল ঠাটে ॥০॥

॥ মালসী ॥

বহুত করিলে যুদ্ধ দেবতার কাজে।
দেখি ভঙ্গ পড়ে যত অসুর সমাঝে ॥
দানবদলনী জয়া তুমি সুলোচনা।
বিকল দেবের প্রাণ না সহে যাতনা ॥
শুন[৩৯] গ ঈশ্বরী মাতা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
নিবেদি তোমার পায় প্রচণ্ডনাশিনী ॥ধ্রু॥
রণস্থলে দুই ভাই চণ্ডের বিনাশ।
কাটিলে মুণ্ডের মুণ্ড দৈত্য হইল নাশ ॥
তুমি জল তুমি ভুবি তুমি নারায়ণী।
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই বধিবে আপুনি ॥

চণ্ড মুণ্ড সমরে বধিলে ভগবতী।
চামুণ্ডা তোমার নাম রহিল খেয়াতি ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে কবিচন্দ্র কহে।
ত্রাসে পলায় দৈত্য কোথাহ না রহে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

উলটিয়া চাহে কালী বলে মার মার।
রবির কিরণ লুকি হইল অন্ধকার ॥
কোথা ঢাক ঢোল বাজে কোথা বাজে দণ্ডি
রুধিরে কন্দর বহে ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে কেহ যায় রড়ে।
কাপড় সম্বরে নাঞি কোথা উঠে পড়ে ॥
কেহ মরে কেহ জিয়ে আড়াকিয়ে চায়।
চলিতে না পারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গিধিনী শুকিনী শিবা করিল পয়ান।
কেহ মাংস খায় কেহ করে রক্তপান ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ পাক মেলে।
কেহ চিকিচিকি করে কেহ মুণ্ড গিলে ॥
কেহ বৈসে কেহ উঠে গগনমণ্ডলে।
কেহ মুখ মেলে কেহ লাফ দিয়া বুলে ॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস করে টানাটানি।
ঝপ ঝপ উড়ে বৈসে গিধিনী শকুনি ॥
রণভূমি দুর্গত যত হইল রক্তপাত।
লাফ দিয়া চলে বুলে ধুকড়িয়া কাঁক ॥
পড়িল অসুর ঠাট থুইতে নাঞি তিল।
গণিতে পারি যত পড়ে কাক চিল ॥
হাড় মাংস জড় করি গিলে বারে বারে।
হরষিত প্রেত ভুত ত্রিপুরা অবতরে ॥
রড় দিয়া পলাইতে কেহ মরে পথে।
সিংহের উপরে দেখি দেবী পাছু খেদে ॥
[৪০ক] নিশুম্ভের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা
শুম্ভের নিকটে গিয়া কহিতে বারতা ॥
পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায়ে।
পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়ে ॥

শুম্ভের নিকট কেহ উত্তরিল গিয়া।
প্রণাম করিয়া কহে বুকে হাথ দিয়া ॥
জল জল চাহে দৈত্য মুখে নাহি কথা।
কহ কহ বলে শুম্ভ যুদ্ধের বারতা ॥
চণ্ডীর কৃপায় দূত প্রকাশিল তুণ্ড।
কি কহিব গোসাঞি পড়িল চণ্ড মুণ্ড ॥
কি বল কি বল দূত কহ আর বার।
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরা অবতার ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখিল ধবলকায় লাফ দিয়া স্বর্গ যায়
নয়ানে উইল বিবস্বান।
পোষে এক বনজন্তু কথিলে রুষিবে কিন্তু
যত বীর পতঙ্গ সমান ॥
দেব কি কহিব তোমার চরণে।
শুন হে দৈত্যের নাথ বড় হইল পরমাদ
অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥ধ্রু॥
বিকট দশন মুখ বজ্রনির্ম্মিত নখ
অতিরক্ত অধর তাহার।
যদি সে সমরে চাপে চৌদ্দ ভুবন কাঁপে
সুরাসুর নর কোনৎসার ॥
যত ঠাট দেখ সঙ্গে আপনা রাখিহ যত্নে
আমি নিজ তোমার কিঙ্কর।
সমরে কন্যার সম জিনে হেন নাহি জন
প্রতিপক্ষে করিল গোচর।
পর্ব্বত করিয়া লক্ষ্য দৈত্য মারে শতসংখ্য
সিংহবাহিনী ভগবতী।
না থাকিহ নির্ভয় যুবতী লখিল নয়
কিবা করে আজিকার রাতি ॥
অসহ্য দূতের বাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
কোপে জ্বলে যেন হুতানল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বীরদাপ করে কোনৎসার সীমন্তিনী।
কাননবাসিনী তারে চেটীতে না গণি ॥
বুঝিল ললাটে পূর্ব্ব দৈবের লিখন।
যুবতীর হাথে চণ্ড মুণ্ডের মরণ ॥
সাজ সাজ বলে দৈত্য কালঘাম ছোটে।
হৃদয় কাঁপব শুম্ভ মুখে নাঞি টুটে ॥
[৪০] রুষিল নিশুম্ভ যেন জলে হুতানল।
শুম্ভের চরণে ভুজ দেই মহাবল ॥
মোরে আজ্ঞা দেহ দেব তুমি জেষ্ঠ ভাই।
তোমার কিঙ্কর আমি বলিতে ডরাই ॥
নিশুম্ভবচনে পান দেই রক্তবীজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

॥ পাহিড়া ॥

বীর সাজিল রে রকতবীজবর
মোঠন ঘন দেই গোম্ফে।
শুম্ভ মহিষপতি শাসন বন্দিয়া
চৌদ্দ ভুবন যারে কম্পে ॥
রণতূ সজ্জই জয়ঢোল বজ্জই
গুড় গুড় দগড় ন টুটে।
তাজি বাজি ঘন চপ্পই হিক্কই
প্রলয় পয়োধর গাজে ॥
চতুরঙ্গ মহঃবল কোটী কোটী দল
পত্তিয় জয় জয় গানে।
নেঙ্গা ডাবুশ শেল শূল বজ্রাঙ্কুশ
বীর চলহুঁ পয়ানে ॥
সিঙ্গা কাহাল বরঙ্গ ভেরিবর
কাঁসর মধুরিম বাজে।
খড়্গা উভু করি থিপ্পই লুপ্ ফই
প্রলয় পয়োধর গাজে ॥
সুরপুরি লুক্কই বজ্র বিমুক্কই
সমুর সুরপ্পই শঙ্কে।

পদভর লঙ্খিত সমুক্ষিত অদ্ভুত
সর্পনাথ ভয় তঙ্কে ॥
পদভর উজ্জিত ধূলি বিলম্বিত
দশ শত কিরণ মরীচি।
তাজি বাজি ঘন চপ্পই হিক্কই
চলহুঁ গজবররাজি ॥
ঘণ্টা ঘাঘর দড়মসা বজ্জই
সর্ব্বই গজ হয় কান্ধে।
উজ্জ্বল উচ্চতর পতকা সাহুন
গাহুন ভনই মুকুন্দে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

ক্রোধে আজ্ঞা দিল শুম্ভ নিশুম্ভের ভাই।
যত ছিল অসুরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
চৌরাশি সহস্র কম্বু আপনার বলে।
পঞ্চাশ সহস্র চলুক কোটি বীর্য্যদলে ॥
শতেক সহস্র কোটী ধূম্রের সেনাগণ।
না কর বিমুচন আমার শাসন ॥
কাল বেকাল কাল চলুক মোর বোলে।
তেত্তিশ নিযুত কোটি অসুরের কুলে ॥
[৪১ক] চলুক দৌহৃদ কোটি বীর্য্য মহাসুর।
আমার নিদেশে মৌর্য্য চলুক প্রচুর ॥
রাজার আদেশে দৈত্য সমরে পাগল।
কেহ ছুরি বহে টাঙ্গি কেহ করতল ॥
জিনি গায় দিলেক ভিতরে আঙ্গরুখি।
মাথায় টোপর পরে দুই আঁখি দেখি ॥
পাথরিয়া লাখে লাখ মযগল হাথী।
অঙ্কুশ ডাবুশ নেঙ্গা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
বায়ুবেগে কোটি তুরগের বাগ।
পাখরিয়া চাপে যুদ্ধপতি নৃপভাগ ॥
কেহ রথ চাপে কেহ চাপিল মহিষ।
যার দরশনে হয় যমের হরিষ ॥
হাথী ঘোড়া রথ চলে রণে অনিবারা।
ছুটিল মহিষ যেন সুখে খসে তারা ॥

কেহ যুকি বহে শেল কেহ খাণ্ডাফলা।
কেহ লাফ দেই কেহ গোঁফে দেয় তোলা॥
কেহ রড় দেই কেহ গায় মাথে ধূলা।
মকরকুণ্ডল কর্ণে গলে রত্নমালা॥
কেহ হাসে কেহ নাচে মারে মালসাট।
পৃথিবী জুড়িল যত অসুরের ঠাট॥
সুললিত বাজে বেণী খয়েরের খোল।
ধাওয়াধাই রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল॥
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল।
দামা দড়মসা কাড়া বাজে অবিশাল॥
ঘন রণতুর বাজে তরল নিশান।
কেহ শিলি পেলে কেহ হানে ধূলাবাণ॥
কোথা ভেরী বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল
কাহাল ফুকরে কোথা বরঙ্গের বোল॥
জয়বীরঢাক বাজে গুড় গুড় দগড়।
কেহ পড়ে কেহ উঠে না পরে কাপড়॥
ধাইল অসুরবল লক্ষ কোটি কোটি।
উদয়াস্ত গিরিতে নিসঙ্কী পরিপাটী॥
উড়িল চরণধূলি নাহি দিশপাশ।
গগনমণ্ডল কিবা পৃথিবী আকাশ॥
ছত্তিশ আতর বহে উভ করি হাথ।
বেঢ়িল তুষারগিরি অসুরের নাথ॥
টল টল করে ক্ষিতি কূর্ম্মে লাগে ডর।
রবির কিরণ লুকি দিগ্‌গজ কাতর॥
ত্রাসে পলায় ইন্দ্র বিধি হরিহর।
পাছু রক্তবীজ চলে সমরে পাগল॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ মালসী রাগ ॥

ধরণী আকাশ [৪১] পুরে শিঞ্জিনীর নাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত॥
গলায় নৃমুণ্ডমালা বলে সাজ সাজ।
উন্মত্ত হইয়া তত্ন ডাকে মৃগরাজ॥
দেখিল ত্রিপুরা দৈত্য সাজিল আপার।
লাফ দিয়া ধরে ধনু পাতে অবতার॥
অধর চাপিল কোপে বিকট দশন।
মুখ মেলি হাসে কালী কাঁপে ত্রিভুবন॥
ঘণ্টা বাজাইয়া সিংহ নিনাদ ফিরায়।
সেই শব্দ শুনিয়া অসুরবল ধায়॥
গগনে মুকুট লাগে যোগিনীর মেলা।
সিংহের উপর চাপে হাথে খাণ্ডাফলা॥
যুঝহ যোগিনীগণ না ছাড়িহ ডরে।
বিশাললোচনী ঘন সিংহনাদ পুরে॥
যেই যেই দেবের বাহন রূপ ভূষা।
সেই রূপে অবতরে ত্রিপুরা রুধিরাশা॥
দেবতার শক্তিরূপিণী হিমালয়।
দেখিয়া ভীষণ দৈত্য কবিচন্দ্র কয়॥০॥

॥ শ্রী রাগ ॥

কমণ্ডলু অক্ষমালা ধরি ভুজে উরিলা
হংসবাহনে বেদমুখী।
চারি মুখে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ধনী
চপল যুগল যুগ আঁখি॥
বৃষভে চাপিয়া উরে ত্রিনয়নী রূপ ধরে
ডমরু ত্রিশূল ভুজ কান্দে।
ললাটে ভস্মের ফোটা বাসুকী নাগের পাটা
শিরে শোভা করিলেক চাঁদে॥
অবতরে গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
শক্তিরূপিণী ভগবতী।
দানবদলনী জয়া অনন্তরূপিণী মায়া
কৃপাময়ী ত্রিভুবনে গতি॥
কৌমারী অবতরে শক্তি ধরিয়া করে
যাহার বাহন মত্ত শিখী।
হান হান কাট কাট ঘন মারে মালসাট
বিশাললোচনী শশিমুখী॥
চাপিয়া বিহগরাজে যুগল যুগল ভুজে
শঙ্খ চক্র গদা খড়্গিনী।

পরয়ে পিয়ল বাস জলদ বিস্মরি ভাষ
জগদীশ শক্তিরূপিণী ॥
বিষম ধবল দাঁত দ্বিতীয়ার যেন চাঁদ
শিরে শোভে পিঙ্গল কেশিনী।
ধীরি চলে চারি পায় দেখিতে পর্ব্বত[৪২ক]কায়
হরিশক্তি মুখ শূকরিণী ॥
মৃগ নৃপ রূপ পেখি অরুণ কিরণ আঁখি
নৃসিংহরূপিণী দেবী হরা।
ঈষত কাঁপায় সটা বাসুকী নাগের পাটা
গগনে বিকল হইল তারা ॥
ময়গল গজনাথে বজ্র ধরিয়া হাথে
দশ শত নয়নধারিণী।
পুরন্দর প্রতিনিধি উরে দেবী ভগবতী
ইন্দ্রাণী সমররঙ্গিণী ॥
যত দেবী তেজময়ী মহেশে বেঢ়িয়া রহি
আইল দৈত্য শুন গ অম্বিকে।
এক দেবী দেবীদেহে বাহির হইয়া কহে
শতেক শৃগাল যেন ডাকে ॥
শুন দেব কীর্ত্তিবাস নিশুম্ভ শুম্ভের পাশ
দুত হইয়া চলহ বচনে।
বলিহ তাহার স্থানে আসিয়া পশুক রণে
অধিকার দিব ত্রিভুবনে ॥
শুন দেব ক্রতুভুজ ছাড় তোরা দুই লোক
যদি জিবে প্রবেশ পাতাল।
নহে বা করিবে রণ ঝাঁট আইস কহি শুন
তোর মাংসে পূরিব শৃগাল ॥
কহে দেবী অদভুত শিবেরে করিয়া দুত
শিবদূতী তোমার খেয়াতি।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ রহে রণ আশে
গগনমণ্ডলে কার গতি ॥
দেবীর আদেশে হর চলিলা শুম্ভের ঘর
দুত হইয়া কথিল সকল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

মহেশের মুখে শুনি ত্রিপুরার বাণী।
রুষিয়া ধাইল দৈত্যগণ অস্ত্রপাণি ॥
কেহ শক্তি শূল বহে কেহ বহে সাঙ্গি।
কেহ গদা জাঠি পাশ কেহ বহে টাঙ্গি ॥
কেহ চক্র বহে কেহ প্রবীণ মতিয়া।
কেহ গজে চাপে কেহ ঘোটকে চাপিয়া ॥
কেহ নেঙ্গা বহে শিলি চোকল বিশাল।
ধানুকী ধনুক ধরে লোহার চেওয়াড় ॥
খাণ্ডা ফলা দোয়াড় তবক কার হাথে।
মহারথী সারথি সংহতি চলে রথে ॥
ছত্রিশ আতর বহে মাথায় টাটুনি।
[৪২] উপনীত হইল যথা নিবসে পদ্মিনী।
সাবধানে মহাবীর লাম্বে মহাযুদ্ধে।
কেহ তীর বিন্ধে কেহ হানে পরশুদ্ধে ॥
কেহ শক্তি শূল গদা ক্ষেপিল রথাঙ্গ।
কেহ তীর বিন্ধে ভিন্দপাল অর্দ্ধগাঙ্গ ॥
কোপে লাফ দিয়া চণ্ডী উঠে সেই ক্ষণে।
যুড়িল অনেক বাণ ধনুকের গুণে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে আকর্ণ পূরিয়া।
টানিল দৈত্যের বাণ হুহুঙ্কার দিয়া ॥
রড় দিয়া বুলে কালী দেবীর সুমুখে।
ত্রিশূল বিন্ধিয়া পাড়ে অসুরের বুকে ॥
হান হান বলে দৈত্য ধায় রণাগল।
ব্রহ্মাণী হাসিয়া পেলে কমণ্ডলুজল ॥
যার গায় লাগে সেই হয়ত নির্ব্বল।
চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥
মাহেশ্বরী বিন্ধে কারে ত্রিশূলের আগে।
চক্রে হানিল কারে বৈষ্ণবী রূপে ॥
কৌমারীরূপিণী দেবী বিন্ধে শক্তি হাথে।
শত শত সুররিপু পড়ে বজ্রাঘাতে ॥
বরাহরূপিণী বিন্ধে দশনের ঘায়।
দন্তের প্রহারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥

নৃসিংহরূপিণী দেবী বলে হান হান।
বুক বিদারিয়া কার করে রক্তপান ॥
রড় দিয়া বুলে রণে করে জয়গান।
রথাঙ্গে কাটিয়া কারে করে খান খান ॥
বধিয়া অনেক দৈত্য শিবদূতী থায়।
মাতৃগণ দেখি কোপে রক্তবীজ ধায় ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ধানশ্রী ॥

কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ বা পলায় রড়ে
বিষম সমরে কেহ যুঝে।
কেহ বিন্ধে কেহ কাটে কুহিড়া লাগিল ঠাটে
কেহ ডরে দুই চক্ষু বুজে ॥
দেখি রক্তবীজ রণ পড়িল অসুরগণ
দনুসুত না হয় কাতর।
পাশে করি কাতি ছুরি হাথে করি তরোয়ারি
কোপে লাথে সমর ভিতর ॥
রুষিয়া পশিল রণে অনল [৪৩ক] লাগিল বনে
যেন জলে পবন সহায়।
যা দেখে নয়ানকোণে কৃপাণে দুদিগ হানে
কার গাণ্ডি মুণ্ডি হাথ পায় ॥
ইন্দ্রাণী সহিত যুঝে কেবল আপন তেজে
গদাপাণি সৃজিয়া উপায়।
বিষম সমর মাঝে উলটিয়া রক্তবীজে
ইন্দ্রাণী হানিল বজ্রঘায় ॥
বজ্রহত রক্তবীজ ছুটিল সুতেজ রজ
তথি কত অসুর বিভব।
নানা অস্ত্র ধরি ভুজে মাতৃগণ সঙ্গে যুঝে
বল বীর্য্য সদৃশ দানব ॥
লাফ দিয়া কালী যুঝে হানিল রকতবীজে
রুধির খসিল ধারে ছুটে।
না জানি পড়িল যত রুধিরে জন্মিল কত
অসুর দ্বিগুণ হইল ঠাটে ॥

গলায় রতনমালা ঘন দেই গোঁফে তোলা
বসিয়া রহিল মধ্যখানে।
রুধিরসম্ভব যত রণ করে অদভুত
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ ঝাঁপা ॥

সাজলু রে বীর রুধিরাজ দিঠে।
পক্ষী চলে চরণ বাণ ঘন নাদ পিঠে ॥
জম্ভারি তরোয়ারি রণছুরি টুটে।
ঝন ঝান হান হান ধ্বনি শুনি ঠাটে ॥
শ্রবণান্ত গদকান্ত হস্তা ললাটে।
দেবন্ত জনহাস্ত মুখপদ্ম ফুটে ॥
এক বাণে দুই তিন জহঁ দেবী হানে।
গিরিবাস পতিদাস কবিচন্দ্র গানে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

চক্রে বৈষ্ণবী তার কাটিলেক মাথা।
ইন্দ্রের যুবতী পেলাইয়া মারে গদা ॥
শক্তি পেলিয়া মারে ময়ূরবাহিনী।
শাণিত কৃপাণে হানে বরাহরূপিণী ॥
সমরে পাগল মাহেশ্বরী অবতরে।
ত্রিশূলে বিন্ধিল রক্তবীজ মহাসুরে ॥
রুষিল সমরে রক্তবীজ মহাসুর।
একে একে হানে মাতৃগণ নহে দূর ॥
ত্রিশূল মুষল গদা শক্তি কেহ মারে।
ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝ [৪৩] রে সকলে ॥
নানা বাদ্য বাজে জয় জয় কোলাহল।
তলানি উঠানি রণ ক্ষিতি টলটল ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ভূপালী রাগ ॥

বাজীবর চড়ি রকতবীজা
দশনে অধর চাপে।

পাক দিলে ফিরে   চাক লোচন
অরুণমণ্ডল কোপে ॥
খড়্গা ঝিকৈ   বাণ খিপৈ
মেঘ বরিখয়ে নীর।
লাখ পাথর   সমরচত্বর
মাঝে আগল বীর ॥
চাপ মুকৈ   বাণ খিপৈ
হৃদয় চপ্পই রাগ।
খান খান করি   রুধির ফিকই
তহু সে না ছাড়ে বাগ ॥
হৃদয় লোলা   রতনমালা
যুগল গোফে দেই পাক।
যুঝে মন দেই   রকতসম্ভব
ছাড়ে ঘন ঘন ডাক ॥
রকত কণ খসে   অসুরগণ হাসে
দেখিয়া সোদর ভাই।
আতর পেলিয়া   গগনে লোফ ফই
তেঘাই পড়ে ঠাঞি ॥
বেঢ়ল চৌদিগ   রজনী কৌশিক
সঘনে বলে কাট কাট।
বদনে হাত দিয়া   রহিল দেবতা
দেখিয়া অসুরের ঠাট ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ   ভনই বামন
তনয় চণ্ডীর দাস।
অসুর সকলে   বেঢ়িল জগতি
চলিতে নাহি অবগাস ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

দেবগণ পেখি   বলে শশিমুখী
হৃদয় না ভাব ডর।
কালী কপালিনী   মস্তকমালিনী
বদন বিস্তার কর ॥ধ্রু॥
মোর অস্ত্র হত   সম্ভব রকত
অই মুখে কর পান।
রক্তবীজ ভব   যতেক দানব
ভক্ষণ না কর আন ॥
সমরচত্বরে   থাকিহ সত্বরে
তব মুখে যেই লীন।
এমত প্রকারে   নাশ হয়ে যদি
রক্তবীজ রক্তহীন ॥
এ বোল বলিয়া   বিন্ধিল [৪৪ক] বাশুলী
ত্রিশূল তাহার গায়।
রক্তবীজদেহে   সম্ভব শোণিত
কালী মুখ মেলি খায় ॥
তবে গদাভুজ   ধায় রক্তবীজ
চণ্ডীর উপরে ক্ষেপে।
দেই গদাঘাত   চণ্ডীকে উতপাত
না করিলা কিছু কোপে ॥
শূলহতাসুর   দেহেতে প্রচুর
শোণিত নির্গত হয়।
তাঁর গতি সেই   নাম প্রচণ্ডাই
পুন পুন সুখে খায় ॥
রকতসম্ভব   যতেক দানব
বদনে থাকিয়া উঠে।
দশন কামড়ি   হাড় কড়মড়ি
কালিকা পূরিল পেটে ॥
নানা অস্ত্র ধরে   বিবিধ প্রকারে
সাহস না ছাড়ে যুঝে।
শূল চক্র বাণে   সাণি কৃপাণে
চণ্ডী হানে রক্তবীজে ॥
সহে প্রাণপণে   দুঃখ নাহি মনে
খাইল বিষম ঘা।
রণভূমি কোপে   থর থর কাঁপে
মুখে নাহি সরে রা ॥
অহে নৃপ শুন   যুদ্ধে যত জন
সকল ত্রিপুরাধীন।
বসুমতীতলে   পড়িল দানব
রকতবীজ রক্তহীন ॥

সন্তোষ মানস হয় দিবৌকস
দৈত্যগণ গেল নাশ।
অম্বিকার কাছে মাতৃগণ নাচে
খায় হাড় রক্ত মাস ॥
রমানাথ চন্দ্র- শেখর সোদর
সনাতন তিন ভাই।
তুমি নারায়ণী বিশাললোচনী
রক্ষা পরাপর মাই ॥
মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভব কারণ
যারে তুষ্ট ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গল বাণী ॥০॥

॥ কানড়া রাগ ॥

অসুর সুরমোহিনী শিব শিবদগেহিনী
তুরিত সুখমোক্ষদায়িনী।
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচির শূলিনী পাশিনী ॥
মস্তকমালিনী বিশিখচাপিনী
জয় বিন্দুবাসিনী চক্রিণী।
ভকতবৎসবিধায়িনী হিমশৈলনন্দিনী
ত্রিদেবে তুমি ত্রিনয়নী ॥
[৪৪] কুলুপবরবাহিনী রণরুধিরাজ্ঞিনী
নমস্তু মুণ্ডমালিনী।
ত্রিপুরবরকামিনী জনহৃদয়যামিনী
ব্রহ্মপরবাদিনী নন্দিনী ॥
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচিকর শূলিনী পালিনী।
প্রণত জনপালিনী মৃগতিলকভাষিণী
দক্ষমুখনাশিনী কারিণী ॥
তৃতীয় গুণ রঙ্গিণী ভুজসমর শঙ্খিনী
ডমরু জয় শূলিনী বজ্রিণী।
মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সারথি
রচয়তি বরপিনাকিনী ॥
নমো বিশাললোচনী বিপত্যনাশিনী
নমো দেবী জগন্মোহিনী ॥০॥

॥ মালসী ॥

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাজ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয় চকোরনয়ানী ॥
হরের ঘরণী শিশু মৃগতিলকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী ॥
সদাই বহুত মতি চরণকমলে।
তোমা না সেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥
তব পদকমল রুচির ভবরেণু।
সৃজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তনু ॥
সহস্রেক ফণে তার রহে নারায়ণ।
বসুশ্রী ভস্মের ছলে মাথে ত্রিলোচন ॥
ত্রিভুবনে যে জনে তোমার নাহি কৃপা।
দুঃখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
অজ্ঞান তিমির কাল কিরণমালিনী।
সত্বরজতমময় তৃতীয় রূপিণী ॥
প্রতিদিন না খায় ক্ষুধা জরা মৃত্যু হরে।
শতমখ দেবতা প্রভৃতি তহিঁ মরে ॥
সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে।
কে জানে তোমার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ষষ্টিতম ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

১৩৬০ বঙ্গাব্দ

ষষ্টিতম বর্ষের

প্রবন্ধ-সূচি